বন্ধনহীন
২৫-২৬ দুই খণ্ড একত্রে
দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

বন্ধনহীন দস্যু বনহুর-২৫
দিল্লীর বুকে বনহুর-২৬

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলা বাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

দস্যু বনহুর! ভয়ার্ত অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো শ্যালন।

অন্ধকারে যদিও শ্যালনের মুখমণ্ডল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবু বুঝতে পারলো বনহুর, শ্যালন এ নাম শুনে ভীষণ আতঙ্কে শিউরে উঠেছে। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে তার ভয়-বিহ্বলকাতর মুখ। হেসে বললো বনহুর-হাঁ দস্যু বনহুর। কিন্তু সে তোমার হিতৈষী বন্ধু।

নিকষ অন্ধকারে কম্পিত কণ্ঠস্বর শ্যালনের —কিন্তু---

বনহুর ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায় শ্যালনের পাশে —কোনো কিন্তু নেই; আমাকে তুমি বিশ্বাস করো। শ্যালন, বাংলাদেশে আমার পরিচয় কেউ জানে না। শুধুমাত্র তুমিই জানলে আমি কে? আমার বিশ্বাস, তুমি কাউকে আমার পরিচয় জানাবে না।

আবার প্রতিধ্বনি করলো শ্যালন—আলম!

এবার বনহুরের কণ্ঠে এক বিরহ বেদনা-বিধুর সুর—শ্যালন, এ বাংলা দেশে আমার কেউ নেই—বন্ধনহীন আমি।

স্তব্ধ হয়ে গেলো বনহুরের কণ্ঠ।

শ্যালনের মুখেও কোনো কথা নেই।

নিমতলা শ্মশানঘাটের উন্মত্ত বাতাস তখন সাঁ সাঁ করে বইছে। অদূরে ভয়ঙ্করী রূপধারিনী কলস্রোতা গঙ্গা। তারাবিহীন জমকালো আকাশ।

শ্যালনের কাঁধে হাত রাখলো বনহুর —কি ভাবছো?

চমকে উঠলো শ্যালন।

হাসলো বনহুর—ভয় পেয়েছো?

জমাট অন্ধকারে বনহুরের মুখে তাকালো শ্যালন, কিন্তু কোনো জবাব দিতে পারলো না।

বনহুর বললো—চলো তোমাকে পৌছে দিয়ে আসি।

যন্ত্রচালিতের মত অগ্রসর হলো শ্যালন।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো উভয়ে। বনহুর গাড়ির দরজা খুলে ধরলো—ওঠো!

বিনা বাক্যে ড্রাইভিং আসনের পাশে সীটে উঠে বসলো শ্যালন জড়পুতুলের মত নিশ্চুপ হয়ে।

ড্রাইভিং আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো বনহুর। গাড়ি ছুটতে শুরু করলো।

জনহীন রাজপথ।

পথের দু'ধারে লাইট-পোষ্টগুলো নীরব প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে, কর্তব্যের আদেশে যেন গেড়ে গেছে পা' গুলো।

কচিৎ দু'একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছে, ছুটে চলে যাচ্ছে বনহুরের গাড়িখানার পাশ কাটিয়ে।

নিশ্চুপ গাড়ি চালিয়ে চলেছে বনহুর।

পাশে জড় পদার্থের মত বসে আছে শ্যালন।

বনহুরের দৃষ্টি সম্মুখপথে।

হঠাৎ বললো বনহুর এক সময়— এমন চুপ মেরে গেলে কেনো শ্যালন? গাড়ি এখন নিমতলা শ্মশান ঘাট ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে, ভয় নেই তোমার।

শ্যালন তবু নীরব, বনহুরের কথায় সে কোনো জবাব দেয় না। যেমন বসেছিলো তেমনি রয়েছে।

বনহুর একবার ফিরে তাকিয়ে দেখে নেয় শ্যালনকে, বলে —শ্যালন, মাণিকের মোহে, না দস্যু বনহুর নাম শ্রবণে তুমি নির্বাক হয়ে গেলে। কই, কোন কথাই তো তুমি বলছো না?

বনহুরের চিন্তাধারা মিথ্যা নয়। শ্যালনকে আজ দুটো ব্যাপারই স্তব্ধ করে দিয়েছিলো। একটি হলো অমূল্য সম্পদ মাণিক হাতে পেয়েও তুচ্ছ সামান্য বস্তুর মত গঙ্গার বুকে বিসর্জন দিয়েছে আলম আর একটি হলো আলম সাধারণ মানুষ নয়—সে? বিশ্ববিখ্যাত দস্যু। যে দস্যুর নামে পৃথিবীর সমস্ত দেশ আতঙ্কে আতঙ্কিত। সে বিশ্ববিখ্যাত দস্যু বনহুর তার পাশে উপবিষ্ট। শ্যালন যেন নিজ কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। সে বাস্তব জগতে আছে না কল্পনার জগতে—নিজেই যেন ভেবে পাচ্ছে না। দস্যু বনহুর যে স্বাভাবিক মানুষ—এ যেন তার চিন্তাধারার বাইরে।

এতদিন শ্যালনের মনে দস্যু বনহুর সম্বন্ধে একটা ভয়ঙ্কর কঠিন বিদঘুটে চেহারার প্রতিচ্ছবি আঁকা হয়েছিলো। দস্যু বনহুর নাম শুনলে শিউরে উঠতো সে। ঈশ্বর নাম স্মরণ করতো সে তখন। আর আজ সে দস্যু বনহুর তার পাশে--কত বড় হৃদয় হলে সে মাণিকের মত অমূল্য সম্পদকে সামান্য তুচ্ছ জিনিসের মত ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে। আর কত বড় নির্ভীক প্রাণ হলে সে এ গভীর রাতের অন্ধকারে নিমতলা শ্মশান ঘাটের অসংখ্য কঙ্কালের স্তুপের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে কথাবার্তা বলতে পারে-- কৃতজ্ঞতা আর অফুরন্ত শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে শ্যালনের মাথাটা।

বনহুর বলে—বেশ, কথা না বললে—বুঝতে পেরেছি আমার উপর ঘৃণায় মন তোমার বিষিয়ে উঠেছে।

এতক্ষণে শ্যালন আড় নয়নে তাকালো একবার বনহুরের মুখের দিকে। লাইট-পোষ্টের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি চলন্ত গাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে মাঝে মাঝে আলোকিত করে তুলছিলো গাড়ির ভিতরটা। শ্যালন দেখলো দস্যু বনহুর রূপে আলমকে। সুন্দর বলিষ্ঠ একটা পুরুষ-মুখ তার মনকে পুলকিত করে তুললো। এবার সে কথা বললো—দস্যু হলেও তুমি আমার প্রাণরক্ষক।

একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের ঠোঁটের কোণে। দৃষ্টি তার গাড়ির সম্মুখে সীমাবদ্ধ, বললো সে—তা না হলে তুমি আমায় ঘৃণা করতে?

কোনো কথা বলে না শ্যালন।

বনহুর আবার বললো—শ্যালন, দস্যু আমি নই, দস্যুতা আমার পেশা নয়।

তাহলে তুমি দস্যুতা করো কেন?

জানি এ প্রশ্নই তুমি আমাকে করবে। শ্যালন, শুধু তুমি নও, এ প্রশ্নের জবাব আমাকে অনেকের কাছেই দিতে হয়েছে। কেন আমি দস্যুতা করি, তাই না? চুপ রইলে কেন, জবাব দাও?

ভয় পাচ্ছো, তাই না?

শ্যালন কেমন যেন বোবা বনে গেছে।

বনহুর বললো আবার—শ্যালন, আজ কতদিন হলো আমরা বাংলাদেশে এসেছি বলতে পারো?

৭ই জুন সকাল বেলা আমরা ডায়মণ্ড হারবারে এসে পৌঁছেছি।

আর আজ ২৩ শে আগষ্ট—তিনমাস হতে চলেছে তাই না?

হাঁ।

এতিন মাসব্যাপী আমি শুধু তোমার বাবার হত্যা রহস্য উদ্ঘাটনেই ব্যস্ত ছিলাম না। অবসর মুহূর্তে আমি চষে ফিরেছি সমস্ত কলকাতা শহর। কলকাতায় বাস করেও অনেকে যা জানেনা বা দেখেনি। আমি তাই জেনেছি আর দেখেছি। শুনেছিলাম বাংলাদেশ সোনার দেশ। এখানের মাটিতে নাকি সোনা ফলে। শস্য-শ্যামলা জননীরূপী বাংলাদেশ। আর আমি কি দেখলাম জানো?

শ্যালন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে, নিষ্পলক নয়নে বাকহীন চিত্রাপিতের মত।

বনহুর গাড়ি চালিয়ে চলেছে, ফাঁকা জনশূন্য পথ। এ-পথ সে-পথ করে আপন মনে গাড়ি ছুটছে, কোনো স্থিরতা নেই গন্তব্যস্থলের। এ তিন মাসের মধ্যে শ্যালনকে যেন আজ সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠরূপে পাশে পেয়েছে। জনমুখর কলকাতা নগরীর বুকে বনহুর হাঁপিয়ে পড়েছিলো। এতো লোকের মাঝেও সে নিজেকে একান্ত একা মনে করেছিলো। আজ শ্যালনকে পাশে পেয়ে

বনহুর যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। অন্তরের মধ্যে যে কথাগুলো এতদিন বেদনার দানার মত স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে উঠেছিলো, আজ যেন খসে পড়লো একজন শ্রোতা পেয়ে। শ্যালনকে বনহুর ভালবাসে; অন্তর দিয়ে স্নেহ করে—কুৎসিৎ লালসাপূর্ণ মন নিয়ে নয়! মানুষ যেমন ফুল ভালবাসে, তেমনি শ্যালন বনহুরের কঠিন পুরুষ প্রাণে এক অভিনব আনন্দ দেয়।

ফুলের পরশে, ফুলের গন্ধে মানুষ নবজীবন লাভ করে। বনহুর শ্যালনের মধ্যে খুঁজে পায় তার অতৃপ্ত হৃদয়ের এক মধুর আস্বাদ। আজ শ্যালনকে পেয়ে বনহুর মুখর হয়ে উঠে, বলে সে মনের কথা।

ডালহৌসী স্কোয়ার রোড ধরে বনহুরের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিলো সেক্রেটারিয়েটের দিকে। প্রশস্ত পীচঢালা মসৃণ পথ। গভীর রাতের নিস্তব্ধতা পথের নির্জনতাকে আরও ভাবময় করে তুলেছিলো।

বনহুর বললো—দেখলাম এ দেশের আসল রূপ। মাটিতে সোনা ফললেও কোনো অদৃশ্য হস্তের স্পর্শে সোনা পাথর বনে যায়। শস্য-শ্যামলা জননীর বুকের রক্তই শুধু শুষে নেয় না মানুষ রূপী এ জানোয়ারের দল-এরা বাংলার মানুষগুলোর বুকের পাঁজর গুড়িয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়।

আলম এসব তুমি কি বলছো?

সত্যি শ্যালন, এ তিন মাস ব্যাপী আমি বাংলার যে রূপ দেখলাম, সে অতি ভয়ঙ্করী রূপ। এখানে যারা মানুষ তারাই মানুষরূপী শয়তান। তারাই আসল মানুষগুলোর হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভক্ষণ করে। ভক্ষণ করে তাদের দেহের মাংস। প্রতিটি রক্তবিন্দু নেয় শুষে। রাক্ষসের চেয়েও নৃশংস এরা এ মানুষনামী ভদ্র মুখোসধারীর দল।

বনহুরের কথাগুলো চলন্ত গাড়ির মধ্যে আগুনের টুকরার মত খণ্ড খণ্ড হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিলো। অবাক চোখে তাকিয়ে আছে শ্যালন তার মুখের দিকে।

বনহুর গাড়ি চালাচ্ছিলো, কিন্তু মনের দৃষ্টি তার কোনো অজানার দিকে ছুটে চলছে।

বনহুর বলে চলে—যাদের অস্থি-পাঁজর চূর্ণ করে দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে গড়ে উঠেছে মানুষনামী প্রাণীদের বেঁচে থাকার চলার পথ, তারাই আজ নিষ্পেষিত নির্যাতিত গৃহহীন সম্বলহীন—ফুটপাতে তাদের আশ্রয়স্থল--

বনহুর যেন হাঁপিয়ে উঠে কিছুক্ষণের জন্য থেমে যায়। আবার বলে সে—তিনতলায় বাস করে মানুষনামী প্রাণীগুলো পান করে সুধা আর ওদেরই উচ্ছিষ্ট নিকৃষ্ট পদার্থগুলো নিয়ে ডাষ্টবিনের চারপাশে কাড়াকাড়ি করে কঙ্কালসার জড়াগ্রস্ত নিঃসম্বল অসহায় মানুষের দল। যাদের দেহের রক্তের মূল্যে বাংলার এতো মান।

একটু থামলো বনহুর; তারপর বললো—চেয়ে দেখো শ্যালন, ঐ যে পথের দু'ধারে রাজপ্রাসাদ সম অট্টালিকাগুলো দেখছো এগুলো কাদের জান? কাদের হৃদয় নিংড়ানো প্রচেষ্টা দিয়ে গড়ে উঠেছে এ সব ইমারৎ ? আংগুল দিয়ে দেখালো বনহুর ফুটপাতের দিকে—ঐ যে যারা পথের ধুলায় কুকড়ে পড়ে আছে, ওদেরই বুকের পঞ্জর গুড়িয়ে গড়ে উঠেছে এসব বালাখানা। আজ ওরা নিঃসহায়, অসহায়, আশ্রয়হীন। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে নেই এতোটুকু মাথা গুঁজবার ঠাঁই। ক্ষুধায় নেই এক মুষ্ঠি খাবার। ডাষ্টবিনের মধ্যে যারা খাবারের সন্ধান করে ফেরে। যাদের লজ্জা নিবারণের জন্য নেই এক খণ্ড বস্ত্র। শ্যালন, বলো—বলো তুমি--একটাই কি আমাদের ভদ্রবেশি মানুষ নামী জীবনগুলোর সমাজের প্রতি ন্যায়বিচার?

আলম, তুমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়েছো, যেভাবে গাড়ি চালাচ্ছো তাতে এক্সিডেন্ট না হয়ে বসে!

হেসে উঠলো বনহুর— ধনবান দুহিতা তুমি! জীবনের মায়া তোমাদের বেশি।

শ্যালন এবার অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, বলে সে —আলম, তুমি নাকি দস্যু কিন্তু এতো কোমল, এতো মায়াভরা তোমার প্রাণ!

হাসালে শ্যালন! আমি তোমাকে বড্ড অবুঝ ভাবতাম—কিন্তু আসলে তুমি অবুঝ নও।

আলম!

হাঁ, এবার চলো তোমাকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে আসি।

আমাকে নিয়ে এতোক্ষণ এভাবে ঘোরার কি মানে হলো বলো তো?

আবার তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বললে শ্যালন। কত দিন পর তোমাকে একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম, তাই তোমাকে ছাড়তে ইচ্ছে হচ্ছে না।

তুমি যেখানে থাকো নিয়ে চলো আমাকে।

তা হয়না শ্যালন, তা হয় না—

কেন হয় না?

আমি দস্যু ডাকু কিন্তু শয়তান নই।

শ্যালন আর কোনো কথা বলতে পারে না, নিশ্চুপ বসে থাকে।

বনহুরের গাড়িখানা এবার সোজা পার্ক সার্কাস অভিমুখে ছুটতে শুরু করে।

❑

শ্যালনকে পৌঁছে দিয়ে বনহুর যখন ক্যালকাটা গ্র্যাণ্ড-হোটেলে ফিরে আসে তখন ভোরের আকাশে সুর্য উঁকি দিচ্ছে।

বয় মিঠু ছুটে এলো, ব্যস্তকণ্ঠে বললো সে—স্যার, গোটা রাত কোথায় ছিলেন?

বনহুর কোট-টাই খুলে মিঠুর হাতে দিয়ে বললো—কেন, আমার জন্য খুব বুঝি ভেবেছিলি?

হাঁ স্যার।

কেন? কলকাতা শহরে হারিয়ে যাবো, তাই?

স্যার ঠিক তা নয়, তবে কলকাতা শহর—সব সময় এক্সিডেন্ট লেগেই আছে কিনা।

বনহুর বুঝলো, মিঠু তাকে এ ক'দিনের মধ্যে অনেকখানি ভালবেসে ফেলেছে। হেসে বললো সে—ভয় নেই মিঠু, ফিরতে বিলম্ব হলে আমার জন্য চিন্তা করিসনে। আমার কাজ যে রাতেই।

অবাক হয়ে মিঠু—রাতে! সে কি রকম কাজ স্যার? লোকে কাজ করে দিনে—যত অফিস, আদালত, কাচারী, দোকানপাট---

মিঠুর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠে বনহুর—সব দিনে, হয়, তাই না?

হাঁ স্যার?

কিন্তু আমার অফিস রাতে।

কি কাজ করতে হয় স্যার আপনাকে?

বনহুর গম্ভীর হয়ে পড়ে, ছোকরা বড় চালাক—কোনো গোয়েন্দা দলের লোক নাকি? এতো কথা জিজ্ঞাসার মানে কি? বনহুর বললো—আমার নাস্তা নিয়ে আয়। আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি। ওঃ কি কাজ করতে হয় জানতে চাস্ না?

হাঁ স্যার? শুনলে আমার মনটা নিশ্চিন্ত থাকবে।

হেসে বললো বনহুর—রাতে শহরে আমাকে ডিউটি দিতে হয়— মানে পাহারা দিতে হয়, বুঝলি?

সেতো পুলিশ আর চৌকিদারের কাজ, আপনি তো ভদ্রলোক।

আমি ভদ্রলোক, তাই ভদ্র-সন্তানদের ঘরে পাহারা দিতে হয়।

ওঃ বুঝেছি। সাহেবদের বাড়ি!

হাঁ। এবার চলে যা, চট্ পট্ যা হয় খাবার এনে দে। খেয়ে ঘুমাবো, বুঝলি?

আচ্ছা স্যার।

মিঠু চলে যায়।

বনহুর বাথরুমে প্রবেশ করে।

❑

আলবার্ড মুক্তিলাভ করে ফিরে আসার পর তিনি তাঁর পরম আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে একটা আনন্দ-উৎসবের আয়োজন করলেন। কলকাতার বিশিষ্ট ভদ্রমহোদয়গণ এ উৎসবে বাদ পড়লেন না। বিশেষ করে ধনী ব্যবসায়ী মার্চেন্ট-প্রিন্সগণ এ উৎসবে সর্বশ্রেষ্ঠ অতিথির আসন গ্রহণ করলেন।

পার্ক-সার্কাস রোডের মোড়ে আলবার্ডের হোয়াইট ওয়াশ্ করা বিরাট বাড়িখানার সম্মুখভাগে অসংখ্য প্রাইভেট কার দাঁড়িয়ে আছে।

আর একখানা কার এসে থামলো গাড়িগুলোর পাশে। মডেল পন্টিয়াক গাড়ি। গাড়ির মধ্যে হতে নেমে এলেন এক প্রৌঢ় ভদ্র লোক-মার্চেন্ট প্রিন্স অভয়কর বিশ্বাস। কলকাতায় তার বিশ্বাস কোম্পানী নামে অনেকগুলো কারবার আছে।

আলবার্ডের বিশেষ একজন বন্ধুস্থানীয় লোক এ অভয়কর বিশ্বাস। আলবার্ড বিশ্বাস কোম্পানীর কয়েকটি কারবারের সঙ্গে জড়িত আছেন। এ কারণেও অভয়করকে তিনি বেশ সমীহ করে চলেন।

বিরাটা হলঘর মার্চেন্ট প্রিন্স মহোদয়গণের আগমনে জমকালো হয়ে উঠেছে। টেবিলে-টেবিলে নানারকম খাদ্যসম্ভার থরে থরে সাজানো। সুস্বাদু পানীয় বস্তুর অভাব নেই।

একপাশে উঁচু একটা স্থানে পিয়ানোবাদক ও অন্যান্য বাদ্যকরগণ বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছে। পিয়ানোর টুং টুাং শব্দ কক্ষমধ্যে এক মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে চলেছে।

রাত বেশি নয়—সবে মাত্র আটটা।

কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল নীলাভো আলো পরিবেশটাকে আরও মধুময় করে তুলেছিলো।

পিয়ানোর টুং টাং আওয়াজের সঙ্গে মার্চেন্টপ্রিন্সগণের হস্তে ছুরি-কাঁটা-চামচের শব্দ আর তাঁদের হাসি-গল্পের লহরী মিলে অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি হচ্ছিলো।

শুধু পুরুষকণ্ঠের হাস্যধ্বনিই নয়, নারীকণ্ঠের উচ্ছল কলকণ্ঠ মাতিয়ে তুলেছিলো কক্ষটাকে।

মিসেস আলবার্ডও যোগ দিয়েছেন মেয়েদের মধ্যে।

শ্যালনও এ আসরে বাদ পড়েনি।

ওদিকের একটা সোফায় বসে আছে চুপচাপ। উজ্জ্বল নীলাভো আলো তার সোনালী চুলগুলোকে নীলচে করে তুলেছে। শুভ্র গাউনের উপর জড়িয়ে বুটি করা ফুলগুলো ঝক্‌মক্ করছে আলোক রশ্মিতে। অপূর্ব সুন্দর লাগছে আজ শ্যালনকে।

শ্যালন নিশ্চুপ বসেছিলো তার টেবিলের পাশে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সে এ সব।

পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীর হস্তে অপূর্ব সুরের ঝঙ্কার উঠেছে। সমস্ত কক্ষটা যেন সুরের মূর্ছনায় খান খান হয়ে পড়েছে। এমন সুর তারা ইতিপূর্বে কোথাও শোনেনি।

আনন্দে আপ্লুত সবাই।

সকলের হৃদয়েই একটা সুরের মুর্ছনা।

হঠাৎ অভয়কর আলবার্ডের দিকে তাকিয়ে কিছু ইংগিত করলেন।

আলবার্ড উঠে গেলেন শ্যালনের পাশে, কি যেন ফিস ফিস করে বললেন।

শ্যালনের মুখ গম্ভীর হলো।

একটু পরে অভয়কর স্বয়ং উঠে গেলেন শ্যালনের পাশে। হাতে তার কাঁচপাত্র ; কি যেন বলে কাঁচপাত্রটা বাড়িয়ে ধরলেন শ্যালনের দিকে।

শ্যালন কাঁচপাত্রটা গ্রহণ না করে আসন ত্যাগ করলো এবং চলে গেলো পাশের কামরায়।

অভয়কর ফিরে এলেন নিজ আসনে, আলবার্ডের সঙ্গে একবার দৃষ্টি বিনিময় হলো তার।

মাসুদ ইরানীর হস্তে পিয়ানোটা মুহুর্তের জন্য থেমে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই আবার মাসুদ ইরানী নিজেকে সামলে নিলো অতি সাবধানে।

❑

আনন্দোৎসব শেষ হলো রাত বারোটায়।

আলবার্ড স্বয়ং সম্মানিত অতিথিগণকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিচ্ছিলেন।

অভয়কর বিশ্বাস এবার বিদায় চাইলেন, তখন আর একবার আলবার্ডের মুখে তাকিয়ে চাপাকণ্ঠে কিছু বললেন।

আলবার্ডের মুখে হাসি ফুটলেও সে হাসি যেন নিরস আনন্দহীন মনে হলো।

অভয়কর গাড়িতে বসে হাত নাড়লেন।

আলবার্ডের মুখ তখন কালো হয়ে উঠেছে।

সবগুলো গাড়ি যখন এক এক করে বিদায় নিয়ে চলে গেলো, তখন আলবার্ড অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন।

আর্থার এসে দাঁড়ালো তাঁর সামনে—বাবা, এ তোমার অন্যায়।

জানি কিন্তু কোনো উপায় নেই! অভয়কর বিশ্বাস আমার কাছে এখনও কোটি টাকা পায়।

তাই বলে ঐ শয়তান লোকটার কাছে শ্যালনের মত নিরীহ একটি মেয়েকে--না না এ হতে পারে না বাবা। এ হতে পারে না--

আর্থার, তুমি আমার সব কথা জানো না। অভয়কর আমার বন্ধু হলেও আমি তার কাছে সর্বতোভাবে ঋণী। অভয় যদি আমার উপর বিরূপ হয় তাহলে আমার সমস্ত কারবার বন্ধ হয়ে যাবে।

নিজের স্বার্থের জন্য তুমি---

হাঁ, উপায় নেই কোনো।

আলবার্ড চলে যান নিজের কামরায়।

থ'মেরে দাঁড়িয়ে থাকে আর্থার পিতার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে।

কলকাতার মার্চেন্টপ্রিন্স অভয়কর বিশ্বাসকে তে না জানে!

বড় বড় কয়েকটি কোম্পানীর মালিক তিনি। তার সবচেয়ে বড় কোম্পানী সিমেন্ট কারখানা। দৈনিক হাজার হাজার ব্যাগ সিমেন্ট তার কারখানা থেকে দেশ-বিদেশে চালান যায়। আসে লক্ষ লক্ষ টাকা।

অভয়করের কারবারের সঙ্গে কলকাতা শহরের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট কনট্রাক্টরের যোগাযোগ ছিলো। তারা শহরে বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন অভয়কর বিশ্বাসের কারখানার সিমেন্ট ব্যাগের সাহায্যে। কিন্তু সে সব প্রতিষ্ঠান গড়েই উঠেছে শুধু —তার অস্তিত্ব কতদিন টিকবে কে তা জানে!

শত শত শ্রমিক এ কারখানায় দিবারাত্রি পরিশ্রম করে চলেছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে সপ্তাহ পর পায় তারা যৎসামান্য কয়েকটি টাকা। যা তারা পায় তা দিয়ে তাদের সংসার চলে না, অর্ধাহারে অনাহারে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে নিয়ে আস্তাকুঁড়ের মত কুঁড়ে ঘরে বাস করে পথের কুকুরের মত।

আর অভয়কর বিশ্বাস কোটি কোটি টাকার মালিক। কলকাতা শহরের বুকে তার অগণিত বাড়ি-গাড়ি আর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য।

এহেন অভয়করের নজর পড়লো বাপ-মরা কচি একরত্তি মেয়ে শ্যালনের উপর। শ্যালনকে দেখে তার ভাল লেগেছে, তাই অভয়কর বিশ্বাস উৎসব আসরেই গোপনে কথাটা জানিয়ে বসলেন আলবার্ডের কাছে।

কথাটা শুনে আলবার্ড মনে মনে শিউরে উঠলেও মুখে তিনি হাসিভরা ভাব টেনে শ্যালনকে বলেছিলেন—মা, আমার বন্ধু অভয়কর বিশ্বাস তোমার সঙ্গে পরিচিত হতে চান।

অভয়কর তাই আসরেই কাঁচপাত্র হস্তে গিয়েছিলেন শ্যালনের সঙ্গে আলাপ জমাতে; কিন্তু শ্যালন অভয়করের আচরণ পছন্দ করেনি —সে ক্রুদ্ধ হয়ে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলো নিজের কক্ষে।

শ্যালন উৎসব-আসর থেকে রাগতঃ হয়ে চলে গেলেও অভয়কর বিশ্বাস ভরসা হারাননি। কারণ আলবার্ড তার হাতের পুতুল। আলবার্ড ধনকুবের নামে লোকসমাজে পরিচিত হলেও আসলে সে অভয়কর বিশ্বাসের অনুগ্রহের পাত্র। অভয়কর জানেন, আলবার্ড কিছুতেই তাঁর ইচ্ছাকে অপূর্ণ রাখতে পারবে না। যদিও তাঁর বয়স পঞ্চাশের অধিক হয়েছে, তবু তার নাইট-ক্লাবে রাত্রি কাটানো অভ্যাস। বিলাতী মদ আর নারী-ভোগ তার জীবনের এক পরম নেশা।

অভয়কর বিশ্বাসের টাকার অভাব নেই, তাই যা মন চায় তাই তিনি করেন।

শুধু অভয়কর বিশ্বাসই নয়, এমনি আরও কিছুসংখ্যক ধনকুবের মার্চেন্টপ্রিন্স আছেন—যারা লোকসমাজে বাস করে মানুষ নামে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছেন, কিন্তু হৃদয় তাদের মানুসের মত নয়। পশুর মত অন্তঃকরণ নিয়ে পিশাচের মত আচরণ করে চলেন তারা নিরীহ জনগণের প্রতি। নিজেদের ঘরে মা-বোন-স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও পরের মা-বোন-স্ত্রীর প্রতি লালসা-পূর্ণ যৌনভাব পোষণ করতে কিছুমাত্র কসুর করেন না।

শুধু ধনকুবের ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণই নয়, অমন কত বড় বড় চাকুরীজীবী মহান ভদ্রলোক আছেন যাদের মুখোসের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক-একটি ভয়ঙ্কর পৈশাচিক শয়তান -প্রাণ। যাদের মন আছে কিন্তু হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। নিরীহ জনগণের বুকের রক্ত শুষে নিয়ে যারা বেঁচে থাকার প্রয়াস পায়। দেশের মেরুদণ্ড যারা—সে সব অসহায় অবুঝ মানুষগুলোর হাড় চিবিয়ে যারা রস পান করে—তারাই আজ সভ্য সমাজের অধিনায়ক।

অভয়কর বিশ্বাসকে খুশী করবার জন্য আলবার্ডের চোখে ঘুম নেই। সারারাত্রি তিনি কক্ষমধ্যে পায়চারী করে কাটালেন। কিন্তু শ্যালন তার কন্যাস্থানীয়—পিতৃহারা অসহায় একটি তরুণী। আলবার্ড নিজের অধর নিজে দংশন করতে লাগলেন। কি করে এক প্রৌঢ় বিশালদেহী পুরুষের হাতে তুলে দেবেন এ ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ মেয়েটিকে! অনেক চিন্তা করেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হলেন না। আজ ম্যাকমারা নেই, তার কন্যা তারই গচ্ছিত সম্পদ। না না, তা হয় না। নিজ স্বার্থের জন্য এতোবড় অন্যায় তিনি করতে পারবেন না।

কিন্তু কি করে তা সম্ভব! অভয়কর যদি বিরূপ হয় তাহলে তার সমস্ত কারবার বন্ধ হয়ে যাবে। কোম্পানীগুলোতে লালবাতি জ্বলবে। এমনকি হয়তো অভয়কর কৌশলে তাকে পথে বসাতে কসুর করবে না, ছিনিয়ে নেবে সমস্ত সম্পদ।

এর চেয়ে তার মৃত্যু ভাল। যারা তাঁর এতো সহৃদয় বন্ধু তারাই তখন উপেক্ষার হাসি হাসবে। না না, এসব সহ্য করতে পারবেন না। তার চেয়ে শ্যালনকে তুলে দেবেন অভয়কর বিশ্বাসের হাতে। সামান্য একটা মেয়ের জন্য আলবার্ড তার সবকিছু বিসর্জন দিতে পারেন না।

ভোরে টেলিফোনে জানিয়ে দিলেন আলবার্ড তার পরম বন্ধু অভয়করকে এ সুসংবাদটা—আজ রাতে-ই তুমি তোমার কক্ষে পাবে শ্যালনকে।

টেলিফোনের ওপাশে বীভৎস এক হাসির শব্দ হলো—থ্যাঙ্ক ইউ বন্ধু-- থ্যাঙ্ক ইউ--জানি তুমি আমার আশা পূর্ণ করবে।

রিসিভার রেখে সোজা হয়ে বসলেন আলবার্ড, ঠিক সে মুহূর্তে তাকিয়ে দেখলেন—কক্ষের দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দীপ্তময় সুন্দর পুরুষ। মাথায় বাদামি রঙ-এর কোঁকড়ানো চুল। এক জোড়া ভ্রুর নীচে দু'টি উজ্জ্বল নীল চোখ। দেহে হাল্কা রঙ-এর পোশাক—ঠিক ইরান দেশীয় ড্রেস। মাথায় হাল্কা রঙ-এর পাগড়ী।

আলবার্ড উচ্ছল কণ্ঠে বলে উঠলেন—আপনি!

শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এলো মাসুদ ইরানী—কাল রাতে ভুল করে আমার ডায়রী রেখে গিয়েছিলাম।

বসুন, আমি এনে দিচ্ছি। হয়তো আর্থার উঠিয়ে রেখেছে।

মাসুদ ইরানী আসন গ্রহণ করলো।

কিছুক্ষণ পূর্বে অভয়করের সঙ্গে আলবার্ড যে ব্যাপার নিয়ে ফোনে আলোচনা করেছিলেন সে কথার রেশ এখনও তার মন থেকে মুছে যায়নি, অন্যমনস্কভাবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

এমন সময় মিসেস আলবার্ড কক্ষে প্রবেশ করলেন। মাসুদ ইরানী তাকে অভিবাদন করলেন।

মিসেস বার্ড বললেন—শ্যালন মাসুদ ইরানীর আগমন জানতে পেরেছে, সে তার পিয়ানো বাজানো শুনতে চায়।

আলবার্ড হেসে বললেন —বেশ তো, তাকে আসতে বলো। এবার মাসুদ ইরানীর দিকে তাকিয়ে বললেন—শুনলেন তো, মত আছে আপনার?

মাসুদ ইরানী বললো—কারো ইচ্ছা অপূর্ণ রাখা-আমার মতের বিরুদ্ধে, কাজেই আমাকে পিয়ানো বাজাতে হবে।

মিসেস বার্ড চলে গেলেন। একটু পরে ফিরে এলেন —সঙ্গে শ্যালন। শ্যালনের হস্তেই মাসুদ ইরানীর ডায়রীখানা।

শ্যালন ডায়রীখানা মাসুদ ইরানীর হাতে দিয়ে বললো—সবাই কক্ষত্যাগ করার পর আর্থার দাদা ডায়রীখানা এ কক্ষে কুড়িয়ে পেয়ে আমাকে নিয়ে দিয়েছিলেন, আমি তেমনি রেখে দিয়েছিলাম—খুলে দেখিনি।

থ্যাঙ্ক ইউ! মাসুদ ইরানী দাঁড়িয়ে শ্যালনের হাত থেকে ডায়রীখানা নিলো।

শ্যালন আর মিসেস বার্ড আসন গ্রহণ করলো।

ওদিকে ডায়াসের পাশে রাখা পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসলো মাসুদ ইরানী। সুরের ঝঙ্কারে কক্ষটা মুখর হয়ে উঠলো। মাসুদ ইরানীর হস্তে জীবন্ত হয়ে উঠলো যেন পিয়ানোখানা।

তন্ময় হয়ে গেলো শ্যালন পিয়ানোর সুরে।

মিসেস বার্ডের মনেও আনন্দের স্রোত বয়ে চললো।

মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শ্যালন মাসুদ ইরানীর মুখের দিকে।

এক সময় মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজানো শেষ করে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন বিস্ময় ভরা কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—অপূর্ব!

মাসুদ ইরানীর মুখে হাসি ফুটলো।

সেদিনের মত মাসুদ ইরানী বিদায় গ্রহণ করলো আলবার্ড মহল থেকে।

মাসুদ ইরানীকে তার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলেন আলবার্ড। স্ত্রী এবং শ্যালনকে লক্ষ্য করে বললেন—এমন পিয়ানোবাদকের সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। আমার ভাগ্য, তাই আমার উৎসব আসরে মাসুদ ইরানীর মত বাদ্যকরের আগমন হয়েছিলো।

মিসেস বার্ডও অকুণ্ঠ গলায় প্রশংসা করলেন মাসুদ ইরানীর।

আলবার্ড লক্ষ্য করলেন— শ্যালনের মুখমণ্ডল মাসুদ ইরানীর প্রশংসায় স্ফীত-উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

এ-কথা সে-কথার পর এক সময় বললেন আলবার্ড—মা শ্যালন, আজ রাতে এক স্থানে বেড়াতে যাবো, যাবে তুমি?

খুশী ভরা কণ্ঠে বললো শ্যালন—কোথায় যাবে কাকা? অনেকদিন শ্যালন কারো বাড়ি বেড়াতে যায়নি কিনা, বেড়াতে যাওয়ার নাম শুনে আনন্দে আপ্লুত হলো সে।

আলবার্ড হঠাৎ বলেই ফেললেন—আমার বন্ধু অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে--

সঙ্গে সঙ্গে শ্যালনের মুখ অমাবস্যার অন্ধকারের মত কালো হয়ে উঠলো।

আলবার্ড নিজের ভুল বুঝতে পারলেন।

শ্যালনকে অভয়করের বাড়ি যাওয়ার কথাটা বলায় সে গম্ভীর হয়ে পড়লো।

শ্যালন শেষ পর্যন্ত কিছুতেই আলবার্ডের বাড়ি যাওয়ায় রাজী হলো না।

প্রমাদ গুনলেন আলবার্ড—এখন উপায়? অভয়করকে কথা দিয়েছেন—আজ রাতেই শ্যালনকে পৌছাবেন তার ওখানে।

শ্যালন ক্রুদ্ধভাবে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো নিজের কক্ষে।

আলবার্ড মিসেস আলবার্ডসহ তার কক্ষে গিয়ে অনেক করে বোঝাতে লাগলেন, কিন্তু শ্যালন আর কিছুতেই বাইরে যেতে রাজী হলো না।

শেষ পর্যন্ত প্রচেস্টা চালিয়েও কোনো ফল ফললো না। অগত্য আলবার্ড নিজেই গমন করলেন বালিগঞ্জে বন্ধুবর অভয়করের বাড়িতে।

❑

অভয়কর বিশ্বাস বিপত্নীক।

সন্তান-সন্ততি যারা আছে তারাও মানুষ নয়। পিতার প্রচুর অর্থ—কাজেই লেখাপড়ায় তাদের কি প্রয়োজন। সারা দিনরাত কে কোথায় থাকে বা কাটায় এসব সন্ধান নেবার সময় নেই অভয়কর বিশ্বাসের। তিনটি ছেলে অভয়করের। কেউ বিদ্যায় বিদ্যাপতি না হলেও জুয়া আর মদের আড্ডায় বেশ নাম কিনেছে। ঘোড়ার রেস্ খেলায় পাকা খেলোয়াড় এক-একজন:—কোনো বার লক্ষ টাকা হারলো, দ্বিতীয় বার উঠিয়ে নিলো তার ডবল। শহরে তাদের নাম-ডাক আছে যথেষ্ট।

অভয়কর বিশ্বাস বিপত্নীক হলেও তার বাড়িতে মেয়েমানুষের অভাব নেই। আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে পরিচিত জনগণই বেশি। সম্পর্কে এক বিধবা বৌদি বিপত্নীক অভয়করের দেখাশোনা করে। আরও আছে যুবতী চাকরানীর দল।

অভয়কর বিশ্বাসের একটি মাত্র কন্যা আরতী।

পিতা এবং ভ্রাতাগণের ঠিক বিপরীত ছিলো আরতী। শিক্ষিতা-বুদ্ধিমতী-জ্ঞানবতী তরুণী ছিলো সে। পিতার অসৎ আচরণের জন্য আরতী শুধু দুঃখিতই ছিলো না—অত্যন্ত ব্যথিত এবং চিন্তিত ছিলো। ভাইগুলোও সব অধঃপতনে গেছে-এটাও তার কম দুঃখ নয়।

আরতী ভাইগুলোর চেয়ে বয়সে ছোট হলেও একেবারে তার বয়স কম নয়। মা-হারা হলেও আরতী নিজের প্রতি ছিলো অত্যন্ত সতর্ক। লেখাপড়া, গান-বাজনা এবং গৃহকর্মে নিপুণা ছিলো সে। ধনকুবের-কন্যা হলেও আরতী ছিলো আদর্শ যুবতী।

যতক্ষণ পিতা বাড়িতে থাকতেন ততক্ষণ আরতী উপর থেকে নীচে নামতো না। চাকার-বাকর দাস-দাসী ছিলো অগণিত; তাছাড়া পিতার বৌদি ছিলেন, তিনিই পিতার তদারক করতেন। আরতী নীচে নেমে আসার প্রয়োজন বোধ করতো না। কোনো কোনোদিন হঠাৎ যদি নীচে নেমে আসতো কোনো কাজের চাপে, তাহলে পিতা আর বিধবা বৌদির আচরণে লজ্জায় মরে যেতো যেন। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারতো না সে।

আজ অভয়কর বিশ্বাস আধুনিক ড্রেসে তরুণ যুবকের মত নিজেকে সজ্জিত করে নিয়েছিলেন। হল—ঘরের মেঝেতে তিনি ঘন ঘন পায়চারী করছিলেন। মাঝে মাঝে হাতঘড়িটা দেখছিলেন তিনি।

এমন সময় একখানা গাড়ি এসে থামলো অভয়কর বিশ্বাসের রাজ প্রাসাদসম বাড়িখানার গাড়ি-বারান্দায়।

অল্পক্ষণ পর হল ঘরে প্রবেশ করলেন আলবার্ড।

মুখমণ্ডল গম্ভীর চিন্তাযুক্ত; ঠিক যেন অপরাধীর মত মন্থর গতিতে কক্ষে প্রবেশ করে মাথা নীচু করে দাঁড়ালেন।

অভয়কর বিশ্বাস ফিরে তাকিয়েই হুঙ্কার ছাড়লেন— এসেছো? কিন্তু সে কই?

আলবার্ড মুখ তুললেন, ঢোক গিলে বললেন—অভয়, তাকে কিছুতেই আনতে পারলাম না!

'তাহলে তুমি এলে কেন?

চমকে মুখ তুললেন আলবার্ড।

অভয়কর বিশ্বাস গম্ভীর রাগতকণ্ঠে বললেন আবার—তোমার বাড়িতে আশ্রিতা অথচ তুমি তাকে আনতে পারলে না?

আমি অনেক চেষ্টা করেছি, তুমি বিশ্বাস করো অভয়, আমি--

চুপ করো, আমি তোমার নেকামি শুনতে চাইনে।

আলবার্ড অভয়করের ধমক খেয়ে চুপ করে গেলেন।

অভয়কর পায়চারী শুরু করলেন, ক্রুদ্ধ সিংহের মত আপন মনে গর্জন করতে লাগলেন তিনি। যেমন ক্ষুধিত সিংহ মুখের আহার থেকে বিতাড়িত হলে তার অবস্থা হয়—ঠিক তেমনি।

আলবার্ড প্রমাদ গুণলেন, অভয়করকে খুশী করাই হলো এখন তার চিন্তা। কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন তিনি—অভয়, তুমি আমার প্রতি বিরূপ

হচ্ছো কেন? আমার হাতের মুঠায় রয়েছে শ্যালন। সে আসতে না চাইলেও আমি তাকে জোরপূর্বক নিয়ে আসবো তোমার বাড়িতে।

কিন্তু কথাটা বলে কিছুতেই নিজের মনে স্বস্তি পাচ্ছিলেন না, কারণ শ্যালনকে জোর করে আনা এখানে সম্ভব হয়ে উঠবে না। সে যদি নিজ ইচ্ছায় না আসে তাকে ধরে-বেঁধে নিয়ে আসা মুস্কিল। হঠাৎ বলে উঠেন আলবার্ড পুনরায়— অভয়, বসো একটা বুদ্ধি এঁটেছি, সে ভাবে কাজ করলে নিশ্চয়ই শ্যালনকে এখানে নিয়ে আসা মোটেই কষ্টকর হবে না।

কি বুদ্ধি তুমি এঁটেছো বার্ড? একরত্তি একটা মেয়ের সঙ্গে তুমি পারলেনা, আশ্চর্য মানুষ তুমি! কথাটা বলে আসন গ্রহণ করলেন অভয়কর বিশ্বাস।

আলবার্ড তার পাশের সোফায় বসলেন, তারপর বললেন— এক কাজ করলে মন্দ হয় না।

কি কাজ?

শ্যালন অত্যন্ত ভালবাসে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজনা। তাকে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজনা শোনার ছলনায় আনা যায় এখানে।

বেশ তাই হবে। একটা উৎসবের আয়োজন করো। সে উৎসবে মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাবে আর শ্যালন হবে তার শ্রোতা। —হাঃ হাঃ হাঃ তারপর ---

তারপর সবাই বিদায় গ্রহণ করলে---

শ্যালন হবে আমার শিকার, তাই না?

হাঁ। একটু থেমে বললেন আলবার্ড —অভয়, শ্যালনকে তোমার হাতে তুলে দিলে তুমি আমায় কোটি টাকার ঋণ থেকে মুক্তি দেবে?

তুমি দেখছি মস্ত এক ফন্দি আঁটছো বার্ড!

ফন্দি নয় অভয়, তুমি জানো—শ্যালন তার বাবাব একমাত্র কন্যা। ম্যাকমারার মৃত্যুর পর সে-ই তার বিশাল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী, কাজেই কোটি টাকার সম্পত্তি তোমার হাতে অনায়াসেই এসে যাচ্ছে।

সে দেখা যাবে। অভয়কর বিশ্বাস সিগারেট কেস বের করে একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন।

এমন সময় টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

রিসিভার তুলে নিলেন হাতে অভয়কর--হ্যালো---ম্যানেজার বাবু--কি বললেন--বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে--

আপনার কাছ থেকে --কি বললেন---জমকালো পোশাক-পরা একটি লোক--- আপনি কি চুপ করেছিলেন.... রিভলভার ছিলো তার

হাতে....আচ্ছা আমি এক্ষুণি আসছি। রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন অভয়কর।

আলবার্ডের চোখেমুখে বিস্ময়, ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন তিনি —অভয়, কি সংবাদ?

অত্যন্ত সাংঘাতিক। সিমেন্ট কারখানার ম্যানেজারবাবু খিদিরপুর ডগ থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে বালিগঞ্জ আমার অফিসে ফিরছিলেন, পথে তার গাড়ি রোধ করে এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত সব কেড়ে নিয়েছে---

আশ্চর্য এ সন্ধ্যারাতে কলকাতা শহরে প্রকাশ্য রাজপথে ডাকাতি! আলবার্ডের মুখ চুন হয়ে গেছে কথাটা শুনে।

অভয়কর বিশ্বাসের দু'চোখে আগুন টিকরে বের হচ্ছে। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন তিনি—কার এমন সাহস আমার টাকায় হস্তক্ষেপ করে! কলকাতার সেরা গুণ্ডা মহাতক সিং আমার হাতের পুতুল। আজই আমি খুঁজে বের করে পুলিশে দেবো বেটাকে। বার্ড, তুমি অচিরেই একটি দিন দেখে আমার বাড়িতে উৎসবের আয়োজন করো। আর সে উৎসবে মাসুদ ইরানী বাজাবে পিয়ানো। শ্যালনকে আমি ঐদিন--যাও। আর শোন, আমি এখন খুব ব্যস্ত থাকবো কারণ যতক্ষণ আমার অর্থ হরণকারীকে গ্রেপ্তার করতে না পারবো ততক্ষণ আমার স্বস্তি নেই।

অভয়, এ সামান্য বিশ হাজার টাকার জন্য তুমি মরে যাবে না।

মরবো না। বিশ হাজার কেন বিশ লক্ষ টাকার লোকসান গেলেও মরবে না অভয়কর বিশ্বাস। তবু যে দুর্বৃত্ত সাহস পায় তার গায়ে আঁচড় দিতে তাকেও সে রেহাই দেবে না কোনোদিন।

আচ্ছা চলি। আলবার্ড বিদায় গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে ফিরে দাঁড়াতেই দরজায় একটা জমকালো ছায়ামূর্তি ভেসে উঠলো, চমকে উঠলো অভয়কর বিশ্বাস।

জমকালো মূর্তির হস্তে উদ্যত রিভলভারের দিকে তাকিয়ে আরষ্ঠ হয়ে গেলো তাঁর কণ্ঠ।

ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো, রিভলভার উদ্যত তার হস্তে। পাশে দাঁড়ালো এসে অভয়করের, চাপা কণ্ঠে বললো—চেয়ারে বসুন।

অভয়কর বিশ্বাস অধর দংশন করছিলেন, বললেন—কে তুমি?

জবাব পরে পাবেন, বসুন চেয়ারে।

অভয়কর বিশ্বাস আসন গ্রহণ করলেন, তারপর বললেন—তুমিই আমার ম্যানেজারের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছো?

হাঁ।

আবার কি চাও?

সামান্য বিশ হাজার দিয়েই রেহাই পেতে চান?

কি চাও তা হলে?

রিসিভার হাতে উঠিয়ে নিন। জমকালো ছায়ামূর্তি তার হস্তস্থিত রিভলভার অভয়কর বিশ্বাসের কপালের বাম পাশে চেপে ধরলো —রিং করুন আপনার কোম্পানীর ম্যানেজারের কাছে।

অভয়কর বাধ্য হলেন রিসিভার হাতে তুলে নিতে। এমন একটা অবস্থায় পড়বেন তিনি কোনো দিন কল্পনাও করেননি। রিসিভার তার হাতের মুঠায়—ইচ্ছা করলে তিনি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করতে পারেন। কিন্তু কোনো উপায় নেই, দস্যুর রিভলভার তার ললাটে ঠেকে রয়েছে। জীবনের মায়া কার না আছে।

অভয়করকে ভাবতে দেখে গম্ভীর চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠলো কালো ছায়ামূর্তি—চালাকি করলে মরবেন। যা বললাম তাই করুন।

অগত্যা অভয়কর তার ম্যানেজারের নিকট রিং করলেন— হ্যালো হ্যালো---

গলার স্বর স্বাভাবিক করে ফোনে কথা বলুন। কালো ছায়ামূর্তি অভয়কর বিশ্বাসের কানে মুখ নিয়ে কথাটা বললো। হাঁ, এবার বলুন যে শ্রমিকের দল আজ ক'দিন ব্যাপী ধর্মঘট চালানোর পর তারা কারখানার বাইরে ফুটপাতে অপেক্ষা করছে তাদের ন্যায্য পাওনার দাবী নিয়ে—তাদের পাওনার ডবল যেন দিয়ে দেয়া হয়। বলুন, বলুন---

অভয়করের চোখে শর্ষে ফুল ঝরে পড়ে, হাজার হাজার শ্রমিক তার কারখানায় কাজ করে, এদের প্রাপ্য মজুরি তার ডবল দিতে গেলে যে লক্ষ টাকার বেশি লাগবে! তবু বলতে বাধ্য হলেন অভয়কর— হ্যালো--- ম্যানেজার বাবু--

ওপাশ থেকে ভেসে আসে ম্যানেজার বাবুর গলা—হ্যালো--বলুন স্যার---

--আমার কোম্পানীর শ্রমিকগণ যারা ক'দিনব্যাপী ধর্মঘট চালানোর পর সন্ধ্যা থেকে কারখানার বাইরে ধন্না দিচ্ছে তাদের টাকা....মানে ওদের পাওনা টাকার উপর কিছু বেশি--

চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলো কালো ছায়ামূর্তি—কিছু বেশি নয়, বলুন ডবল দিতে।

হ্যালো---হাঁ ওদের ডবল দাম দিয়ে দিন।

ওপাশ থেকে ম্যানেজারের অবাক গলা—স্যার, আজ এতোগুলো টাকা দুর্বৃত্ত চুরি করে নিলো তারপর আবার ---

--হ্যাঁ দিয়ে দিন---

আবার ম্যানেজারের কণ্ঠ—স্যার কোম্পানীর অফিস থেকে টাকা দেবো?

কালোমূর্তি রিভলভার দিয়ে অভয়করের ললাটে চাপ দিয়ে বললো—বলুন, হাঁ।

অভয়কর ঢোক গিলে বললেন—হাঁ।

রাখুন রিসিভার।

অভয়কর রিসিভার রেখে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন —তুমি কে?

জমকালো মূর্তি চাপা গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি হিতৈষীবন্ধু।

কার?

তোমার এবং দেশের। এবার কালোমূর্তি রিভলভার অভয়করের বুকো চেপে ধরে বললো—চলুন বাথরুমে। আপাততঃ ওখানেই আপনাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

বাথরুমে।

হাঁ। যতক্ষণ আপনার কোম্পানী থেকে শ্রমিক দল বিদায় গ্রহণ না করে ততক্ষণ আপনি ঐ বাথরুমে বন্দী থাকবেন।

অভয়কর কালোমূর্তির আদেশ পালনে বাধ্য হলেন।

বাথরুমে প্রবেশ করে কালোমূর্তি পকেট থেকে সিল্কের রুমাল এবং নায়লনের দু'খানা কর্ড বের করে অভয়করকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো। মুখখানা রুমালে বাঁধলো, আর হাত বাঁধলো মজবুত কর্ড দিয়ে। তারপর বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো।

ভয়ঙ্কর অভয়কর বিশ্বাসকে কালোমূর্তি কাবু করে ফেলেছিলো। তার বুদ্ধি -কৌশল আর রিভলভারের চাপ দিয়ে।

অভয়কর বিশ্বাস যে কক্ষে বসতেন সে কক্ষে কারো প্রবেশ নিষেধ ছিলো। যতক্ষণ তিনি কলিং বেলে হাত না দিতেন ততক্ষণ কেউ প্রবেশ করতে সক্ষম হতো না সে কক্ষে। কাজেই অভয়করকে কালোমূর্তি বাথরুমে বন্দী করলেও কেউ জানলো না।

❑

অভয়কর বিশ্বাসকে যখন বাথরুম থেকে বের করে আনা হলো তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। তিনি ছাড়া পেয়েই গাড়ি নিয়ে ছুটলেন কোম্পানী অভিমুখে।

কিন্তু অভয়কর বিশ্বাস যখন কোম্পানীর লৌহগেটের সম্মুখে এসে পৌঁছলেন তখন তার মাথায় বাজ পড়লো। শ্রমিকদল খুশীমনে বিদায় নিয়ে চলে গেছে নিজ নিজ আবাসে।

অভয়কর বিশ্বাস মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন অফিসরুমের সোফায়।

মালিকের আগমনে বিলম্ব দেখে চঞ্চলভাবে ঘর-বার করছিলেন ম্যানেজার বাবু। তিনি বিশ হাজার টাকা চুরি যাওয়ার সংবাদ ফোনে জানানোর পর মালিক জানালেন, এক্ষুণি আমি আসছি অথচ তিনি পরক্ষণেই পুনরায় ফোনে জানালেন ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের পাওনা টাকার ডবল পরিমাণ তাহাদের দিয়ে দিতে — ম্যানেজার ভেবে পাননা একি ব্যাপার!

এক্ষণ মালিককে হন্তদন্তভাবে কোম্পানীর অফিস রুমে প্রবেশ করে সোফায় বসে পড়তে দেখে ম্যানেজার ঘাবড়ে গেলেন। তিনি ফ্যানের স্পীড্ বাড়িয়ে দিয়ে পাশে এসে দাঁড়ালেন, বিনীত কণ্ঠে বললেন—স্যার।

অভয়কর বিশ্বাস এবার সোজ হয়ে বসলেন, তারপর বললেন—সব দিয়ে দিয়েছেন?

শ্রমিকের টাকার কথা বলছেন স্যার?

হাঁ, সব দেয়া হয়েছে বুঝি?

আপনি বলায় আমি সেভাবে শ্রমিকদের---

সর্বনাশ করেছেন! সর্বনাশ করেছেন ম্যানেজার বাবু। সর্বনাশ করেছেন।

স্যার আপনি---

ম্যানেজার বাবু, যে ডাকু আপনার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা কেড়ে নিয়েছে, সে ডাকুই আমাকে ফোন করতে বাধ্য করেছে। আমাকে রিভলভারের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করেছিলো আপনার কাছে ফোন করতে।

স্যার এ আপনি কি বলছেন?

অদ্ভুত কলো পোশাক পরা এক যুবক—মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো রুমাল বাঁধা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার-হঠাৎ আমার কক্ষে প্রবেশ করে সে আমাকে বাধ্য করে নিয়েছিলো।

ম্যানেজার বললেন—স্যার, ঠিক্ আমার গাড়ি রুখে যে ব্যক্তি টাকা কেড়ে নিয়েছে তার দেহেও কালো পোশাক ছিলো— মাথায় ক্যাপ, মুখে কালো রুমাল বাঁধা। আমাকে রিভলভার দেখিয়ে বিশ হাজার টাকা ব্যাগ সমেত সে নিয়ে উধাও হয়েছে।

অভয়কর বলে উঠলেন—একই ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কে সে যার এতাবড় সাহস আমার সঙ্গে শয়তানী করে—

একটু থেমে বললেন অভয়কর বিশ্বাস —পুলিশে সংবাদ দিয়েছেন?

ম্যানেজার বাবু বললেন—হাঁ, আমি সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থানায় গিয়ে ডায়রী করেছি।

বেশ, এখন আমি নিজে পুলিশ—সুপারের অফিসে গিয়ে সব জানিয়ে আসবো। হাঁ, শুধু পুলিশে জানিয়েই আমি ক্ষান্ত হবো না ম্যানেজার বাবু।

বলুন স্যার?

আমার কোম্পানীর শ্রমিকদের মধ্যেই কেউ এ শয়তানী করেছে, আমি বুঝতে পেরেছি।

ম্যানেজার বাবু বললেন—আমার সে রকম সন্দেহ হচ্ছে। কারণ, শ্রমিকদের প্রতি ডাকুর এমন দরদ কেন?

দেখুন কারো সাধ্য নেই, আমার উপর শয়তানি করে নিজেকে গোপন রাখে। আমি প্রতিটি শ্রমিককে পাকড়াও করে এনে এর প্রতিশোধ নেবো। আচ্ছা, আমার কারখানার ফায়ারম্যানকে ডাকুন, আমি তার দ্বারাই সন্ধান নেবো বা নিতে সক্ষম হবো।

তখনই ফায়ারম্যানকে ডাকা হলো।

বিশালদেহী বলিষ্ঠ জোয়ান একটি লোক এসে দাঁড়ালো কোম্পানীর অফিস-রুমে।

লোকটাকে দেখলেই ভয় হয়। যে কোনো দুর্বল লোকের প্রাণ শিউরে উঠবে তার চেহারা দর্শনে। অভয়করের সিমেন্ট কারখানার হেড্ ফায়ারম্যান সে—নাম ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস এভীম সিংকে সব সময় সমীহ করে চলতেন; কারণ এর দ্বারা তিনি অনেক কু-কর্ম সাধন করতে সক্ষম হতেন অনায়াসে। কলকাতার নামকরা গুণ্ডা-সর্দার মহাতক সিং-এর পরম বন্ধুজন ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস ভীম সিংকে বললেন—ভীম সিং, এক বাৎ শুনো!

বলিয়ে বড় সাহাব?

তুমারা যানে হোগা মেরা সাৎ।

কাঁহা বড় সাহাব বলিয়ে?

ভীম সিং-এর গোঁফজোড়া খাড়া হয়ে উঠলো.......এমনি আরও কত রাতে অভয়কর বিশ্বাস ভীম সিংকে আদেশ দিয়েছেন—কারো বাড়ি—ঘরে আগুন ধরিয়ে বেটাকে পাকড়াও করে আনতে। হয়তো বা কারো সুন্দরী স্ত্রী বা কন্যাকে চুরি করে আনার বেলাতেও ভীম সিং। কোনো শ্রমিক অপরাধ করলে তাকে সাজা দেবার বেলাতেও সে, কাজেই আজ আবার কোন্ কাজে তার ডাক পড়েছে ভেবে পায় না ভীম সিং। অবশ্য এসব কাজে তার মাইনে বাদেও মোটা টাকা বখশীস আছে। ভীম সিং অভয়করের সিমেন্ট কারখানায় প্রায় দশ বছর হলো চাকরি করছে। আজকাল ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা

শিখেছে কিছুটা, তবু বলতে তার অসুবিধা হয়। কারখানায় কয়েকজন পাঠান এবং শিখ পাহারাদার আছে, এরা সবাই অভয়কর বিশ্বাসের বিশ্বস্ত কর্মচারী। যেমন দুর্দান্ত তেমনি ভয়ঙ্কর এদের আচরণ।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—মেরা গাড়িমে তুম্ চলো।

ভীম সিং বড় সাহেবকে অনুসরণ করলো।

❑

অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি সোজা গিয়ে পৌঁছলো শ্যামবাজার একটি ছোট্ট গলির মধ্যে। পোড়ো বাড়ির মত একটা অপরিস্কার বাড়ির সম্মুখে গাড়ি রুখতে বললেন অভয়কর বিশ্বাস ড্রাইভারকে।

অভিজ্ঞ ড্রাইভারটাও আজ যেন কেমন বোকাটে বনে গেছে। অভয়কর বিশ্বাস এ নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়ে আজ একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছেন নইলে তিনি ড্রাইভারের আচরণে অসন্তুষ্ট হতেন।

অভয়কর বিশ্বাস গাড়িতেই বসে রইলেন। গাড়ি থেকে নেমে গেলো ভীম সিং।

ভাঙ্গাচোরা বালি খসে পড়া পোড়ো বাড়ির মত ঠিক দেখতে বাড়িটা। ভীম সিং চলে গেলো, একটু পরে একটা ভীষণকায় লোকসহ ফিরে এল সে।

লোকটা গাড়ির মধ্যে অভয়কর বিশ্বাসকে দেখে কুর্ণিশ জানালো— বাবুসাব আপ্!

হাঁ, মহাতক সিং একটা বিপদে পড়ে আমি তোমার স্মরণাপন্ন হয়েছি।

আপ্ অন্দরমে আইয়ে না বাবুসাব?

না, এখানে বসেই দুটো কথা তোমাকে বলে যাবো, তারপর আসবো।

কহিয়ে বাবুসাব? মহাতক সিং নিজের কণ্ঠকে যতদূর সম্ভব নরম করে বললো।

অভয়কর বিশ্বাস এদিক -ওদিক তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলেন।

হেসে বললো মহাতক সিং—এ গলি মে কই নাহি আসবে বাবুসাব, আপ্ বাত কহিয়ে?

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—আজ রাত সাড়ে আটটায় কিংবা ন'টা হবে আমার ম্যানেজার বাবু খিদিরপুর থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে ফিরছিলো, পথে তার গাড়ি আটক করে এক জমকালো পোশাক পরা দুর্বৃত্ত তার নিকট হতে সমস্ত টাকা কেড়ে নিয়েছে---

বিশ হাজার রুপিয়া। বললো মহাতক সিং।

ভীম সিংও কথাগুলো মনোযোগ সহকারে শুনছিলো।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন আবার— বিশ হাজার টাকা তো সে ম্যানেজারের নিকট হতে নিয়েছে, তারপর আমার বাড়িতে হানা দিয়ে জোরপূর্বক আমাকে বাধ্য করিয়েছিলো কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকটে ফোন করতে--

সাঁচ বাত?

হাঁ, আমাকে বাধ্য করেই ম্যানেজারের নিকটে বলিয়েছিলো ধর্মঘটকারী শ্রমিকদের যেন ডবল দাম দিয়ে দেয়া হয়।

এ কোন্ শয়তান? বলে উঠলো ভীম সিং।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—মহাতক, তোমার কাছে এলাম, তুমি সমস্ত কলকাতার গুণ্ডাদলের নেতা। নিশ্চয়ই এ জমকালো পোশাক-পরা লোকটা তোমার দলের হবে।

নেহি বাবুসাব, হামার আদমী নেহি এ-কাম করিয়াছে।

ভীম সিং বললো—হাম্ ভি তো উছে মালুম কিয়া।

কিন্তু কলকাতার লোক ছাড়া বাইরের তো কেউ এসে সাহস পাবে না। জানে না অভয়কর বিশ্বাস শুধু সিংহশাবক নয়, সে তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। মহাতক সিং, এ তোমার লোক না হলে কে? কে সে এ জমকালো পোশাক-পরা বুদ্ধিমান ডাকু?

হামি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবু সাব, হামার আদমী হোবে তাহলে আপনি সব রুপিয়া পাইয়ে যাবেন।

রুপিয়া পাই না পাই দুঃখ নেই মহাতক সিং, যদি তুমি তাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হও, তাহলে তোমাকে আরও বিশ হাজার দেবো।

বাবুজী!

হাঁ মহাতক সিং, অভয়কর বিশ্বাস টাকা যেমন লুটে নিতে জানে তেমনি জানে ছড়িয়ে দিতে। ভীম সিং!

বলিয়ে বড়া সাব?

এ ব্যাপারে তুমি মহাতক সিংকে যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

হাম্ জান দেকে বদমাস ডাকু কো পাকাড় লেঙ্গে। আপ্ কই চিন্তা নেহি করিয়ে বড়া সাব।

মহাতক সিং বলে উঠে-কলকত্তা মে কই ডাকু হামারা নজরছে রেহাই না পায়েগা বাবুসাব! হামারা নাম মহাতক সিং। হাম্ দেখে গা কাঁহা কোন্ আদমী আপ্কা রুপেয়া লুট লিয়া---

মহাতক সিং সে কারণেই আমি এসেছি তোমার কাছে। পুলিশ যা পারবে না, আমি জানি সে কাজ পারবে তুমি।

আপ্ লোক্ কা মেহেরবানী বাবু সাব। বললো মহাতক সিং।

এবার বল্‌লেন অভয়কর বিশ্বাস—মহাতক সিং, তুমি আমায় সাহায্য করবে।

ঠিক্ জরুর করিবে বাবু সাব।

আচ্ছা তাহলে চলি। বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

বহুৎ আচ্ছা—সেলাম! মহাতক সিং হাতখানা উঠিয়ে কপালে ঠেকালো।

ভীম সিং উঠে বসলো গাড়িতে।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দেবার পূর্বে আর একবার পোড়া বাড়িখানার দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখে নিলো।

গাড়িখানা স্পীডে ছুটতে শুরু করলো এবার।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—ভীম সিং, কাল সকালে কোম্পানীর সমস্ত শ্রমিকদের কারখানায় আসতে বলবে। তারপর আমি সবাইকে কেমন সায়েস্তা করতে হয় করে নেবো। ভীম সিং, তুমি নিজে গিয়ে ওদের দলের সর্দারকে ধরে নিয়ে আসবে।

বহুৎ আচ্ছা বড় সাব।

আমার মনে হয় বেটা সর্দার নাসির আলীর ঐ কাজ।

ভীম সিং বলে উঠে— হাম্ ব্যাটা নাসির আলীকে জান নেকাল্ লেঙ্গে---দাঁতে দাঁত পিষে কথাটা বললো সে।

গাড়ির হ্যাণ্ডেলের ওপর ড্রাইভারের হাত দু'খানা মুষ্ঠিবদ্ধ হলো। এ মুহূর্তে—তার মুখোভাব কেউ যদি লক্ষ্য করতো তাহলে সে বুঝতো—ড্রাইভার স্বাভাবিক জন নয়।

বালিগঞ্জ অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে গাড়ি পৌছলো। ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো।

অভয়কর বিশ্বাস নেমে গেলেন।

নেমে যাবার সময় বললেন অভয়কর বিশ্বাস—যতীন, ভীম সিংকে কোম্পানীর অফিসে পৌছে দিয়ে এসো।

ড্রাইভার বললো— আচ্ছা স্যার।

মালিক গাড়ি থেকে নেম দাঁড়াতেই ভীম সিংও তার আসন ত্যাগ করে নেমে দাঁড়িয়েছিলো, এবার সে উঠে বসলো ড্রাইভ আসনের পাশের আসনে।

ড্রাইভার গাড়ি বের করে আনলো রাস্তায়।

❑

পরদিন অভয়কর বিশ্বাস সবেমাত্র চায়ের টেবিলের পাশে এসে বসেছেন এমন সময় রঘুনাথ বাগানের মালী সসব্যস্তে ছুটে আসে—হুজুর, হুজুর, এক অদ্ভুত কাণ্ড। দেখবেন আসুন হুজুর---

কি হয়েছে? ধমক দিয়ে বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

রঘুনাথের দু'চোখে ভয়-ভীতি আর বিস্ময়, কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছিলো সে, ঢোক গিলে বললো— হুজুর গ্যারেজে চলুন, দেখবেন হুজুর, চলুন---

কি হয়েছে বল না?

হুজুর ড্রাইভার যতীনকো কেউ হাত-পা-মুখ বেঁধে গ্যারেজে ফেলে রেখেছে হুজুর ওধারের চার নাম্বার ফাঁকা গ্যারেজে।

বলিস কি রঘু?

হ্যাঁ স্যার, দেখবেন চলুন।

অভয়কর বিশ্বাস এবং আরও দু'চার জন লোক ছুটলেন চার নাম্বার ফাঁকা গ্যারেজটার দিকে।

চার নাম্বার গ্যারেজটার গাড়ি একটা সামান্য এক্সিডেন্টে জখম হয়ে মোটর—কারখানার হস্‌পিটালে চিকিৎসাধীন ছিলো। গ্যারেজটা সম্পূর্ণ খালি ছিলো।

অভয়কর বিশ্বাস এবং অন্যান্য লোকজন সবাই অবাক হয়ে দেখলো— গ্যারেজের মেঝেতে হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে যতীন— তাঁর নিজস্ব গাড়ির ড্রাইভার।

অভয়করের আদেশে ড্রাইভারের হাত-পা-মুখের বাঁধন উন্মোচন করে দেয়া হলো।

যতীন এবার মুক্তিলাভ করে উঠে বসলো গ্যারেজের মেঝেতে।

অভয়কর বিশ্বাস গর্জন করে উঠলেন—তোমার এ অবস্থা কেন?

যতীন বন্ধন অবস্থায় চেপে যাওয়া স্থানগুলোতে হাত বুলাতে বুলাতে বললো—স্যার, কাল রাতে আপনি যখন আমাকে গাড়ি বের করার আদেশ দিলেন, তখন আমি গ্যারেজে প্রবেশ করে গাড়ি বের করতে যাবো—অমনি জমকালো একটা মূর্তি আমার বুকে রিভলভার চেপে ধরলো। তারপর আমার মুখে রুমাল চাপা দিলো, একটা সুমিষ্ট গন্ধ প্রবেশ করলো আমার নাকের মধ্যে, স্যার, তারপর আর আমার কোনো কথা স্মরণ নেই---

বলো কি! কাল রাতে তুমি আমার গাড়ি ড্রাইভ্ করে আমাকে কোম্পানীতে নিয়ে যাও নি?

না স্যার।

অভয়কর বিশ্বাসের দু'চোখে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো যেন, তিনি বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে আবার বললেন—শ্যামবাজার মহাতক সিং-এর বাড়ি-

না স্যার, আমি সন্ধ্যার পর আর কোথাও গাড়ি নিয়ে যাইনি।
বলো কি যতীন?
স্যার!
সর্বনাশ, তাহলে ঐ বদমাইস বেটা শয়তান আমার ড্রাইভার সেজে---
কথা শেষ না করে বাম হস্তের তালুতে দক্ষিণ হস্তে মুষ্টিঘাত করেন।
এমন সময় সরকার ভূতনাথ বাবু ব্যস্তভাবে এসে দাঁড়ান— স্যার, কোম্পানীর অফিস থেকে ম্যানেজার বাবু ফোন করেছেন। জরুরী সংবাদ আছে স্যার।
জরুরী! কি আবার জরুরী সংবাদ এলো এ সাত সকালে। অভয়কর বিশ্বাস হলঘরের দিকে চললেন।
নিজস্ব কক্ষে প্রবেশ করে রিসিভার তুলে নিলেন হাতে—হ্যালো স্পিকিং অভয়কর বিশ্বাস---কি বললেন --কি বললেন--ভীম সিং তার কামরায় বন্ধন অবস্থায় ---এ্যাঁ একি বলছেন---হাত -পা-মুখ সব মজবুত করে বাঁধা--! এখানেও আমার ড্রাইভারের সে একই অবস্থা-- হাঁ নিশ্চয়ই সেই দুর্বৃত্ত শয়তানের কাজ। আচ্ছা এক্ষুণি আসছি--
রিসিভার রেখে পায়চারী শুরু করলেন অভয়কর বিশ্বাস। কে তার পিছনে এমন করে লেগেছে—কার এতোবড় সাহস! তার ড্রাইভারকেও গ্যারেজে বন্ধন অবস্থায় রেখে তার গাড়ি ড্রাইভ করে নিয়ে গিয়েছিলো, আর সে জমকালো ছায়ামূর্তিই ভীম সিংকে তার কামরায় হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছে, তারই এ-কাজ। কিন্তু কে সে দুর্দান্ত দুরাত্মা।

❑

বনহুর তার ক্যাবিনে বিশ্রাম করছিলো।
মিঠু টেবিলে চা-নাস্তা সাজিয়ে রেখে বললো—স্যার, চা দিয়েছি।
ও! অন্যমনস্কভাবে কিছু চিন্তা করছিলো বনহুর, মিঠুর কথায় উঠে দাঁড়ালো— চা দিয়েছিস্?
হাঁ স্যার।
বনহুর চায়ের টেবিলে এসে বসে। চায়ের কাপ হাতে তুলে নিতেই নজর পড়ে টেবিলো সেদিনের পত্রিকাখানার উপর। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে পত্রিকাখানা তুলে নেয় হাতে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় অক্ষরে প্রকাশ পেয়েছে—

"প্রকাশ্য রাজপথে দুর্দান্ত ডাকতি"

কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত বাবু অভয়কর বিশ্বাসের প্রধান ম্যানেজার বিনোদ সেন গত রাত্রে যখন তাদের খিদিরপুর কোম্পানী থেকে বিশ হাজার টাকা নিয়ে বালিগঞ্জ অফিসে ফিরছিলেন তখন এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত তার গাড়ি আটক করে সমস্ত-টাকা কেড়ে নেয়। ঐ রাত্রেই পুনরায় সে জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের নিজস্ব কামরায় হানা দেয় এবং তাঁকে জোরপূর্বক তাঁর কোম্পানীর ম্যানেজারের নিকটে ফোন করতে বাধ্য করে। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসকে তার শ্রমিকদের ডবল পরিমাণ পারিশ্রমিক দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাস দুর্বৃত্তের রিভলভারের ভয়ে তার কথামত কাজ করতে বাধ্য হন। পুলিশ এ ব্যাপার নিয়ে জোর তদন্ত চালাচ্ছে।

বনহুরের মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো, একটা সিগারেট বের করে অগ্নিসংযোগ করে একমুখ ধূয়া ছুঁড়ে দিলো সম্মুখ দিকে—তারপর হঠাৎ অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠলো সে—হাঃ হাঃ হাঃ ----

মনিবের সম্মুখে চা-নাস্তার প্লেট দিয়ে একপাশে দাঁড়িয়েছিলো মিঠু। যদিও সে হোটেলেই বয় হিসেবে কাজ করে তবু বনহুর ওকে হোটেলের ম্যানেজারের কাছে বলে নিজস্ব চাকর হিসেবে গ্রহণ করেছে। অবশ্য যত দিন এ হোটেলে থাকবে বিশেষ করে ততদিনের জন্য। এ জন্য বেশ কিছু টাকাও জমা দিয়েছে হোটেল অফিসে। মিঠুকে বনহুরের প্রথম থেকেই ভাল লেগেছিলো, বেশ কর্মঠ এবং বিশ্বাসী বলে মনে হয়েছিলো তার। মিঠুর মিষ্টিমধুর স্বভাব তাকে মনোমুগ্ধ করেছিলো। আসলে বনহুর সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান, সে এক নজরে মানুষকে চিনে নিতো। এমনকি সে লোকের মুখ দেখলেই তার অন্তরের কথা বুঝে নিতো, অদ্ভুত এ দক্ষতা ছিলো তার। মিঠুকে তাই বনহুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে আপন করে নিতে পেরেছিলো প্রথম দিন থেকেই। ছেলেটি সরল এবং বিশ্বাসী তাতো-কোনো সন্দেহ নেই। মিঠুও হঠাৎ যেন ভালবেসে ফেলেছিলো নতুন আগন্তুকটিকে। এ হোটেলে কাজ করার পর তাকে বহু লোকের তত্ত্বাবধান করতে হয়েছে, কিন্তু কাউকে তার এতো ভাল লাগেনি। প্রথম নজরে মিঠুর একটা শ্রদ্ধা এসে গিয়েছিলো বনহুরের প্রতি।

হঠাৎ বনহুরের হাসিতে অবাক হয়ে যায় মিঠু, বলে—স্যার, কাগজে কি লিখা আছে?

বনহুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো, মিঠুর কথায় কোনো জবাব দেয় না। সিগারেট থেকে অবিরত ধূম্র নির্গত করে চলে। কুণ্ডলীমান ধূম্ররাশির দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় তালিয়ে যায়---শুধু অভয়কর বিশ্বাসকে সায়েস্তা করলেই চলবে না—এমন আরও কতগুলো দুর্দান্ত শয়তান আছে, তাদেরকেও দমন করতে হবে। বাংলাদেশে যখন সে আগমন করেছে তখন সে দেখে নেবে একবার সবাইকে---

স্যার চা-নাস্তা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো যে।

মিঠুর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর—উঁ!

স্যার, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

বনহুর চায়ের কাপটা তুলে নেয় হাতে।

চা-নাস্তা খাবার পর উঠে পড়ে বনহুর—মিঠু, আমি বাইরে যাচ্ছি, ফিরতে হয়তো দেরী হবে।

আচ্ছা স্যার।

বনহুর বেরিয়ে যায়।

মিঠু বনহুরের পরিত্যাক্ত পোশাক-পরিচ্ছদগুলো সুন্দর করে গুছিয়ে রাখে।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো মানিকতলা শ্রমিকদের বস্তির পাশে।

অপরিচ্ছন্ন নিকৃষ্ট একটা জায়গা।

টিন এবং খোলার ছোট ছোট চালাঘর। কোনটার বা চালের খানিকটা অংশ নেই, সেখানে গুঁজে রাখা হয়েছে কেরোসিন তেলের টিনের পাত বা ছেঁড়া চট। ঘরগুলোর বেড়াও মজবুত নয়, বাঁশের চাটাই বা ঐ ধরণের এটা সো দিয়ে কোনো রকমে চারধার ঘেরাও করা হয়েছে।

বনহুর এসে দাঁড়ালো এ বস্তির মধ্যে। দেহে তার স্বাভাবিক পাজামা আর পাঞ্জাবী —সাধারণ ড্রেস।

বনহুরকে দেখেই কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ হাড়-জিড়জিড়ে ছেলেমেয়ে এসে ঘিরে দাঁড়ালো—অবাক হয়ে সবাই দেখছে বনহুরকে। তাদের এ নিকৃষ্ট বস্তিতে কোনো ভদ্রলোক তো আসে না কোনোদিন, তাই ওদের চোখে এত বিস্ময়।

কতগুলো অর্ধ-উলঙ্গ নারী কুঠিরের মধ্য থেকে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো, সম্মুখে বেরুবার মত কাপড় তাদের দেহে নেই। ময়লা জীর্ণ তালিযুক্ত কাপড় দিয়ে কোনোরকমে যেন লজ্জা নিবারণ করছে ওরা।

বনহুর এগুলো বস্তির ভিতরে। বিরাট কলকাতা শহরের বড় বড় অট্টালিকার আড়ালেও যে এমন অপরিচ্ছন্ন-অপরিস্কার বিদঘুটে বস্তি আছে ভাবতেও যেন কেমন লাগে। যেমন বস্তি তেমনি তার মানুষগুলো। শহরের পরিচ্ছন্ন বাবুদের পাশে এরা যেন এক একটা অদ্ভুত জীব।

বনহুর যত এগোয় তত অবাক হয়।

একটা বস্তির ছোট হোটেলের পাশে এসে থমকে দাঁড়ায় বনহুর, দেখতে পায়—কতগুলো নেংটা ছেলে-মেয়ে একটা ডাষ্টবিনের পাশে স্তুপাকার ময়লা আবর্জনার মধ্যে এঁটো পাতা আর উচ্ছিষ্ট মাংসের হাড়গোড় নিয়ে মারামারি-কাড়াকাড়ি করছে। বর্ষার দিন না হলেও ভেজা স্যাঁত সেঁতে জায়গা—একটা উৎকট দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে সেখান থেকে। হয়তো মাছের পঁচা আঁশের গন্ধ হবে। বনহুর দাঁড়াতে পারে না, এগিয়ে যায় হোটেলটার দিকে।

হোটেলের মালিক পায়া-ভাঙ্গা একটা টেবিলের সামনে হাতল ভাঙ্গা একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে হিসাব লিখছিলো। কতগুলো বস্তির কুলি-

মজুরের দল হোটেলের চালার নীচে বসে খোশ গল্প করছিলো আর টিনের বাটিতে চা পান করছিলো।

হঠাৎ মালিকের নজর পড়ে গেলো বনহুরের দিকে। এমন ধরনের ভদ্রলোক সচরাচর এদিকে কোনোদিন দেখেনি সে, তাড়াতাড়ি আসন ছেড়ে এগিয়ে এলো—স্যার, কি চাই?

বনহুর বললো—বস্তির সর্দারকে আমার প্রয়োজন কোন্ দিকে যাবো?

মালিক বললো—নাসির আলীকে খুঁজছেন স্যার?

হাঁ ঠিক্ বলেছো।

মালিক ডাকলো —গণেশ, গণেশ---

কি বলছো দাদা? ওদিকের বেঞ্চিতে বসে পান চিবুচ্ছিলো একটি লোক; মালিকের ডাকে জবাব দিলো।

মালিক বললো আবার—গণেশ, তোদের সর্দারকে উনি খুঁজছেন, ডেকে .দে দেখি।

গণেশ গা-মোড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, তারপর এগিয়ে এলো বনহুরের সামনে—কাকে চান বাবু?

তোমাদের সর্দারকে চাই।

চলুন বাবু। আগে আগে চললো গণেশ।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো। তার গাড়িখানা বস্তির গলির মুখে রেখে এসেছে।

নোংরা অপরিস্কার কর্দমযুক্ত গলির মধ্যে এগুতে এগুতে বললো গণেশ— বাবু, আমরা যেমন জায়গায় বাস করি তেমন জায়গায় আপনাদের আসা চলে না। কোনো রকমে জীবনে বেঁচে আছি আমরা।

বললো বনহুর—তা দেখতেই পাচ্ছি!

গলির দু'পাশে স্তূপাকার আবর্জনা, পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিলো বনহুরের, দুর্গন্ধে পেটের নাড়িভূড়ি বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিলো তার।

পথ চলতে দু'পাশের খুপড়িগুলোর মধ্যে নজর যাচ্ছিলো, ভিজে স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে কতগুলো কালি-মাখা হাড়ি-পাতিল ছড়িয়ে আছে। কোনোটার মধ্যে খেঁজুর পাতার চাটাই বিছিয়ে জীর্ণদেহী কোনো মহিলা শিশুকে আঁকড়ে ধরে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছিলো। কোনোটার মধ্যে নেংটা দুটো ছেলে ভাতের ফ্যান নিয়ে কাড়াকাড়ি করছে। তাদের চারপাশে বনবন করে উড়ছে মাছিগুলো। বনহুরের চোখে এসব দৃশ্য যেন অসহ্যনীয় লাগছে। এমনিভাবে মানুষ কোনো দিন বাঁচতে পারে!

একটা খুপড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো গণেশ। খানিকটা জায়গা চটের আড়াল করে উঠান তৈরি করা হয়েছে। একপাশে কতগুলো হাঁস-মুরগী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে ঘুরছিলো!

গণেশ ডাকলো—আলী ভাই, আলী ভাই---

অর্ধবয়স্ক এক বলিষ্ঠ পুরুষ বেরিয়ে এলো গণেশের সঙ্গে। একজন ভদ্রলোককে দেখে আদাব দিলো সে।
গনেশ বললো—বাবু এ আমাদের নাসির আলী ভাই।
বনহুর নাসির আলীর পা থেকে মাথা অবধি নজর বুলিয়ে নিয়ে বললো—তুমি কি খিদিরপুর অভয়কর বিশ্বাসের সিমেন্ট কারখানার কাজ করো?
জ্বি হাঁ।
কথা আছে তোমার সঙ্গে।
বাবু, এখানে দাঁড়িয়ে তো কথা হয় না, কিন্তু ---নাসির আলী ভিতরে চলে গেলো, একটু পরে ফিরে এলো একটা ছোট্ট টুল নিয়ে। দ্বিধাজড়িত গলায় বললো—কোথায় বসতে দি বাবু---
থাক্ থাক্ বসতে হবে না, দাঁড়িয়েই হবে। নাসির আলী, সিমেন্ট কারখানায় তোমরা কতজন আন্দাজ কাজ করো?
একটু চিন্তা করে বলে নাসির আলী—প্রায় দু'হাজার আড়াই হাজারের মত---একটু থেমে বলে সে—আপনি কি আমাদের মালিকের লোক?
না, তোমাদের মালিকের লোক আমি নই।
আপনি তাহলে---
মনে করো আমি তোমাদেরই একজন।
অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে নাসির আলী আর গণেশ বনহুরের পৌরুষদীপ্ত সুন্দর মুখখানার দিকে। কে এ যুবক যে তাদের এ নিকৃষ্ট বস্তির মধ্যে বিনা সঙ্কোচে প্রবেশ করে এমন সহানুভূতিপূর্ণ কথা বলতে পারে! চিরদিন যারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আর তিরস্কার পেয়ে এসেছে। মততায় ভরে উঠে ভদ্রযুবকের আবেগমধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে।
বনহুর বলে—নাসির আলী, আমি তোমাদের সাহায্য করতে চাই। তোমাদের মালিক যেন আর তোমাদের উপর অত্যাচার-অনাচার-উৎপীড়ন চালাতে না পারে এ ব্যবস্থাই আমি করবো।
বাবু!
নাসির আলী আমার কথা মত চলতে পারবে?
পারবো। কি করতে হবে বলুন বাবু?
তোমরা সমস্ত শ্রমিক মিলে কাজ বন্ধ করে দাও।
তাতো দিয়েছিলাম। দু'সপ্তাহ আমরা ধর্মঘট করেছিলাম। বাবু এ কদিনে আমরা শুকিয়ে মরেছি। আমাদের ঘরে তো কোনো খাবার নেই, তাই মালিক যা দেন তাতেই আমরা খুশী হয়ে কাজ করি।
এবার থেকে তোমাদের মজুরি ডবল বাড়িয়ে না দিলে কিছুতেই কাজ করবেনা।
তাহলে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে বাবু।
যাতে তোমরা না মরো সে চেষ্টা আমি করবো।

কিন্তু মালিক কাল রাতে আমাদের পাওনা টাকার ডবল দিয়েছেন।
সে টাকা পেয়েই বুঝি ভুলে গেছো সব?
না বাবু, তা কি আর ভুলি। জানি, একটা কোনো নতুন ফন্দি এঁটেছেন তাঁরা।
হাঁ, নতুন ফন্দিই বটে, শোন তোমরা কাল রাতে যে ডবল মজুরি পেয়েছো— তার জন্য তোমাদের সাজা পেতে হবে।
সাজা? কেন? বললো নাসির আলী।
বনহুর বললো—মালিক নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমাদের টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা, আমি তোমাদের যেভাবে বলবো সেভাবে কাজ করবে।
গণেশ আর সে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো একবার। হয়তো কোনোরকম সন্দেহের দোলা লেগেছে তাদের মনে। হঠাৎ অজানা অচেনা একটা যুকের মুখে এসব কথা—আশ্চর্য হয়ে গেছে ওরা।
বনহুর বললো—নাসির আলী, অভয়কর বিশ্বাস তোমাদের উপর জুলুম চালাবে, কিন্তু কিছুতেই তোমরা কাজে রাজী হবে না। আমি জানি, তোমাদের দ্বারা যে সিমেন্ট তৈরি হয় তার অর্ধেক ভেজাল মেশানো থাকে।
বাবু, এ কথা আপনি কি করে জানলেন? বললো নাসির আলী।
গণেশের মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠলো, আবার নাসির আলী আর গণেশ একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। কারণ তাদের সিমেন্ট কারখানার ভেজাল ব্যাপারের গোপন রহস্য একমাত্র কারখানার ভিতরের লোক ছাড়া আর কেউ জানে না।
বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—সিমেন্টে আর একচুল ভেজাল মেশানো চলবে না।
বাবু, আমাদের কোনো দোষ নেই। বললো গণেশ।
নাসির আলী বললো —আপনি নিশ্চয়ই সি. আই. ডি পুলিশের লোক?
হাঁ, পুলিশের লোক বটে। আচ্ছা, মনে থাকবে আমি যা বললাম?
থাকবে বাবু।
যদিও তোমরা ধর্মঘট ভেংগেছো, তবু তোমরা কাজে যোগ দেবে না, যতক্ষণ মালিকা তোমাদের পারিশ্রমিক ডবল বাড়িয়ে না দেন। আর দ্বিতীয় কথা—কারখানায় যে সিমেন্ট তৈরি হবে তাতে কোনো রকম ভেজাল মেশাতে পারবে না।
মালিক যদি হুকুম করেন তাহলে আমরা কি করবো?
তোমরা তাহলে কাজ করতে রাজি হবে না।
কিন্তু---
কোনো কিন্তু নয় নাসির আলী। হাঁ, এ নাও---বনহুর পকেট থেকে এক তোড়া নোট বের করে নাসির আলীর হাতে দেয়—এ টাকা তুমি বস্তির

প্রত্যেক ব্যক্তিকে দেবে। কেউ যেন অভাবের তাড়নায় মালিকের শয়তানিতে সাহায্য করতে এগিয়ে না যায়।

কথা শেষ করে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলো না বনহুর; চলে গেলো যে পথে এসেছিলো সে পথে।

নাসির আলী আর গণেশ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চিত্রাপিতের মত।

❑

বনহুর চলে যাওয়ার অল্পক্ষণ পর ভীম সিং তার কয়েকজন লোক নিয়ে হাজির হলো বস্তিমধ্যে। কর্কশ-কঠিন কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়লো—নাসির। নাসির---

ভীম সিং-এর গলার আওয়াজ পেয়ে কেঁপে উঠলো বস্তির লোক। সবাই জানে ভীম সিং কতবড় নির্দয় আর হৃদয়হীন। পিশাচের চেয়েও ভয়ঙ্কর সে।

নাসির আলী তখন বস্তির মধ্যে লোকজনদের ডেকে একটু পূর্বে বনহুরের মুখে শোনা উক্তিগুলোই করছিলো এবং টাকাগুলো সকলের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করে দিচ্ছিলো।

ভীম সিং-এর হুঙ্কারে নাসির আলী ওদিকে শ্রমিকদের দলের মধ্য হতে বেরিয়ে আসে। ভীম সিং-এর সম্মুখে এসে দাঁড়ায়।

গর্জে ওঠে ভীম সিং—নাসির। আভি চলো কারখানা মে তুম্ হারা যানে হোগা।

নাসির আলী স্থির কণ্ঠে বললো—এখন যেতে পারবো না।

কিয়া? যানে নাহি সেকোগে?

না, এখন আমার সময় নেই।

তুম্‌কো জানে হোগা। ভীম সিং গর্জন করে উঠলো। পরক্ষণেই ইংগিত করলো তার দু'জন পাঠান সঙ্গীকে।

সঙ্গে সঙ্গে পাঠান সঙ্গীদ্বয় নাসির আলীর দু'বাহু চেপে ধরলো। তারপর টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে অদূরে থেমে থাকা গাড়িতে উঠিয়ে নিলো তাকে।

❑

কারখানার অফিস-ঘর।

চেয়ারে উপবিষ্ট অভয়কর বিশ্বাস। কোম্পানীর আরও দু'জন বড় সাহেবও বসে রয়েছেন। সকলেরই চোখে মুখে ক্রুদ্ধ হিংস্রভাব।

ভীম সিং ও আরও একজন পাঠান পাহারাদার দণ্ডায়মান। ভীম সিং-এর হস্তে তীক্ষ্ণ চাবুক, চোখ দুটি যেন অগ্নিগোলকের মত জ্বলজ্বল করছে।

অফিস রুমের প্রশস্ত মেঝেতে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ে আছে শ্রমিকদের সর্দার নাসির আলী। জামা তার ছিঁড়ে গেছে, রক্ত গড়িয়ে পড়ছে তার পিঠের চামড়া কেটে।

অভয়কর বিশ্বাস গর্জে উঠলেন—যতক্ষণ না ও আসল কথা স্বীকার করছে ততক্ষণ চাবুক চালাও।

সঙ্গে সঙ্গে ভীম সিং-এর হস্তের চাবুক সপাং করে পড়ে নাসির আলীর পিঠে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠে নাসির আলী—উঃ মা গো...

ভীম সিং দাঁতে দাঁত পিষে বলে—বোল্ শালা, বোল্ কোন্ আদমী কালা পোশাক লেকর্ আতা হ্যা?

আমি বলছি কিছু জানিনা। আমি কিছু জানিনা..

জানতা নেহি? কথার সঙ্গেই ভীম সিং-এর হাতের চাবুক সপাং করে পড়লো নাসির আলীর পিঠে।

জানিনা! জানিনা কে সে কালো পোশাক-পরা আদমী।

আমি জানিনা...হাঁউ মাঁউ করে কেঁদে উঠে নাসির আলী।

অভয়কর বিশ্বাস উঠে আসেন, বুটের লাথি লাগান ওর হাতের কনুই-এ —জানিস না বললেই আমরা বিশ্বাস করবো তোর কথা।

নিশ্চয়ই সে তোদের দলের লোক।

আমি কসম খেয়ে বলছি, আমি জানিনা!

ফের মিছে কথা! ভীম সিং, ওর জান বের করে নে।

বহুৎ আচ্ছা বড় সাহেব। ভীম সিং পুনরায় নাসির আলীর দেহে আঘাত করার জন্য চাবুক উঠায়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজায় এসে দাঁড়ায় কালোমূর্তি—খবরদার, আর একবার আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে মরবে।

একসঙ্গে চমকে তাকায় সবাই দরজার দিকে। অভয়কর বিশ্বাস এবং অন্যান্য সকলে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ে—দেখতে পায়, জমকালো মূর্তির উভয় হস্তে উদ্যত রিভলভার। বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠে কক্ষস্থ সকলের মুখ।

নাসির আলী হামাগুড়ি দিয়ে সোজা হয়ে বসে। তারও দু' চোখে বিস্ময়। এ কালোমূর্তির জন্যই তাকে এভাবে নির্মম সাজা দেয়া হচ্ছিল। সে নিজেও জানেনা কে এ কালোমূর্তি, যার জন্য তার এ অবস্থা।

ভীম সিং ফিরে তাকাতেই তার দক্ষিণহস্তে বিদ্ধ হলো কালোমূর্তির রিভলভারের একটি গুলো। ভীম সিং-এর হাত থেকে ছিটকে খসে পড়লো-সুতীক্ষ্ণ চাবুকখানা, আর্তনাদ করে বসে পড়লো সে মেঝেতে।

ক্ষণিকের জন্য কক্ষস্থ সবাই হকচকিয়ে গেলো।

কালোমূর্তি মুহূর্ত বিলম্ব না করে নাসির আলীর হাত ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিলো, তারপর দ্রুত তাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেলো কোম্পানীর লৌহগেটের সম্মুখে থেমে থাকা গাড়ির পাশে।

লৌহগেটের পাহারাদারদ্বয়কে পূর্বেই কৌশলে হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছিলো, কাজেই চট করে কেউ বাধা দিতে পারলো না কালোমূর্তির চলার পথে।

নাসির আলীকে ড্রাইভিং আসনের পাশে বসিয়ে কালোমূর্তি বসলো ড্রাইভিং আসনে, তারপর গাড়ি ছুটতে শুরু করলো উল্কাগতিতে।

অভয়কর বিশ্বাস তার পাঠান পাহারাদারগণকে হুকুম দিতে দিতে কালোমূর্তির গাড়ি কোম্পানীর এরিয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেলো। রাতের আঁধারে মিশে গেলো বড় রাস্তার বাঁকে।

নাসির আলীকে দুপুরবেলা ধরে এনে গোটাদিন কারখানার এক অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছিলো ভীম সিং। রাতে যখন মালিক কোম্পানীতে এলেন তখন নাসির আলীকে তাঁর সম্মুখে হাজির করা হলো এবং তার উপর চললো নির্মম অত্যাচার।

অভয়কর বিশ্বাস এবং তার দলবল কল্পনাও করতে পারে নি নাসির আলীর উপর অত্যাচার চলাকালে পুনরায় কালোমূর্তির আর্বিভাব ঘটতে পারে। তারা পরম নিশ্চিন্তে নাসির আলীর উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যাছিলো। তাদের ধারণা, কালোমূর্তি সেজে স্বয়ং নাসির আলীই এ কাজ করতো বা করেছে।

তা না হলেও কালোমূর্তি নাসির আলীর লোক।

এ মুহূর্তে অভয়কর বিশ্বাস এবং তাঁর অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গ হাবা বনে গিয়েছিলো। কোম্পানীর লৌহফটকে রাইফেলধারী পাঠান পাহারাদার থাকা সত্ত্বেও কালোমূর্তি কি করে কোম্পানীর মধ্যে প্রবেশে সক্ষম হলো এবং কোম্পানীর মধ্যেও বহু লোকজনের চোখে ধূলো দিয়ে একেবারে কারখানার অফিসরুমে এসে ভীম সিংকে আহত করে বন্দী নাসির আলীকে নিয়ে উধাও হলো।

কালোমূর্তি তো উধাও হয়েছে, তার পিছনে ছুটেও এখন তাকে পাকড়াও করা হয়তো সম্ভব হবে না। উপস্থিত তারা ভীম সিং-এর হাতের ক্ষত নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।

❑

গাড়ি এসে থামলো নির্জন গঙ্গাতীরে।

অনেক পথ ঘুরে ফিরে তবে কালোমূর্তি তার গাড়ি নিয়ে এ জনহীন গঙ্গার ধারে এসে গাড়ি থামালো।

নাসির আলীর মুখে কোনো কথা নেই। সে নিজেও ভীষণভাবে আশ্চর্য হয়ে গেছে, তার মনেও বিপুল জানার বাসনা—কে এ কালোমূর্তি যে তাকে উপস্থিত বিপদ থেকে বাঁচিয়ে আনলো।

কালোমূর্তি বুঝতে পারলো—নাসির আলী তার আচরণে অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে গেছে। মুখের আবরণ উন্মোচন না করেই বললো সে— খুব অবাক হয়েছো নাসির আলী! বিশেষ করে আমার জন্যই তোমাকে ওরা শাস্তি দিচ্ছিলো। তোমার এ কষ্টের জন্য দায়ী আমিই।

কথার ফাঁকে নাসির আলীর হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলো কালোমূর্তি, তারপর আবার বললো—নাসির আলী, আমার পরিচয় জানার জন্য তুমিও অত্যন্ত উৎসুক হয়ে পড়েছো জানি। শোন তবে, আমি তোমাদের হিতৈষী বন্ধু—এটুকুই আমার পরিচয়।

হিতৈষী বন্ধু! অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো নাসির আলী।

হাঁ, ভয় পেয়ে না নাসির আলী, যখনই বিপদে পড়বে তখনই আমাকে পাশে পাবে।

নাসির আলীর মুখে কোনো কথা সরলো না।

কালোমূর্তি বললো—নাসির আলী, এবার তুমি বাস্ ধরে তোমার বাড়িতে ফিরে যাও। ভীম সিং-এর হাত নিয়ে সবাই ব্যস্ত আছে, তোমার সন্ধানে আজ আর কেউ আসবে না।

নাসির আলী বললো—আচ্ছা হুজুর।

নাও বাস ভাড়ার জন্য পয়সা।

কালোমূর্তি কয়েক আনা পয়সা বের করে নাসির আলীর হাতে গুঁজে দিলো।

নাসির আলী গঙ্গার তীর বেয়ে বড় রাস্তায় উঠে এলো।

কালোমূর্তি অন্ধকারে তার পোশাক পাল্টে ফেললো। সুন্দর প্যান্ট-সার্ট-টাই-পরা এক ভদ্রলোক বনে গেলো সে। তার পরিত্যক্ত পোশাকগুলো লুকিয়ে রাখলো ড্রাইভিং আসনের নীচে।

আবার ফিরে এলো সে কোম্পানীর লৌহফটকের সম্মুখে।

গাড়ি থামতেই ছুটে এলো দুজন লোক। একজন বললো— আপনি কোথা থেকে আসছেন স্যার?

ড্রাইভিং আসন থেকে বললো ভদ্রলোক—আমি ষ্টার থিয়েটার হল থেকে আসছি, মাসুদ ইরানীর লোক।

লোক দুটির একজন ভিতরে চলে গেলো এবং অল্পক্ষণ পরে ফিরে এলো—আসুন ভিতরে।

কোম্পানীর গেট খুলে গেলো, গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো মাসুদ ইরানীর লোক।

গাড়ি অফিস-রুমের দরজায় পৌঁছতেই সসব্যস্তে ছুটে এলেন অভয়কর বিশ্বাসের প্রধান সহকারী—আসুন অফিস-রুমে।

মাসুদ ইরানীর লোক লক্ষ্য করলো, তার গাড়ির পাশেই অদূরে আর একটি গাড়ি দাঁড়িয়েছিলো, গাড়িখানা যে হসপিটালের গাড়ি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মাসুদ ইরানীর লোক অফিস-রুমে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো। ভীম সিং মেঝেতে বসে আছে, মুখমণ্ডল তার যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে উঠেছে। ডাক্তার এবং আরও দু'জন লোক তার হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যস্ত।

অভয়কর বিশ্বাসকেও অত্যন্ত উত্তেজিত মনে হলো।

মাসুদ ইরানীর লোককে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন, নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করবার চেষ্টা করে বললেন—আপনি মাসুদ ইরানীর ওখান থেকে এসেছেন বুঝি?

মাথার ক্যাপ খুলে সাহেবী কায়দায় কুর্ণিশ জানিয়ে বললো মাসুদ ইরানীর লোক—হাঁ, আমি তাঁর ওখান থেকেই এসেছি। আপনি বুঝি---

হাঁ আমিই মিঃ বিশ্বাস। একটু থেমে বললেন অভয়কর বিশ্বাস—এই কিছুক্ষণ পূর্বে আমার একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। বসুন আপনি।

মাসুদ ইরানীর লোক আসন গ্রহণ করবার পূর্বে বললো—আমার নাম সাঈদ ইরানী, সম্পর্কে আমি মাসুদ ইরানীর ছোট ভাই। ভাই-এর কথায় আমি আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছি।

ধন্যবাদ! খুশী হলাম অনেক। বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

সাঈদ ইরানী অদূরস্থ ভীম সিং-এর যন্ত্রণা-বিকৃত মুখখানার দিকে তাকিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে বললো—আপনার দুর্ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, জানি না কি ঘটেছে?

অভয়কর বিশ্বাস গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কিছুক্ষণ পূর্বে এক জমকালো পোশাক-পরা দুর্বৃত্ত আমার অফিস-রুমে হানা দেয় এবং আমার বিশ্বস্ত কর্মচারী ভীম সিংকে রিভলভারের গুলীতে আহত করে পালিয়ে যায়।

আশ্চর্য! সে শুধু ভীম সিংকে আহত করেই পালায়? টাকা—পয়সা---

না, সে সব নেবার সুযোগ তার হয়নি।

এমন সময় বাইরে পুলিশ ভ্যানের হর্ণের শব্দ শোনা যায়।

অভয়কর বিশ্বাস বলেন—পুলিশ এসেছে।

কক্ষের বাইরে ভারী বুটের শব্দ শোনা যায়।

সাঈদ ইরানী তার মাথার ক্যাপটা আর একটু টেনে দেয় সম্মুখে।

কক্ষে প্রবেশ করেন ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ এবং লালবাজার থানার ও-সি মিঃ ভৌম। পিছনে দু'জন পুলিশ।

অভয়কর বিশ্বাস তাঁদের অভ্যর্থনা জানালেন।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ বললেন—দুর্বৃত্ত আপনার কর্মচারীকে জখম করার সঙ্গে সঙ্গেই পালিয়েছে?

হাঁ ইন্সপেক্টার!

কিন্তু এখন আমরা কি করতে পারি বলুন?

তবু পুলিশে সংবাদ না দিয়ে পারলাম না। দেখুন দুর্বৃত্ত আমার পিছনে ভয়ানকভাবে লেগেছে। সব সময় আমাকে আশঙ্কা নিয়ে কাটাতে হচ্ছে। আচ্ছা আপনারা বসুন, আমি সব খোলসা করে বলছি।

মিঃ রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ ভৌম আসন গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস বললেন—হাঁ, তার পূর্বে এঁর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেই। ইনি বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীর সহোদর সাঈদ ইরানী।

সাঈদ ইরানী কুর্নিশ জানালো সাহেবী কায়দায়।

ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ এবং মিঃ ভৌম হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলেন সাঈদ ইরানীর সঙ্গে।

তারপর অভয়কর বিশ্বাস দুর্বৃত্ত সম্বন্ধে সমস্ত বর্ণনা করলেন, শুধু চেপে গেলেন তিনি শ্রমিক সর্দার নাসির আলীর সম্পর্কে সব কথা। পুলিশ অফিসারদ্বয় ডায়েরী করে চললেন।

সাঈদ ইরানী গম্ভীর মুখে সব শুনলো। অভয়করের মিথ্যা উক্তি শ্রবণে এক টুকরা হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার মুখে।

এবার সঈদ ইরানী উঠে দাঁড়ালো— চলি আবার দেখা হবে মিঃ বিশ্বাস, গুড্ নাইট্।

পুলিশ অফিসারদ্বয়ের সঙ্গে পুনরায় করমর্দন করলো সে; তারপর বেরিয়ে গেলো অফিস-রুম থেকে।

অফিস-রুমের অদূরেই সাঈদ ইরানীর প্লিমাউথ গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিল। গাড়ির ড্রাইভ আসনে বসে ষ্টার্ট দিলো সে।

নাইট গার্ড লৌহগেট খুলে ধরলো, নির্বিঘ্নে বেরিয়ে গেলো সাঈদ ইরানীর বিরাট প্লিমাউথখানা।

বালিগঞ্জ হয়ে গাড়িখানা সোজা কালীঘাট অভিমুখে ছুটে চললো।

❑

কালীঘাট বজ্রবিহারী দেব শর্মার বাড়ির পিছনে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো সাঈদ; ইরানী কিন্তু এখন তার দেহে সম্পূর্ণ জমকালো পোশাক। মুখে কালো গালপট্টা, দক্ষিণ হস্তে রিভলভার।

বজ্রবিহারীর বিরাট বাড়ির দ্বিতল একটি কক্ষে তখনও আলো জ্বলছে।

জমকালো মূর্তি বাড়ির প্রাচীর বেয়ে উঠে গেলো উপরে, তারপর যে কক্ষে আলো জ্বলছিলো সে কক্ষের পিছনে পানির পাইপ বেয়ে দ্বিতলে এসে পৌঁছলো।

এ কক্ষ বজ্রবিহারী দেব শর্মার শয়নকক্ষ।

কলকাতার নামকরা 'ব্লাক মাচ্যান্ট' বজ্রবিহারী শর্মাকে সবাই চেনে। এমন একটা হৃদয়হীন জঘন্য মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে কেউ সমীহ না

করলেও তার পরম আত্মীয়ের অভাব হয় না। মানুষের সর্বনাশ করে দুটো পয়সা সংগ্রহ করতে তার এতোটুকু বাধতো না।

শুধু বজ্রবিহারী শর্মাই নয় এমনি আরও অনেক ব্যক্তিই আছেন যাদের নাম কালো মূর্তির মনের পাতায় লেখা হয়ে গিয়েছিলো।

মাসুদ ইরানীর ছোট ভাই সাঈদ ইরানীর বেশে কালো মূর্তি বজ্রবিহারী শর্মার শয়নকক্ষের পিছন শার্শীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

বজ্রবিহারী তখন তার টেবিলে বসে টাকার গাঁদা নিয়ে হিসাব করছিলেন। রাতে কারবারের সমস্ত টাকা তিনি বাড়ি আনেন, পরদিন পাহারাদারসহ ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা দিয়ে আসেন।

আজ প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা তিনি বাড়ি এনেছেন। সে টাকা গণনা করে গুছিয়ে রাখছিলেন বজ্রবিহারী শর্মা। কাল ভোরে ব্যাঙ্কে পাঠাবেন।

টাকা গণনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে এমন সময় কালো মূর্তি আচম্‌কা প্রবেশ করলো তার কক্ষে।

বজ্রবিহারী চোখ তুলতেই কালোমূর্তি রিভলভার চেপে ধরলো তার বুকে—খবরদার , একটু শব্দ করবে তাহলেই গুলী করবো।

বজ্রবিহারীর চোখে মুখে ভীতিভাব ফুটে উঠলো। অস্ফুট ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন—কে তুমি?

আমি তোমার যম! দক্ষিণ হস্তে রিভলভার বজ্রবিহারীর বুকে চেপে ধরে বাম হস্তে টাকার ফাইলগুলো পকেটে তুলে নিলো কালোমূর্তি তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কালোবাজারী কারবার বন্ধ না করলে আমাকে প্রতি সপ্তাহে তোমার লভ্যাংশের সম্পূর্ণ টাকা দিয়ে দিতে হবে। কোনোরকম চালাকি করলে বা পুলিশের সাহায্য গ্রহণ করলে মৃত্যু অনিবার্য।

বজ্রবিহারী ঢোক গিলে বললো—তুমি, তুমি কে?

আমি হিতৈষী বন্ধু, যা বললাম স্মরণ রেখো---কথাটা বলে যেমন এসেছিলো তেমনি বেরিয়ে গেলো সচ্ছন্দে কালোমূর্তি।

বজ্রবিহারী শর্মা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন—কে আছো ডাকাত ডাকাত---পুলিশ—পুলিশ---

বাড়ির বিভিন্ন কক্ষ থেকে ছুটে এলো সবাই, ঘিরে ধরলো বজ্রবিহারী শর্মাকে।

বজ্রবিহারী শর্মা তখন মাথায় করাঘাত করে বিলাপ করে বলছেন—হায়, আমার সব নিয়ে ডাকাত পালিয়েছে---

ততক্ষণে কালোমূর্তি তার গাড়িতে চেপে বসে ষ্টার্ট দিয়েছে।

সে রাত্রেই কালোমূর্তি আরও দু'টো জায়গায় হানা দিয়ে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হয়। এ দু'টো ডাকাতি হয় হ্যারিসন রোডের দুটো মারোয়াড়ীর দোকানে। একটি সোনার দোকান অন্যটি ময়দার গুদামে!

❑

পরদিন পত্রিকায় ব্যাপারগুলো বিভিন্ন আকারে প্রকাশ পেলো। কালীঘাটের বজ্রবিহারী শর্মা এবং মারোয়াড়ীদ্বয়ের দোকানের ডাকাতির সঙ্গে কালোমূর্তির আবির্ভাবজড়িত অদ্ভুত কাহিনী।

আরও প্রকাশ পেলো—অভয়কর বিশ্বাসের কোম্পানীর অফিস—রুমে কালোমূর্তি দস্যু প্রবেশ করে মিঃ বিশ্বাসের বিশ্বস্ত কর্মচারী ভীম সিংকে আহত করে অন্তর্ধান হয়েছে।

সমস্ত কলকাতা শহরের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। একি অদ্ভুত কাণ্ড! কোথা থেকেই বা আচমকা কালোমূর্তির আবির্ভাব হয়—আবার হানা দিয়ে সব লুটে নেবার পর কোথাই বা চলে যায়।

পুলিশ মহল সজাগ পাহারা দিয়েও কিছুই করতে পারছে না। শহরবাসিগণ এখন সদা আশঙ্কা নিয়ে যানবাহনে চলাফেরা করছে। কোন্ মুহূর্তে কোথায় কালোমূর্তি হানা দিয়ে বসবে কে জানে।

বনহুর প্রতিদিনের মত আজও পত্রিকাখানা তুলে নিলো হাতে। বাম হস্তের আঙ্গুলের ফাঁকে ধূমায়িত সিগারেট। আলগোছে দৃষ্টি বুলিয়ে চললো সে পত্রিকাখানার উপর। ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠলো, মৃদু একটি হাসির রেখা ফুটে উঠলো তার ঠোঁটের কোণে।

❑

অভয়কর বিশ্বাসের হলঘর।

আজ সুন্দর করে সাজানো হয়েছে সমস্ত ঘরখানা। ফুলদানীতে সদ্য ফোটা রজনীগন্ধার থোকা শোভা পাচ্ছে। লোবানদানীতে সুগন্ধি লোবান মিষ্টিমধুর গন্ধ ছড়াচ্ছে। মার্জিত রুচিসম্পন্নভাবে সোফাসেটগুলো থরে থরে সাজানো।

অভয়কর বিশ্বাস নিজেও আজ তরুণ যুবকের বেশে সজ্জিত হয়েছে।

দক্ষিণ পার্শ্বের ডায়াসে পিয়ানো আর অর্কেস্ট্রা বাদ্যযন্ত্রগুলো সাজানো। একটু পরেই গণ্যমান্য অতিথিগণ এসে পড়বেন। আজকের উৎসবের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী পিয়ানো পরিবেশন করবেন।

সন্ধ্যার পর থেকেই অতিথিগণ আসতে শুরু করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বালিগঞ্জের চৌ-রাস্তার পাশে অভয়কর বিশ্বাসের বাড়ির সম্মুখে অসংখ্য গাড়ি ভীড় করে দাঁড়ালো। ষ্টুডি কমাণ্ডার, বুইক, কুইন, প্রেসিডেন্ট, মাষ্টার বুইক কত রকম গাড়িই না এসে পৌঁছলো আজ অভয়কর বিশ্বাসের বাড়ির সম্মুখস্থ রাস্তার পাশে।

অতিথিগণ সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

অভয়কর বিশ্বাস গাড়ি-বারান্দায় পায়চারি করছেন, আমন্ত্রিত অতিথিগণ সবাই এসে গেছেন শুধু এখনও আসেননি আলবার্ড এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্যালন।

আজকের উৎসবের মূল উদ্দেশ্যই আলবার্ড তার আশ্রিতা শ্যালনকে নিয়ে আসবেন তার বাড়িতে।

রাত বেড়ে আসছে।

সমস্ত অতিথিবৃন্দ উদ্বিগ্নভাবে অপেক্ষা করছেন। অর্কেস্ট্রা বাদ্যযন্ত্রগুলোর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন বাদ্যকরগণ, শুধুমাত্র পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী এখনও এসে পৌঁছায়নি।

কক্ষস্থ সবাই মাসুদ ইরানীর দর্শন লাভের আশায় উন্মুখ। তার নিপুণ হস্তের পিয়ানো বাজনা শুনতে পাবে এই যেন সকলের কামনা।

অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা আরতীও আজকের আসরে যোগ দিয়েছে। সে পিতার কোনো ফাংশানে বড় বেশি আসতো না। আজ তার ইচ্ছা—মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বাজানো শুনবে।

এক পাশে বসেছিলো আরতী। ধীর-স্থির-শান্ত লাবণ্যময়ী মেয়েটি যেন।

শুধুমাত্র তিনটি অতিথির জন্য এখনও টেবিলে খাবার দেওয়া হয়নি।

ডায়াসে অর্কেস্ট্রা বাজতে শুরু করেছে। দুগ্ধধবল উজ্জ্বল টিউব লাইট থেকে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি কক্ষটাকে স্বপ্নপুরীর মত মনোরম করে তুলেছে।

প্রত্যেকটা টেবিলে নারী-পুরুষ মিলে ঘিরে বসেছে। হাসি গল্প আর অর্কেস্ট্রার সুর সৃষ্টি করেছে অভূতপূর্ব একটা পরিবেশ।

এমন সময় আলবার্ডের সঙ্গে কক্ষে প্রবেশ করলো শ্যালন। হাস্যোদ্দীপ্ত চঞ্চল মেয়েটি। শ্যাম্পু করা একরাশ কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে আছে ঘাড়ের চারপাশে। লিপষ্টিক রঞ্জিত রক্তাভ দুটি চিকণ ওষ্ঠ। নীল উজ্জ্বল দুটি চোখ।

অভয়কর বিশ্বাস এদের অভ্যর্থনা করে বসালেন। তার মুখমণ্ডলে আনন্দোচ্ছাস ফুটে উঠলো।

কিন্তু একি, এতোক্ষণেও এলোনা মাসুদ ইরানী, ব্যাপার কি!

ঠিক সে মুহূর্তে একখানা বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি এসে থামলো অগণিত গাড়িগুলোর পাশে। গাড়ি থকে নেমে এলো দীর্ঘদেহী, বলিষ্ঠ সুঠাম দীপ্তকান্তি যুবক মাসুদ ইরানী। প্রবেশ করলো হলঘরে।

কক্ষস্থ সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়লো মাসুদ ইরানীর উপর। মাসুদ ইরানী কক্ষে প্রবেশ করেই মাথার ক্যাপ খুলে সবাইকে উদ্দেশ্য করে সাহেবী কায়দায় অভিনন্দন জানালো, তারপর এগিয়ে গেলো সে ডায়াসের দিকে।

ক্ষণিকের জন্য অর্কেস্ট্রা থেমে গেলো।

মাসুদ ইরানী ডায়াসে পিয়ানোর সম্মুখে এসে বসলো। টিউব লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মাসুদ ইরানী কক্ষমধ্যে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিলো,

তারপর হাত রাখলো পিয়ানোর রীডে। অপূর্ব এক সুরের ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠলো সমস্ত কক্ষটা।

অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রগুলোও বেজে উঠলো পিয়ানোর সঙ্গে যোগ দিয়ে।

কক্ষস্থ সবাই মুগ্ধ হয়ে গেলো। তন্ময় হয়ে শুনছে সবাই এ সুরের সংযোজন।

টেবিলে খাদ্যসম্ভার দেওয়া হলো।

খেতে শুরু করলেন সম্ভ্রান্ত অতিথিবৃন্দ।

ওদিকের একটা টেবিলে আলবার্ড আর শ্যালন বসেছিলো। তাদের পাশেই বসেছিলেন অভয়কর বিশ্বাস। মাঝে মাঝে তিনি শ্যালন আর আলবার্ডের সঙ্গে কিছু আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

মাসুন ইরানীর মন পিয়ানোর মধ্যে সংশ্লিষ্ট থাকলেও দৃষ্টি তার শ্যালনকে আকৃষ্ট করছিলো। আর কখনও কখনও নজর চলে যাচ্ছিলো তার অজ্ঞাতেই দক্ষিণ কোণে সোফায় উপবিষ্ট তরুণীর উপর।

তরুণী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা আরতী।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো থেমে যায়।

করতালিতে মুখর হয়ে উঠে হলঘর।

মাসুদ ইরানী উঠে মাথার ক্যাপ খুলে সকলের আনন্দধ্বনির জবাব দেয়। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে যায়, শ্যালন নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

মাসুদ ইরানীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়।

কিন্তু মাসুদ ইরানী আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে—ওদিকের সোফায় বসেছিলো যে তরুণী সে কখন চলে গেছে তার আসন ত্যাগ করে। সে বুঝতে পারে তরুণী শুধু তারই পিয়ানো শোনার অপেক্ষাতেই ছিলো। যেমন পিয়ানো বাজানো শেষ হয়েছে তেমনি সরে গেছে সে। কে এ তরুণী যে শুধু পিয়ানো শোনার জন্যই এ ফাংশনে যোগ দিয়েছিলো? অভয়করের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ?

ফাংশান শেষ হয়।

সম্মানিত অতিথিগণ বিদায় গ্রহণ করেন।

শুধু এখনও আলবার্ড শ্যালনকে নিয়ে বসে রয়েছেন তার নির্দিষ্ট সোফায়।

বাজনাওয়ালারা সবাই চলে গেছে।

মাসুদ ইরানীও চলে গেছে কিছু পূর্বে।

অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি-বারান্দায় তখনও আলবার্ডের গাড়িখানা অপেক্ষা করছে।

বিরাট হলঘরটা শুধুমাত্র এখন তিনটি প্রাণী—আলবার্ড, শ্যালন এবং অভয়কর বিশ্বাস।

আলবার্ডের সঙ্গে অভয়কর বিশ্বাসের ইঙ্গিতে কিছু কথা হলো।

শ্যালন বাড়ি ফেরার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছে।
এমন সময় বয় তিন কাপ চা এনে টেবিলে রাখলো।
অভয়কর বিশ্বাস এক কাপ আলবার্ডের হাতে দিয়ে দ্বিতীয় কাপ শ্যালনকে দিলেন—চা খেয়ে তারপর বাড়ি যেও।
শ্যালন বাড়ি ফেরার আনন্দে চায়ের কাপটা হাতে নেয়।
অভয়কর বিশ্বাস তৃতীয় কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দেন।
আলবার্ড এবং শ্যালনও চায়ের কাপে চুমুক দিলো।
চা-পান শেষ না হতেই শ্যালন ঢলে পড়লো তার সোফায়। আলবার্ড আর অভয়কর বিশ্বাসের দৃষ্টি বিনিময় হলো।
আলবার্ড উঠে পড়লেন।
অভয়কর তাকে গাড়ি অবধি পৌছে দিয়ে ফিরে এলেন। শ্যালনের সংজ্ঞাহীন দেহটাকে হাতের উপর তুলে নিয়ে পাশের কামরায় নিজের শয্যায় শুইয়ে দিলেন।
দরজা বন্ধ করে ফিরে গেলেন তিনি নিজ শয্যার পাশে। শ্যালনের সুন্দর ফুলের মত দেহটা দুগ্ধধবল বিছানায় ছিন্নলতার মত পড়ে আছে। অভয়কর বিশ্বাস খাটের পাশে বসে পড়লেন। উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোতে নিষ্পলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন শ্যালনের যৌবনভরা দেহটার দিকে। তারপর দক্ষিণ হাতখানা রাখলেন সংজ্ঞাহীন শ্যালনের কোমল গণ্ডের উপর। ধীরে ধীরে ঝুঁকে এলো তাঁর মাথাখানা নীচের দিকে।
ঠিক সে মুহূর্তে পিঠে অনুভব করলেন অভয়কর বিশ্বাস একটা হিমশীতল কঠিন বস্তুর ছোঁয়া। চমকে সোজা হলেন তিনি, ফিরে তাকাতেই আড়ষ্ট হয়ে গেলেন, জমকালো মূর্তি তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে, তার হস্তের রিভলভারের ছোঁয়াই পিঠে হিমশীতল কঠিন পরশ দিয়েছে।
জমকালো মূর্তি বললো এবার—পাপাত্মা, একটা নিষ্পাপ জীবনকে তুমি বিনষ্ট করতে যাচ্ছো! জানো এর শাস্তি কি?
ফ্যাকাশে মুখে বলে উঠেন অভয়কর বিশ্বাস—এ ঘরে তুমি কি করে প্রবেশ করলে?
লৌহসিন্দুকেও যমের প্রবেশ অসাধ্য নয়।
তুমি----
হাঁ, আমি তোমার যম!
কি চাও তুমি আমার কাছে? কত টাকা চাও?
আজ টাকা নয়, এ নিষ্পাপ যুবতীকে তোমার কবল থেকে উদ্ধার করতে চাই।
না। আমি কিছুতেই একে দেবো না।
দেবে না?
না, আলবার্ডের নিকট হতে একে আমি খরিদ করেছি। কোটি টাকার বিনিময়ে---

তোমার জীবনের মূল্য ক' কোটি টাকা হতে পারে?
কে তুমি?
আমি তোমার হিতৈষী বন্ধু।
যদি হিতৈষী বন্ধু হও তাহলে—তাহলে চলে যাও। যত টাকা চাও তাই দেবো। শ্যালনকে আমার চাই।
তোমার সমস্ত ঐশ্বর্যের বিনিময়েও তুমি ওকে পাবে না। দাঁতে দাঁত পিষে বললো কলো মূর্তি।
এতে তোমার স্বার্থ? বললেন অভয়কর।
হাসলো কালোমূর্তি—হিতৈষী বন্ধু কোনোদিন স্বার্থ নিয়ে কাজ করে না। কালোমূর্তির হস্তে তখনও উদ্যত রিভলভার অভয়কর বিশ্বাসের বুক লক্ষ্য করে স্থির রয়েছে।
অভয়কর বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছেন একবার জমকালোমূর্তির কালো আবরণে ঢাকা মুখখানার দিকে, আর একবার তাকাচ্ছেন তার হস্তের উদ্যত রিভলভারের দিকে।
বিছানায় সংজ্ঞাহীন শ্যালন পড়ে আছে।
এবার কালোমূর্তি তার পকেট থেকে সিল্ক কর্ড বের করে অভয়কর বিশ্বাসকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, আর একখানা রুমাল গুঁজে দিলো তাঁর মুখের মধ্যে। শ্যালনের পাশে বিছানায় ওকে শুইয়ে দিয়ে শ্যালনকে তুলে নিলো কাঁধে।

❑

শ্যালনকে পিছন আসনে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো কালোমূর্তি। এবার উল্কা বেগে গাড়ি ছুটতে শুরু করলো। গাড়িতে বসেই কালোমূর্তি তার জমকালো পোশাক খুলে ফেললো। লুকিয়ে রাখলো ড্রাইভিং আসনের নীচে।
কিছুক্ষণ এ—পথ সে—পথ করে ঘুরে ফিরলো তারপর গঙ্গাতীরে এসে গাড়ি রাখলো একটা নির্জন স্থান দেখে নিয়ে। ড্রাইভিং আসন থেকে নেমে পিছন আসনে উঠে বসলো। গাড়ির ভিতরে সুইচ টিপে আলোটা জ্বেলে নিলো সে। শ্যালনের সংজ্ঞাহীন মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে দেখলো, এখনও জ্ঞান ফিরে আসেনি।
যতক্ষণ শ্যালনের জ্ঞান ফিরে না আসে ততক্ষণ তাকে গঙ্গা তীরেই অবস্থান করতে হবে। আলো নিভিয়ে দিলো সে। না হলে গঙ্গাতীরস্থ কোনো ব্যক্তি হঠাৎ যদি এসে পড়ে—বিভ্রাট ঘটবে।
অন্ধকারে শ্যালনের পাশে নিজেকে ধরে রাখাও উচিৎ মনে করলো না, কারণ সে নারী নয়—পুরুষ। একটা সংজ্ঞাহীন অসহায় যুবতীর পাশে সে

একজন উচ্ছল তরুণ যুবক। নিজেকে সংযত করে নিয়ে ড্রাইভিং আসনে এসে বসলো। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো সে।

অন্ধকারে গঙ্গার শীতল বাতাসে হাড়ে যেন কাঁপন আসছে।

হঠাৎ পিছন আসনে নড়ে উঠলো শ্যালন, একটা অস্পষ্ট শব্দ করলো, মা---মাগো---উঃ----

খুশীতে উজ্জ্বল হলো ওর মুখ, তাড়াতাড়ি হস্তস্থিত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পিছন আসনে উঠে বসলো।

কে—কে তুমি! বললো শ্যালন।

সুইচ টিপে আলো জ্বালাতেই শ্যালন অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো—আলম তুমি।

আলম নই—দস্যু বনহুর।

না, না, তুমি দস্যু নও---শ্যালন বনহুরের বুকে মুখ গুঁজলো।

❑

বাধ্য হলো বনহুর গাড়ির ভিতরের আলো নিভিয়ে দিতে।

শ্যালনকে নিয়ে বনহুর গ্র্যাণ্ড হোটেলে এসে উঠলো। মিঠু ঘুমিয়ে পড়েছিলো, মনিবের ডাকে জেগে উঠে অবাক হলো। মনিবের সঙ্গে একটি যুবতীকে দেখে প্রশ্ন করে বসলো সে—স্যার, ইনি কে?

বনহুর শরীর থেকে জামাটা খুলতে খুলতে বললো—আমার বোন। দেশ থেকে এসেছে, ক'দিন এখানেই থাকবে।

এবার মিঠু খুশী হলো, হেসে বললো—ঠিক আপনার মতই দেখতে কিন্তু স্যার।

শ্যালন বনহুরের জবাবে খুশী হলো কিনা বোঝা গেলো না। যেমন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলো তেমনি রইলো।

মিঠু বললো—স্যার, খাবার টেবিলে ঢাকা রয়েছে।

ওসবে প্রয়োজন হবে না। তুই এবার শুবি যা মিঠু।

মিঠু চলে গেলো।

শ্যালন তখনও দাঁড়িয়ে, মনের মধ্যে তার নানা চিন্তা জট পাকাচ্ছিলো।

বনহুর স্লিপিং গাউন গায়ে দিয়ে ফিরে তাকায়—কি ভাবছো শ্যালন?

শ্যালন জবাব দেয়—ভাবছি আলবার্ড কাকার নির্মম জঘন্য আচরণের কথা।

সে কারণেই আমি তোমাকে আর পার্ক-সার্কাস তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলাম না। অভয়কর বিশ্বাস আবার তোমার উপর আক্রমণ চালাতে কসুর করতেন না।

আলম, আমি আর সেখানে ফিরে যাবো না। সত্য বলছি, প্রাণ থাকতে কিছুতেই আমি ও-বাড়িতে যাবো না।

কিন্তু---
আমাকে হত্যা করলেও না। ইস, কি ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে আজ তুমি আমাকে বাঁচিয়ে নিয়েছো।
শ্যালন, কিন্তু আমার কাছেই বা তুমি থাকবে কি করে?
কেন? ম্লান মুখে তাকালো শ্যালন বনহুরের মুখের দিকে।
বনহুর শ্যালনকে তার শয্যার পাশে বসিয়ে দিয়ে বললো— আমি বন্ধনহীন একটি প্রাণী। আমার কাছে থাকা তোমার মোটেই নিরাপদ হবে না।
আলম, তাহলে বলো আমি কোথায় যাবো?
বনহুর দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো, শ্যালনের পাশে ঘনিষ্ঠ হলে বললো—আমাকে যেমন বিশ্বাস করো তেমনি কাউকে কি করতে পারোনা?
তোমাকে ছাড়া আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে আলম। আমি কাউকে বিশ্বাস করিনে। শ্যালন বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরে।
বনহুর শ্যালনের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। বলে—বেশ, তুমি থাকবে আমার কাছে, কিন্তু---
না না কোনো কিন্তু নয়, আমাকে তুমি দূরে ঠেলে দিও না।
কথার মাঝে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে শ্যালন। কিছুক্ষণেই বনহুর বুঝতে পারল--তার বুকের উপর মাথা রেখে শ্যালন ঘুমিয়ে পড়েছে।
বনহুর ধীরে ধীরে শ্যালনকে তার বিছানায় শুইয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, একখানা চাঁদর ঢাকা দিলো ওর দেহে। তারপর নিজে গিয়ে শুয়ে পড়লো ডবল সীটের একটা সোফায়।

❑

ভোরে ঘুম ভেংগে গেলো শ্যালনের, বিছানায় উঠে বসতেই নজর পড়লো সোফায়। সোফার হাতলে মাথা রেখে অঘোরে ঘুমাচ্ছে আলম। হাত দু'খানা বুকের উপরে রয়েছে।
কাঁচের শার্শী দিয়ে প্রভাতের সূর্যের আলো কক্ষটাকে উজ্জ্বল করে তুলেছিলো। শ্যালন নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইলো বনহুরের বলিষ্ঠ সুন্দর ঘুমন্ত মুখের দিকে।
শ্যালন নিজেকে হারিয়ে ফেলে, ভুলে যায় সে আপন সত্তা। ঝুকে পড়ে সে বনহুরের পুরু দুটি ঠোঁটের উপর।
ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের, নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে—একি করছো শ্যালন?
আলম, আমাকে একা ফেলে তুমি সোফায় শুয়েছিলে কেনো? বলো জবাব দাও?
তুমি তো অবুঝ নও! ছিঃ সরে যাও শ্যালন, মিঠু এসে পড়বে।

পড়ুক। কোমল বাহু দুটি দিয়ে বনহুরের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরে শ্যালন, ব্যাকুল আগ্রহে মুখখানা বাড়িয়ে দেয় সে।

বনহুর বলে—উঁ হুঁ। শ্যালনের বাহু দুটি মুক্ত করে দিয়ে উঠে।

এমন সময় মিঠু দরজায় ডাকে—স্যার!

দরজা খুলে দেয় বনহুর—কি-রে মিঠু?

স্যার, অনেক বেলা হয়ে গেছে।

বনহুর সোফায় বসে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে।

শ্যালন তখন বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

বনহুর সোফায় হেলান দিয়ে সিগারেট পান করছিলো, তাকিয়ে ছিলো সে আনমনে করিডোরের দিকে। ভাবছিলো গুরুত্বপূর্ণ কথা। এভাবে শ্যালনের সঙ্গে এক কক্ষে বাস করা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। নিজেকে সে কতক্ষণ সংযত রাখতে পারবে। বিশেষ করে শ্যালনের যৌবন—ভরা লোভনীয় দেহটাকে কতক্ষণ সে উপেক্ষা করে চলতে পারবে। পায়চারি শুরি করে বনহুর, আজকেই তাকে এ হোটেল ত্যাগ করে চলে যেতে হবে।

এমন সময় মিঠু পত্রিকাখানা রেখে যায় টেবিলে। বনহুর সোফায় বসে পত্রিকাখানা তুলে নেয় হাতে। আজ অন্যান্য খবরে দৃষ্টি না দিয়ে প্রথমে নজর বুলায় সে বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠায়। বাড়ি ভাড়ার বিজ্ঞপ্তিগুলোর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলে। হঠাৎ খুশী হয় সে, "হাওড়া শালকিয়া এলাকায় গঙ্গার ধারে একটি ছোট্ট বাংলো প্যাটার্ণ বাড়ি ভাড়া দেয়া হবে"। ঠিকানা, এবং ফোন নাম্বার নীচে রয়েছে।

বনহুর কাগজখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লো।

শ্যালন তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে, বললো—কি ব্যাপার? পত্রিকাখানা অমন করে ছুঁড়ে ফেলে দিলে কেন?

নতুন কোনো সংবাদ নেই। কথাটা অবশ্য মিথ্যা, কারণ বনহুর পত্রিকায় ভালভাবে লক্ষ্যই করেনি।

শ্যালন পত্রিকাখানা হাতে তুলে নিতেই অস্ফুট ধ্বনি করলো— দেখেছো, আজও আবার সে জমকালো মূর্তির আবির্ভাব!

হুঁ! কোথায়? বনহুর স্লিপিং গাউনের বেল্ট বাঁধতে বাঁধতে বললো।

শ্যালন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় লক্ষ্য করে বললে—অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে। কালোমূর্তি মিঃ বিশ্বাসকে নাকি বেঁধে তার সর্বস্ব নিয়ে উধাও হয়েছে। ইতিপূর্বে আরও দু'বার এ কালো মূর্তি তার বাড়িতে এবং কারখানার অফিসে হানা দিয়েছে।

বনহুর ঝুকে পড়লো, পত্রিকায় দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বললো—ডাহা একটা মিথ্যে কথা বলেছে বিশ্বাস!

মিথ্যে, কি করে বুঝলে আলম?

না না কিছুনা। কাল রাতে তোমাকে নিয়ে আসার পর তাহলে কালোমূর্তি হানা দিয়েছিলো বলে মনে হচ্ছে।

শ্যালন এবার প্রশ্ন করলো—এতোবড় শহরটার বুকে একটা কালো মূর্তি রোজ এভাবে লোকচক্ষুর সম্মুখে লুটতরাজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে উধাও হবে আর পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না—সত্যি বড় আশ্চর্য!

বনহুর সোজা হয়ে দাঁড়ালো—শ্যালন, কালোমূর্তি গ্রেপ্তার হলে তুমি খুশী হও?

বা রে খুশী হবো না মানে! খুব খুশী হবো।

তাহলে অভয়করের হাত থেকে তোমার উদ্ধার চিরতরে মিটে যেতো।

কেন? কেন?

কালোমূর্তিই তোমায় উদ্ধার করেছে শ্যালন।

তবে যে বললে তুমি?

হাঁ, কালোমূর্তির সহায়তা ছাড়া আমার কোনো উপায় ছিলো না। একটু থেমে বললো, সে—শ্যালন, তুমি অপেক্ষা করো, আমি বাইরে যাবো।

সেকি, আমাকে সঙ্গে নেবে না?

না।

কোথায় যাবে?

পরে বলবো।

❑

হাওড়া।

শালকিয়া এলাকায় গঙ্গার ধারে সুন্দর বাংলো প্যাটার্ণের একখানা বাড়ি।

বনহুর এ বাড়িই ভাড়া নিলো তার থাকার জন্য। তাই বলে সে গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে বিদায় নিয়ে এলো না। সেখানেও ঠিক পূর্বের মতই রয়ে গেলো। তবে মিঠুকে সব সময় তার কামরাটা পাহারা দিয়ে রাখতে হতো। কারণ, বনহুর প্রায় রাতই হোটেলে ফিরতোনা।

শ্যালনকে প্রথম দিন বনহুর বাড়িটা ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলো। মস্ত বড় বাড়ি, পাশাপাশি বেশ কয়েকখানা কামরা। বনহুর যে কামরায় থাকতো তার পাশের কামরাই ছিলো শ্যালনের জন্য।

কিন্তু শ্যালন যাতে বুঝতে না পারে সে তাকে এড়িয়ে চলার জন্যই এ ব্যবস্থা করেছে। বনহুর বলেছিলো—সব সময় হোটেলে থাকা সম্ভব নয়, বিশেষ করে তোমাকে নিয়ে—তাই এ বাড়িটা ভাড়া নিলাম।

গঙ্গাতীরে সুন্দর মনোরম বাড়ি।

খুশীই হলো শ্যালন।

এখানে তার নেই কোনো ভয়-ভীতি আর আশঙ্কা। কিন্তু একটা উদ্বিগ্নতা এখন তার মনে অহরহ জেগে রয়েছে। সদা ভয় তার আলমকে নিয়ে। বাইরে গেলে আর সহজে ফিরবার কথা নেই।

শ্যালন একা একা বাড়িটায় যেন হাঁপিয়ে পড়ে।

আজ সপ্তাহ হলো এ বাড়িতে এসেছে, একটি দিন আলমকে সে একান্ত নিভৃতে পায়নি। বাড়ির চাকর-বাকর আর বাবুর্চি ছাড়া কেউ থাকতো না বা কাউকে পেতো না সে।

আলম ফিরতো, কিন্তু গভীর রাতে যখন শ্যালন নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে তখন। মাঝের দরজায় আলম খিল এঁটে দিয়ে ঘুমাতো ঘুম ভেংগে গেলেও সে ওর নাগাল পেতো না। শ্যালন যেন হাঁপিয়ে পড়ছিলো দিন দিন।

❑

সেদিন বনহুর ভোরে বাথরুম থেকে বের হতেই শ্যালন গিয়ে ধরে বসলো—আজ তোমাকে কোথাও যেতে দেবোনা আলম।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, বললো—শ্যালন, আজ না গিয়ে যে কোনো উপায় নেই।

কোথায় যাবে তুমি?

আজ ষ্টার থিয়েটার হলে মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাবে।

মাসুদ ইরানী! শ্যালন আনন্দধ্বনি করে উঠলো। তারপর বললো—তুমিও বুঝি মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে ভালবাসো?

খুব!

সত্যি, আমার কাছে অপূর্ব মনে হয়!

মাসুদ ইরানী, না তার পিয়ানোর সুর? কোন্‌টা?

দু'টোই! মাসুদ ইরানী সত্যিই অদ্ভুত মানুষ।

বনহুর কোনো কথা বললো না।

শ্যালন বনহুরের মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললো— রাগ করলে নাতো?

অভিমানের সুরে বললো বনহুর—মাসুদ ইরানীর তুলনায় আমি তো নগণ্য একটি মানুষ--

ছিঃ, আমি সে কথা বলিনি। মাসুদ ইরানীর পিয়ানো আমার ভাল লাগে তাই।

বেশ, মাসুদ ইরানীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

সত্যি বলছো?

হাঁ।

কিন্তু আজ আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।

কোথায়?

ষ্টারে, মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে।

কিন্তু অভয়কর বিশ্বাস বা তাঁর লোক যদি তোমায় দেখে ফেলে?

থাক্ আমি যাবোনা! শ্যালনের মুখখানা বিমর্ষ-বেদনাময় হলো।

বনহুর ওকে কাছে টেনে নিলো, আবেগ ভরা কণ্ঠে বললো— শ্যালন, মাসুদ ইরানীকে যদি আমার বাংলোয় নিয়ে আসি খুশী হবে তুমি?
ডাগর ডাগর চোখ দুটি তুলে তাকালো শ্যালন বনহুরের মুখে, ওর কথা যেন বিশ্বাস হচ্ছেনা। মাসুদ ইরানী আসবে তার এখানে— অসম্ভব এ কথা। বললো শ্যালন—শুনেছি মাসুদ ইরানীর অনেক টাকা ফি?
টাকার জন্য ভেবো না শ্যালন, তোমার নাম বললে মাসুদ ইরানী না এসেই পারে না।
তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিলাম, কিন্তু সকাল সকাল ফিরবে। বড্ড রাত করে বাসায় আসো, আমি রোজ ঘুমিয়ে পড়ি।
হাঁ, তুমি আমার জন্য অপেক্ষা না করে ঘুমাবে, আর শোনো, চারপাশের দরজা ভাল করে বন্ধ করে শোবে।
শ্যালন বনহুরের কথামত কাজ করে। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী মেয়ে সে নয়। বনহুর ওকে ভয় দেখিয়েছে—ফাঁক পেলেই কালোমূর্তির আবির্ভাব ঘটতে পারে, কাজেই তুমি সাবধান থাকবে।
সে রাতে বনহুর ষ্টার থিয়েটার হলে বিনোদ বিহারী নামক এক ধনকুবেরের স্ত্রীর কণ্ঠ থেকে লক্ষ টাকা মূল্যের হার হরণ করে। আরও এক মহাজনের আড়ত থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।
একই রাতে দুটো রহস্যজনক ডাকাতি।

❑

পরদিন।
বনহুর ঘুমিয়ে আছে, বেলা প্রায় ন'টা বাজতে চলেছে। তবু তার নিদ্রাভংগের কোনো লক্ষণ নেই।
শ্যালন ব্যস্তসমস্ত হয়ে প্রবেশ করলো তার কক্ষে। হস্তে তার দৈনিক সংবাদপত্র। বনহুরের পাশে বসে হন্তদন্ত হলে ডাকলো—আলম, আলম---
উঁ বলে পাশ ফিরলো বনহুর।
শ্যালন ওকে ঝাকুনি দিয়ে পুনঃ পুনঃ ডাকতে লাগলো—উঠো। উঠো দেখো---
হাই তুলে উঠে বসলো বনহুর—উঃ বড্ড জ্বালাতন করে মারলে শ্যালন।
শ্যালন চঞ্চল কণ্ঠে বললো—এই দেখো। পত্রিকাখানা মেলে ধরলো তার সামনে।
কি ব্যাপার বলোই না? চোখ তুলে তাকালো বনহুর।
শ্যালন বললো—কাল রাতে তুমিও তো গিয়েছিলে ষ্টার থিয়েটার হলে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে। শুনেছিলে কিছু?
কই না তো? কেন কি হয়েছে?
"অসংখ্য জনতার মধ্যে বিস্ময়কর চুরি"

তার মানে?

গতরাতে নামকরা মহাজন বিনোদ বিহারী চন্দ্রের স্ত্রীর কণ্ঠ থেকে মূল্যবান হার–চুরি গেছে। তুমিও তো গিয়েছিলে ষ্টারে, শোনোনি কিছু?

আমি কি হার চুরি সংবাদ শুনতে গিয়েছিলাম? যখন হার চুরি হয় তখন আমি মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম--সত্যি অপূর্ব! বনহুর শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন বলে আবার—এই দেখো, আরও একজন ব্যবসায়ীর আড়ত থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা হরণ---

এ সব আমাকে শোনাচ্ছো কেন শ্যালন?

সত্যি, এতোবড় একটা শহরে প্রতিদিন এমনি চুরি-ডাকাতি হচ্ছে অথচ পুলিশ কিছু করতে পারছে না। আমার কিন্তু ভয় হয় তুমি কত রাত বাইরে থাকো---

তুমি কি মনে করো এসব চুরি-ডাকাতি আমিই করছি?

ছিঃ ও কথা কে বলছে বলো? তুমি বাইরে থাকো আমি একা বাসায় থাকি—ভয় হয় কখন কোন্ পথে চোর ঢুকে---

তোমাকে হরণ করে নিয়ে যাবে—এই তো ভয়?

ঠিক্ তা নায়।

তবে?

তোমার প্রশ্নের জ্বালায় বাঁচিনে। যাও তো বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে এসো, টেবিলে চা এসে গেছে।

বনহুর শ্যালনের বাধ্য ছাত্রের মত বাথরুমে প্রবেশ করে। আপন মনেই হাসে বনহুর, শ্যালনই শুধু জানে—আলম দস্যু বনহুর। কলকাতার বুকে সে ছাড়া আর দ্বিতীয় প্রাণী কেউ জানে না তার আসল পরিচয়। কিন্তু এতো জেনেও শ্যালন আলমকে অবিশ্বাস করতে পারে না কোনোদিন। কারণ, যাকে ভালবাসা যায় তাকে নাকি অসৎ ভাবা যায় না।

শ্যালনের অবস্থাও তাই, সে ভাবতে পারে না আলম কলকাতার বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে চলেছে। সে ভাবতেও পারে না—আলম একজন দুর্দান্ত দস্যু।

আলমকে সে শুধু ভালই বাসে না—মনপ্রাণ দিয়ে সমীহ করে, বিশ্বাস করে তাকে। আলমের মত আর কাউকে বুঝি এতোখানি সে সমীহ করেনি কোনোদিন।

পুলিশ মহল এ কালোমূর্তির আবির্ভাব নিয়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে পড়েছে। আজ এখানে কাল সেখানে সব সময় কালোমূর্তি হানা দিয়ে লক্ষ লক্ষ অর্থ হরণ করে নিয়ে যাচ্ছে অথচ পুলিশ বা গোয়েন্দা বিভাগ কিছুই করতে পারছে না। সমস্ত শহরময় একটা আতঙ্কভাব ছড়িয়ে আছে সর্বক্ষণ। ট্রাম, বাস বা যে কোনো যানবাহনে সদা ঐ কালোমূর্তির আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা চলছে।

যতদূর সম্ভব সবাই সতর্ক হয়ে চলাফেরা করছে। কিন্তু এতেও রেহাই নেই, কালোমূর্তি ঠিকভাবেই তার কাজ চালিয়ে চলেছে।

সবচেয়ে বেশি আক্রোশ যেন কালোমূর্তির অভয়কর বিশ্বাসের উপর। ইতিমধ্যে কালোমূর্তি হানা দিয়ে তাঁর সিমেন্ট কারখানার সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিয়েছিলো, সিমেন্টে কোনোরকম ভেজাল চলবে না। যে শ্রমিক ভেজাল সিমেন্ট তৈরি ব্যাপারে কারখানার কাজ করবে তাকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাছাড়া শ্রমিক সর্দার নাসির আলীর উপর আদেশ ছিলো, যতক্ষণ কারখানায় আসল সিমেন্ট তৈরির হুকুম না দেয়া হবে ততক্ষণ বা ততদিন ধর্মঘট সমানে চলতে থাকবে। বনহুর নিজে বস্তিতে গিয়ে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ দেখে প্রচুর অর্থ দিয়ে আসতো, কারণ তারা যেন ক্ষুধার তাড়নায় অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত না হয়।

অভয়কর বিশ্বাস প্রতিটি কাজে বাধা পেতে লাগলেন। সিমেন্ট কারখানার কাজ বন্ধ হয়ে গেলো প্রায়। অন্যান্য কোম্পানীগুলোও শিথিল হয়ে এলো। শ্রমিকের দল ধর্মঘটের পর ধর্মঘট চালিয়ে চলেছে। নাসির আলীর উপর যে কোনো কর্মচারী অত্যাচার চালাবে তাকেই কালোমূর্তি চরম শাস্তি দেবে— কেউ ভয়ে নাসির আলীকে কিছু বলতে সাহসী হয় না।

অভয়কর বিশ্বাস নাসির আলী সম্বন্ধে পুলিশে রিপোর্ট দিতে গিয়েছিলেন কিন্তু পারেন নি। কালোমূর্তি তাকে মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে সে পথ বন্ধ করে দিয়েছে। ভীম সিং তার দক্ষিণ হাতখানা চিরতরে হারিয়ে অকেজো হয়ে পড়েছে। ভীম সিং এর মত একজন বিশ্বস্ত অনুচরের এ চরম অবস্থার জন্য অভয়কর বিশ্বাস মুষড়ে পড়েছিলেন। আরও বেশি তিনি ভেংগে পড়েছেন শ্যালনকে হারিয়ে। আলবার্ডের কাছেও তিনি অনেক হেয় হয়ে গেছেন। আলবার্ড দুটো কথা শোনালেও অভয়কর কোনো জবাব দিতে পারেন না। কারণ, শ্যালনকে তিনি সামলে রাখতে সক্ষম হননি। শ্যালন সম্বন্ধে পুলিশে ডায়রী দেওয়াও সমীচীন নয় ভেবে এ ব্যাপারেও তিনি ক্ষান্ত রয়েছেন। অভয়কর বিশ্বাস জানেন, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে যেতে পারে কাজেই নিশ্চুপ থাকাই মঙ্গল।

অভয়কর বিশ্বাস কালোমূর্তির অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। বাধ্য হয়েই তিনি সিমেন্ট কারখানায় নির্ভেজাল সিমেন্ট তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু কথায় বলে, যে কুকুরের লেজ বাঁকা, সো হাজার ইট পাটকেল বেঁধে দিলেও সোজা হয় না।

অভয়কর বিশ্বাসের কারখানায় ভেজালশূন্য সিমেন্ট তৈরি হলেও এবার পুরাদমে শুরু হলো ব্লাকমার্কেট। তার কারখানা থেকে হাজার হাজার ব্যাগ সিমেন্ট চোরাচালানিভাবে জাহাজ বোঝাই হয়ে গোপনে চলে যেতে লাগলো বিদেশে।

গোয়েন্দা বিভাগ নিপুণ সতর্কতা সত্ত্বেও অভয়কর বিশ্বাসের চোরা কারবারের কিছুমাত্র প্রতিরোধ করতে পারলেন না।

বনহুর সব সন্ধান পেলো।

এবার তার চোরাচালানি একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য সে প্রস্তুতি নিলো।

❑

একদিন অভয়কর বিশ্বাস তাঁর গাড়িতে বাড়ি ফিরছিলেন। খিদিরপুর তার কোম্পানী থেকেই ফিরছিলেন তিনি। তার ড্রাইভার যতীন গাড়ি চালিয়ে চলেছে।

একটা নির্জন গলি-পথে গাড়িখানা অগ্রসর হচ্ছিলো। হঠাৎ গাড়িখানা থেমে যায়, ড্রাইভার যতীনের বেশে গাড়ি চালাচ্ছিলো দস্যু বনহুর। আচমকা বনহুর রিভলভার বের করে চেপে ধরে অভয়কর বিশ্বাসের বুকে। গম্ভীর চাপা কণ্ঠে বলে—জীবন না অর্থ—কোন্টা তুমি চাও?

কে তুমি? বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললেন অভয়কর বিশ্বাস।

আমি তোমার সে হিতৈষী বন্ধু।

কি চাও আজ তুমি আমার কাছে?

চোরা কারবার বন্ধ করতে হবে, নচেৎ মৃত্যুবরণ করবে। বলো কোন্টা চাও?

অভয়কর বিশ্বাস নীরব।

বনহুর পুনরায় দাঁতে দাঁত পিষে বললো—কোনোরকম মিথ্যা কথা চলবে না।

আমি চোরাচালানি করি কে বললো?

পুলিশের চোখে ধূলো দিলেও আমার চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না। সিমেন্টে ভেজাল বন্ধ করেছো, এবার বন্ধ করবে তোমার ব্লাক মার্কেট বিজনেস্। বলো রাজী?

অভয়কর বিশ্বাস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। এ মুখ কোথাও দেখেছে বলে মনে হলো না।

একজোড়া গোঁফের নীচে কালো দু'খানা ঠোঁট। ঠিক্ যেন সিগারেটের ধোঁয়ার ধোঁয়ায় কাল্চে হয়ে উঠেছে। গায়ের রংটাও বনহুর পাল্টে নিয়েছিলো, ঠিক্ যতীনের মত করে।

অভয়কর বিশ্বাস অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারলেন না—একে পূর্বে কোথাও দেখেছেন কিনা। ঢোক গিলে বললেন—তুমিই কি সে কালোমূর্তি?

না! আমি তার বিশ্বস্ত অনুচর। কিন্তু আমার মালিক অতি ভয়ঙ্কর, যেমন দুর্দান্ত তেমনি নররক্তপিপাসু।

কে—কে তোমার সে মালিক?

একটু পূর্বেই বলেছি—কালোমূর্তি। বলো আমার আদেশ পালন করবে তো?

অধরদংশন করলেন অভয়কর, তারপর বললেন—হঁ্যা।

কিন্তু মনে রেখো, যদি কোনরকম শয়তানি করো তাহলে তোমার মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবে না।

বনহুর কথা শেষ করে ড্রাইভিং আসন ত্যাগ করে নেমে গেলো।

অভয়কর বিশ্বাস ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন, কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হয়ে গেছে তার।

❑

স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতল একটি কামরায় থাকেন বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী। একমাত্র সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা করার টাইম। সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টার মধ্যে ছাড়া তাকে পাওয়া যাবে না। কারণ, মাসুদ ইরানী সর্বক্ষণ বাইরে ব্যস্ত থাকেন। নানা জায়গায় ফাংশানে-পার্টিতে তাকে যোগ দিতে হয়। যে কোনো ফাংশানে হাজার টাকা তার ফি। কাজেই মাসুদ ইরানীকে সব সময় পাওয়া যায় না।

আজ আরতী দেবী স্বয়ং এসেছে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে দেখা করতে। মাসুদ ইরানীর সহকারী ফরিদ ওসমানী আরতী দেবীকে সসম্মানে ক্যাবিনে নিয়ে বসালেন। এখনও মাসুদ ইরানী তার বৈকালিক ভ্রমণ থেকে ফিরে আসেননি।

আরতি মনে একটা বিপুল উন্মাদনা নিয়ে বসে থাকে। মাসুদ ইরানীকে সে অভিনন্দন জানাতে এসেছে। মাসুদ ইরানীর পিয়ানোই শুধু তাকে বিমুগ্ধ করেনি, তার সৌন্দর্য আকৃষ্ট করেছে তাকে। সেদিনের পর থেকে তাপসীর মত মেয়ে আরতীর মনেও অগুন ধরে গিয়েছিলো। সব সময় হৃদয়ের কোণে একটি সুর যেন বেজে চলেছিলো—সে ঐ মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুর।

আরতী আজ স্ব-ইচ্ছায় এসেছে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। অন্তরের অনুভূতি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে। পিতার কুৎসিত মনোবৃত্তির কাছে সে ছিলো এক অসামান্য মেয়ে। মন তার ছিলো উদার-মহৎ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন। অন্যায়, অনাচারকে আরতী মন থেকে ঘৃণা করতো। পিতার আচরণের প্রতি আরতীর অশ্রদ্ধা জন্মায়, পুরুষ জাতির প্রতিই সে সম্পূর্ণ বিরূপ হয়ে পড়েছিলো। সে ভাবতো, পুরুষ জাতটাই বুঝি এমনি স্বার্থপর তার মনুষ্যত্বহীন। কিন্তু মাসুদ ইরানীকে দেখা অবধি তার মনে দারুণভাবে একটা পরিবর্তন এসেছিলো—মাসুদ ইরানীর দুটি চোখে সে দেখতে পেয়েছিলো উজ্জ্বল পৌরুষ আর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ।

আরতী যখন মাসুদ ইরানী সম্বন্ধে ভাবছে তখন আচমকা কক্ষে প্রবেশ করলো সে সৌম্যসুন্দর দীপ্তকায় যুবকটি। মাথায় একরাশ সোনালী কোঁকড়ানো চুল। গভীর নীল দুটি চোখ, হাস্যউজ্জ্বল মুখমণ্ডল। আরতীকে দেখে থমকে দাঁড়ালো।

ফরিদ ওসমানী তখন কক্ষে ছিলো না।

আরতী প্রথমে বিব্রত বোধ করলো, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—আমি আপনার পিয়ানোর সুরে মুগ্ধ হয়েছি।

মাসুদ ইরানী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকালো, এ মেয়েটিকে সে অভয়কর বিশ্বাসের বাড়িতে দেখেছিলো। আরতীর কথায় বললো—সেজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মাসুদ ইরানী কক্ষে প্রবেশ করতেই আরতী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়েছিলো, মাসুদ ইরানী বললো—বসুন। নিজেও আসন গ্রহণ করলো সে।

আরতী আসনে উপবেশন করলো, চোখ দুটো তখনও স্থির হয়ে আছে মাসুদ ইরানীর মুখে। দৃষ্টি যেন ফিরিয়ে নিতে পারছে না সে।

মাসুদ ইরানী বললো এবার—আপনি অভয়কর বিশ্বাসের আত্মীয়া?

আমি তাঁর কন্যা আরতী।

মাসুদ ইরানীর মুখমণ্ডল গম্ভীর হলো।

আরতী বললো—কিছু যদি মনে না করেন আমি পিয়ানো শুনতে চাই!

এতোদূর এসেছেন কষ্ট করে, নিশ্চয়ই শোনাবো।

মাসুদ ইরানী উঠে গিয়ে তার পিয়ানোর পাশে বসলো। অপূর্ব ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠলো কক্ষাভ্যন্তর।

মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে আরতী।

মাসুদ ইরানী তার পিয়ানোর বুকে দ্রুত হস্ত চালনা করে চলেছে।

কক্ষমধ্যে উজ্জ্বল নীলাভ আলো জ্বলছিলো। সে নীলাভ আলোতে অদ্ভুত এক মোহময় পরিবেশ রচনা হচ্ছিলো। তন্ময় হয়ে গেছে আরতী মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুরে।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বন্ধ হয় এক সময়।

সম্বিৎ ফিরে পায় আরতী।

ভ্যানিটী ব্যাগ খুলে বের করে এক হাজার টাকার একটি বাণ্ডিল। উঠে গিয়ে মাসুদ ইরানীর সম্মুখে বাড়িয়ে ধরে আরতী —নিন, আপনার পারিশ্রমিক।

হঠাৎ মাসুদ ইরানী হেসে উঠে অদ্ভুতভাবে।

আশ্চর্য হয়ে তাকায় আরতী।

মাসুদ ইরানীর হাসি যেন থামতে চায় না।

হাঃ হাঃ হাঃ—হাঃ হাঃ হাঃ---আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ায় মাসুদ ইরানী, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে —ধন-কুবের কন্যা—তাই অর্থের বাহাদুরী

এতো! মাসুদ ইরানী তার পিয়ানোর সুরের জন্য বাড়ি বসে কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করে না। আপনি এবার যেতে পারেন।

আরতী মাসুদ ইরানীর কথায় খুশী হতে পারে না। নত মস্তকে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

মাসুদ ইরানী তার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

আরতী একবার মাসুদ ইরানীর মুখে তাকিয়ে দৃষ্টি নত করে নিলো, তারপর দ্রুত বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

মাসুদ ইরানী আবার উঠে গিয়ে পিয়ানোর সম্মুখে বসলো, চললো তার পিয়ানো সাধনা।

আপন মনে পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে মাসুদ ইরানী। অদ্ভুত এক সুরের সৃষ্টি করে চলেছে সে। রাত গভীর হতে গভীরতর হয়ে উঠছে, কোনো দিকে খেয়াল নেই তার। দু'চোখ তার মুদিত।

স্বপ্নরাগের তিন তলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসেন এক বৃদ্ধ, মাসুদ ইরানীর কক্ষে প্রবেশ করে স্থির হয়ে দাঁড়ান তিনি। অপূর্ব জ্যোতির্ময় এক তাপস।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো সমানে বেজে চলেছে। কোনো দিকে খেয়াল নেই মাসুদ ইরানীর। আপনাতে সে আপনি বিভোর!

বৃদ্ধ জ্যোতির্ময় তাপস তন্ময় হয়ে মাসুদ ইরানীর সুর শুনে চলেন।

এক সময় মাসুদ ইরানীর পিয়ানো থেমে যায়। নিদ্রায় দু'চোখ ঢুলু ঢুলু হয় তার। পিয়ানোর উপর মাথা রাখে সে।

বৃদ্ধ তাপস এগিয়ে আসেন, হাত রাখেন মাসুদ ইরানীর মাথায়।

চমকে সোজা হয়ে তাকায় মাসুদ ইরানী. অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে সে—গুরুদেব!

বৃদ্ধের দু'চোখে তীব্র অন্তর্ভেদী চাহনি স্থির কণ্ঠে বলেন তিনি—শুভাংশু--শুভাংকর--শুভায়েনমঃ---বৎসে, তোমার সাধনা সার্থক হয়েছে।

মাসুদ ইরানীর দু'চোখে উজ্জ্বল দীপ্তময় এক অপূর্ব লহরী।

বৃদ্ধের পায়ে হাত রেখে কদমবুসি করে মাসুদ ইরানী।

বৃদ্ধ ফিরে যায় আপন কক্ষে।

❑

গাড়ি থেকে বনহুর নেমে আসতেই শ্যালন ছুটে আসে, হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে বলে—এমনি করে রাতের পর রাত তুমি কোথায় কাটাও আলম?

শ্যালন, বাংলাদেশের মাটি আমাকে সব সময় আকর্ষণ করে তাই আমি কোথাও স্থির হতে পারি না। ছুটে ফিরি সদা এখান থেকে সেখানে, এ-কাজ থেকে সে-কাজে।

আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন?

তুমি নারী, সব সময় টিকে উঠতে পারবে না তাই।
কিন্তু একথা ভুলে গেছো—আমি একদিন না থাকলে---
হাঁ, সেদিন আমার মৃত্যু ঘটতো তাতো কোনো সন্দেহ নেই।
আলম!
চলো শ্যালন, ঘরে যাই।
কক্ষে প্রবেশ করে জামা কাপড় খুলতে খুলতে বলে বনহুর—শ্যালন, তুমি না মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে ভালবাস?
হাঁ, আমার বড় ভাল লাগে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো।
আর তাকে?
এ প্রশ্ন তুমি আরও অনেক দিন করেছো। কিন্তু কেন বলো তো?
শ্যালন, মাসুদ ইরানীকে তুমি ভালবাসো—এ কথাও অস্বীকার করতে পারো না।
কিন্তু তোমার মত নয়।
মাসুদ ইরানীর চেয়ে আমাকে তুমি বেশি ভালবাসো?
হঁ। আলম, তুমি আমাকে কত বার মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো!
সে কারণেই বুঝি আমার প্রতি তোমার এতো প্রীতি?
না, শুধু সে কারণে নয়—তোমাকে আমার ভাল লাগে।
যাক্ সে সব কথা শোনো শ্যালন, তোমাকে বলতে এতোক্ষণ ভুলেই গেছি। আজ মাসুদ ইরানী আসবেন আমাদের বাসায়।
শ্যালন যেন আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠে, বলে—সত্যি বলছো?
হাঁ, আমি তাকে আসার জন্য অনুরোধ করে এসেছি।
কিন্তু---
আবার কিন্তু কি শ্যালন?
শুনেছি তার ফি নাকি এক হাজার টাকা।
হাঁ, কিন্তু এতো টাকা আমি দেবো কোথা হতে। সত্যি আমি সে কথাও ভুলেই গিয়েছিলাম। কথাগুলো বনহুর চিন্তিত কণ্ঠে উচ্চারণ করলো।
শ্যালনের মুখ বিমর্ষ হলো।
বনহুর বললো—তা হলে মাসুদ ইরানীকে নিষেধ করে দিয়ে আসি।
না, তা হয় না।
এতো টাকা আমার নেই যে শ্যালন!
আমার এ হারের দাম এক হাজার টাকা মূল্যের বেশি হবে। আলম, তুমি এ হার বিক্রয় করে টাকা নিয়ে এসো। শ্যালন তার নিজের কণ্ঠ থেকে হার খুলে বনহুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলো।
বনহুর হার গ্রহণে কোনো রকম আগ্রহ না দেখিয়ে হেসে বললো—অর্থের চেয়ে হারখানা যদি তুমি তাকে উপহার দাও, সেটাই হবে তার পক্ষে বেশি আনন্দের।
শ্যালনা বনহুরের কথায় সন্তুষ্ট হলো।

❑

সমস্ত দিন ধরে শ্যালন চাকর-বাকর আর নিজে খেটে-খুটে সুন্দর করে ঘরগুলো গুছিয়ে নিলো। ড্রইংরুমখানা রুচিশীল করে সাজালো শ্যালন নিজের হাতে।

বনহুর এক সময় হেসে বললো—শ্যালন, জরুরী কাজে আমাকে বাইরে যেতে হবে। মাসুদ ইরানী এলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বসাবে। আমার ফিরতে হয়তো একটু রাত হবে।

আকাশ থেকে যেন পড়লো শ্যালন, ফুলদানীতে ফুলগুলো গুছিয়ে রাখছিলো, ফুলগুচ্ছ হস্তে ফিরে দাঁড়ালো—তা হলে সব মাটি করে দেবে আমার?

তার মানে?

মানে, তুমি চলে যাবে আর আমি একা মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনবো?

তাকে কি? মাসুদ ইরানী তো তোমাকেই তার পিয়ানো শোনাতে আসবেন, আমাকে তো নয়!

তা হয় না। তুমি চলে যাবে আর আমি একা একা---

বেশিক্ষণ দেরি হবে না আমার, ঠিক ঘন্টা দুই পরে চলে আসবো।

অভিমান ভরা কণ্ঠে বলে শ্যালন—বেশ, যা ভাল মনে করো তাই হবে।

সন্ধ্যার পূর্বেই বনহুর বেরিয়ে গেলো তার ষ্টুডি কমাণ্ডার গাড়ি নিয়ে।

শ্যালন মন খারাপ করে বসে রইলো। মাসুদ ইরানী আসবে আজ তাদের বাসায়—এ কম কথা নয়। বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক তিনি। কত তাদের ভাগ্য, তিনি তো আর যেখানে সেখানে যান না!

শ্যালন রাগ করে কি করবে তাকেই সব দিক সামলাতে হবে যে। মাসুদ ইরানী এসে পড়বে যে এখন।

সত্যি-ই ·যা ভেবেছিলো, সন্ধ্যার ঘন্টাখানেক পর মাসুদ ইরানী তার বিরাট প্লিমাউথ গাড়ি নিয়ে পৌঁছে গেলো হাওড়া শালকিয়া গঙ্গাতীরস্থ শ্যালনের বাসভবনে।

শ্যালন প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সামলে নিলো সে অল্পক্ষণে। নিজে গিয়ে মাসুদ ইরানীকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিয়ে এলো অভ্যন্তরে।

মাসুদ ইরানী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে বললেন—আপনার স্বামীকে দেখছি না যে?

শ্যালন আম্‌তা আম্‌তা করে জবাব দিলো—তিনি অল্পক্ষণের জন্য বাইরে গেছেন।

শ্যালন নিজ হস্তে মাসুদ ইরানীর খাবারের আয়োজন করলো।

কিন্তু মাসুদ ইরানী আগে খেলেন না, তিনি বললেন—আলম সাহেব এলে এক সঙ্গে খাবেন। পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলেন মাসুদ ইরানী।

শ্যালন তার অদূরে একটি সোফায় বসেছিলো।

মাসুদ ইরানী ডাকলেন—এখানে আমার সম্মুখে বসুন।

শ্যালন দ্বিধাজড়িতভাবে উঠে এসে বসলো মাসুদ ইরানীর সম্মুখস্থ আসনে। হেসে বললো—আপনি বহু শ্রোতামহলে পিয়ানো শুনিয়ে তাদের আনন্দ দান করেন। আজ কিন্তু আমি একা আপনার পিয়ানো শ্রোতা।

সেই ভাল। বহু শ্রোতা এবং দর্শক মহলের শুনাম কুড়োনোর চেয়ে একজনের প্রশংসা অত্যন্ত কামনার, যদি সে তেমনি কোনো একজন ব্যক্তি হয়।

শ্যালন হাসলো—আমি তো তেমন কোনো ব্যক্তি নই।

তবু আপনি একাই যথেষ্ট। কথাটা বলে মাসুদ ইরানী পিয়ানোতে হাত রাখেন।

মধুময় ঝঙ্কারে মুখর হয়ে উঠে গঙ্গাতীরস্থ বাংলো বাড়িটা। রাতের অন্ধকারে গঙ্গার বুকে জাগে এক অপূর্ব সুরের লহরী।

মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজিয়ে চলে।

ভুলে যায় শ্যালন তার আপন সত্তা। আলমের কথা তার মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্য।

মাসুদ ইরানীর পিয়ানো বেজেই চলে।

রাত বেড়ে আসে।

মাসুদ ইরানী পিয়ানো রেখে উঠে দাঁড়ায়।

শ্যালন তখনও তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বসেই আছে।

মাসুদ ইরানী এবার বিদায় চায়।

শ্যালন ফিরে পায় তার সম্বিৎ, বলে—এতো শীঘ্র চলে যাবেন? আর একটু বাজাবেন না?

আজ নয়, আবার আসবো।

শ্যালন কণ্ঠ থেকে হার ছড়া খুলে বাড়িয়ে ধরে—টাকা নেই, তাই---

হাসে মাসুদ ইরানী—ওটা আপনার গলাতেই থাক। টাকার চেয়ে আপনার সান্নিধ্য আমার কাছে অনেক মূল্যবান।

মাসুদ ইরানীর কথায় শ্যালন যেন অভিভূত হয়ে পড়ে। এমনি করে আলম তো কোনোদিন তাকে বলে না। তার আলমের চেয়ে মাসুদ ইরানীর হৃদয় কত স্বচ্ছ!

মাসুদ ইরানী বিদায় নিয়ে চলে যায়।

শ্যালন পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসে, হাত বুলায় সে পিয়ানোখানার উপর।

পিছনে এসে কখন যে দাঁড়িয়ে আছে বনহুর সে দেখতে পায়নি। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে দেখে সে, মুখে ফুটে উঠে একটা আনন্দদ্যুতি। ডাকে এক সময় —শ্যালন!

চমকে ফিরে তাকায় শ্যালন, তাড়াতাড়ি পিয়ানোর পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—এতো দেরী করে এলে আলম? বাহু দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে ওর কণ্ঠ।

হাসিমুখে জবাব দেয় বনহুর—কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই ফিরতে দেরী হয়ে গেলো। সত্যি আমি বড্ড অপেয়, তাই তোমার মাসুদ ইরানীর পিয়ানো আজ শুনবার সৌভাগ্য আমার হলোনা।

কিন্তু মাসুদ ইরানী বার বার তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

নিশ্চয়ই তোমার ব্যবহারে সে মুগ্ধ হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আলম, সে বলেছে আবার আসবে।

সত্যি বলছো?

হাঁ। আর শোনো, মাসুদ ইরানী কোনো রকম ফি নেননি আমার কাছে। হার দিতে গিয়েছিলাম—নিলেন না।

চমৎকার! চমৎকার তো? তাহলে মাসুদ ইরানী তোমাকে বাড়ি বয়ে আপনা-আপনি পিয়ানো শুনিয়ে গিয়েছেন? হুঁ, হবেই তো! এবার থেকে শুধু আর একদিন কেন, রোজই ধন্না দেবেন--- একটু চুপ থেকে বললো বনহুর—মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুর তোমাকে যেমন মুগ্ধ করেছে শ্যালন, তেমনি মুগ্ধ হয়েছে মাসুদ ইরানী তোমার রূপে।

শ্যালন বনহুরের কথাটা শুনে হেসে উঠলো খিল খিল করে, তারপর বললো—এ কথা তোমাকে কে বলেছে?

আমার মন।

উঁ হুঁ, তুমি ঠিক বানিয়ে বলছো।

মোটেই না।

❑

মিথ্যা নয়, এর পর থেকে মাঝে মাঝে প্রায়ই মাসুদ ইরানী তার প্লিমাউথ গাড়িখানা নিয়ে হাজির হতো শ্যালনের পাশে। পিয়ানো বাজাতো, শ্যালন মুগ্ধ হয়ে শুনতো। কোনো পারিশ্রমিক গ্রহণ করতো না মাসুদ ইরানী শ্যালনের কাছে।

কিন্তু কোনোদিন বনহুর থাকাকালীন মাসুদ ইরানী আসতো না। শ্যালন এ জন্য অনেক সময় দুঃখ করতো।

শ্যালনের এ অনুতাপ শুনে হাসতো বনহুর।

শ্যালন বলতো—হাসলে যে বড়?

বনহুর বলতো—মাসুদ ইরানী আসেন তোমার জন্য—আমার জন্য নয়। নইলে হাজার টাকা যার এক ঘন্টা ফি, তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা বসে তোমাকে পিয়ানো শোনান। শ্যালন, একটা কথা সত্যি করে বলবে?

বলবো, বলো কি কথা?

মাসুদ ইরানীকে তুমি ভালবাসো?

এই কথা?

হাঁ, শ্যালন আমার বড় শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

শ্যালনের মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে, কোনো জবাব দেয় না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে বনহুর—তোমার মন থেকে আমি অনেক দূরে সরে পড়েছি, তাই না?

উঁ হুঁ, মাসুদ ইরানীর চেয়ে তোমাকে অনেক—অনেক ভালবাসি---শ্যালন বনহুরের গলা জড়িয়ে ধরে —কত সুন্দর তুমি!

তোমার মাসুদ ইরানীর মত নয়।

তার চেয়েও সুন্দর আলম!

❑

পড়ার ঘরে বসে আর্থার একটা বই পড়ছিলো।

রাত অনেক হয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে হাই তুলছিলো সে। যদিও তার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসছে তবু বেশ ভালো লাগছিলো বইখানা।

হঠাৎ পিছনে এসে কে যেন দাঁড়ালো, কাঁধে হাত রাখলো আর্থারের।

চমকে ফিরে তাকালো আর্থার, অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠলো— মিঃ আলম! বহুদিন অদর্শনের পর হঠাৎ আজ গভীর রাতে তার কক্ষে আলমকে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো।

বনহুর তার সম্মুখস্থ আসনে উপবেশন করে বললো—আজ অর্থ নিতে আসিনি।

কি চান তাহলে?

আপনাকে একটা কাজ করতে হবে।

কি কাজ?

তার পূর্বে বলেন, শ্যালনকে আপনি ভালবাসতেন কিনা?

আশ্চর্য হয়ে তাকায় আর্থার বনহুরের মুখে। এতো রাতে সে বহুদিন পর আলমকে তার কক্ষে দেখে অবাক হয়ে গেছে। তারপর আচমকা এক অদ্ভুত প্রশ্ন, তবু যদি শ্যালন থাকতো! কিন্তু সে তো আর নেই, কোথায় চলে গেছে কে জানে!

বিশেষ করে আর্থার জানতো না শ্যালনকে তার পিতা স্বয়ং তুলে দিয়ে এসেছিলেন নরাধম শয়তান অভয়কর বিশ্বাসের হাতে। সে জানতো শ্যালন তাদের বাড়িতে কাউকে না বলে কোথায় চলে গেছে। শ্যালনকে সে ভালবাসতো এ সুনিশ্চয়, কিন্তু শ্যালনের কাছে সে এতোটুকু সহানুভূতি বা আশ্বাস পায়নি কোনোদিন। তবু ঢোক গিলে বললো—হাঁ বাসতাম। কিন্তু শ্যালন তো আমাদের বাড়ি থেকে চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে তাও জানিনে।

বললো বনহুর—শ্যালন আমার কাছেই আছে।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো আর্থারের মুখমণ্ডল।

খুশী হলো বনহুর। এমনি আশাই করেছিলো সে, আর্থার শ্যালনের উপযুক্ত, তাতে কোনো ভুল নেই। অর্থবান সুন্দর সুপুরুষ, যে কোনো নারীর পক্ষে আর্থার কামনার পাত্র।

বনহুর বললো—শ্যালনকে আপনি বিয়ে করতে রাজি আছেন?
শ্যালন কি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হবে?
আপনার মত থাকলে আমি তাকে বাগিয়ে নেবো।
জোর করে ভালবাসা আদায় করা যায় না মিঃ আলম।
তাই বলে শ্যালনের মত একটি মেয়েকে হেলায় দূরে সরিয়ে দেওয়াও যায় না আর্থার। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।
কোথায়?
স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবে। সেখানে মাসুদ ইরানীর কাছে পিয়ানো শিখতে হবে।
পিয়ানো।
হাঁ, কারণ শ্যালন পিয়ানো ভালবাসে।
কিন্তু!
কোনো কিন্তু নয়—মাসুদ ইরানীর কাছে আপনি পিয়ানো বাজানো শিখবেন।
আমি তো পিয়ানো বাজাতে জানিনে।
জানেন না তাইতো শিখতে হবে। চলুন--
আর্থার হাতের বইখানা রেখে মোহগ্রস্তের মত উঠে দাঁড়ালো। কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলো বনহুরের পিছনে পিছনে।
গাড়ির পিছন আসনে আর্থারকে বসিয়ে নিজে বসলো বনহুর ড্রাইভিং আসনে। পিছন ফিরে বললো-কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকুন।

❑

স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের সম্মুখে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বনহুর, পিছন আসনের দরজা খুলে ধরে বললো—নেমে আসুন।
সুবোধ বালকের মত নেমে পড়লো আর্থার।
মাসুদ ইরানীর কক্ষে গিয়ে দাঁড়ালো বনহুর আর আর্থার।
বনহুর বললো-আপনি বসুন, আমি মাসুদ ইরানীকে ডেকে আনছি।
এতো রাতে তিনি জেগে আছেন?
হাতঘড়ির দিকে তাকায় বনহুর—এখন তো সবে একটা—দশ। রাত তিনটে অবধি মাসুদ ইরানী তাঁর কক্ষে জেগে থাকেন। আপনি বসুন।
বনহুর পাশের কামরায় চলে যায়।
আর্থার বসে পড়ে একটা সোফায়।
প্রায় মিনিট কয়েক পরে মাসুদ ইরানী মন্থর গতিতে প্রবেশ করে সে কক্ষে।
আর্থার উঠে দাঁড়ায়, অভিনন্দন জানায়।
মাসুদ ইরানী গম্ভীর স্থির কণ্ঠে বলে—মিঃ আলমের কাছে সব অবগত হয়েছি মিঃ আর্থার। আপনি পিয়ানোবাদক হতে চান?

হাঁ, কিন্তু পারবো কিনা জানিনে।

কেন পারবেন না! পৃথিবীতে এমন কোনো কাজ নেই যা মানুষ পারে না। চেষ্টাই মানুষের জীবনে সফলতা আনে।

আসুন।

আর্থার মাসুদ ইরানীর সঙ্গে এগুলো।

পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো মাসুদ ইরানী, বসতে বললো আর্থারকে তার পাশে। মাসুদ ইরানী তাকালো দরজার দিকে, হয়তো মিঃ আলমের সন্ধানে দৃষ্টি তার ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

মাসুদ ইরানী বললো—মিঃ আলম বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, তাই তিনি বিশ্রাম করছেন।

তারপর চলে আর্থারকে মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শেখানোর পালা। সম্পূর্ণ নতুন এ ব্যাপারে আর্থার, কিন্তু মনে তার বিপুল শেখার বাসনা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলে, মাসুদ ইরানী সমস্ত অন্তর দিয়ে আর্থারকে শিক্ষা দান করে চলে।

এক সময় ভোর হয়ে আসে, মাসুদ ইরানী ছেড়ে দেয় আর্থারকে। বলে সে—এবার যেতে পারেন, কিন্তু আবার আসবেন রাত দশটায়।

তন্দ্রাচ্ছন্নের মত জবাব দেয় আর্থার—নিশ্চয়ই আসবো।

আর্থার গাড়িতে গিয়ে বসে, মনের মধ্যে তখন নানা রকম চিন্তার ফুলঝুরি ঝরে পড়তে থাকে। পিয়ানো বাজানো তাকে শিখতেই হবে, তাহলে পাবে সে শ্যালনকে। শ্যালনের রূপরাশি তাকে নতুনভাবে আকৃষ্ট করে চললো। যদিও এখন তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা নেই, তবু আশার একটা ক্ষীণ আলো উঁকি দেয় তার মনের কোণে।

সে দিনের পর হতে রোজই আসতে শুরু করলো আর্থার স্বপ্নরাগ রিক্রিয়েশন ক্লাবের দ্বিতলে মাসুদ ইরানীর কক্ষে। রাতের পর রাত চলতে লাগলো আর্থারের পিয়ানো সাধনা।

❑

মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজাচ্ছিলো।

পাশে মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে শ্যালন।

পিয়ানো বাজানো শেষ করে ফিরে তাকায় মাসুদ ইরানী শ্যালনের মুখে। অদ্ভুত কালো ড্রেসে আজ অপূর্ব সুন্দর মানিয়েছে মাসুদ ইরানীকে। মাথার সোনালী কোঁকড়ানো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। হাস্যোউজ্জ্বল মুখমণ্ডল। মাসুদ ইরানী শ্যালনের মুখে চাইতেই উভয়ের দৃষ্টি বিনিময় হয়। বলে মাসুদ ইরানী— চলুন না আজ শহর থেকে দূরে কোথাও যাই?

কিন্তু আলম যে এখনও ফিরে আসেনি?

তাতে কি আছে, আমার সঙ্গে গেলে নিশ্চয়ই মিঃ আলম কিছু বলবেন না বা মনে করবেন না, জানি তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি।

হাঁ, আলম সত্যিই মহান হৃদয় লোক।

চলুন শহর থেকে আজ আমরা চলে যাবো অনেক দূরে বাইরে কোথাও। শহরের কর্মব্যস্ততার কোলাহল যেখানে নেই।

নেই যন্ত্রচালিত যানবাহনের কর্কশ নিষ্ঠুর শব্দ। নেই কলকারখানার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মত জমাট ধূম্ররাশি। মিস শ্যালন, আমি শহরের একঘেয়েমিতে বড় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি।

উঠে দাঁড়ায় শ্যালন—একটু অপেক্ষা করুন, আমি তৈরি হয়ে ফিরে আসছি।

শ্যালন চলে যায়, কিছুক্ষণ পর ফিরে আসে।

মাসুদ ইরানী অবাক হয়ে তাকায় শ্যালনের পা-থেকে মাথা পর্যন্ত। হেসে বলে—চমৎকার!

শ্যালনও ঠিক্ মাসুদ ইরানীর মত কালো গাউন পরে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে। শ্যালনের সোনালী চুলগুলোও এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে ঘাড়ে -পিঠে-কাঁধের চারপাশে।

আজ মাসুদ ইরানী শ্যালনের হাত মুঠায় চেপে ধরে বলে—মিস শ্যালন, সত্যি আপনি অপূর্ব!

আপনিও! ছোট্ট করে জবাব দেয় শ্যালন।

❑

কলকাতা শহরের বাইরে এসে পড়ে তারা।

আজ নতুন নয় শ্যালনের, আরও কয়েকদিন সে মাসুদ ইরানীর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে কিন্তু শহরের বাইরে এতদূরে কোনোদিন আসেনি। আলিপুরের বাগান, চিড়িয়াখানা, যাদুঘর, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল—আর কোনোদিন বা গিয়েছে চিত্রা সিনেমা হলে বা ষ্টার থিয়েটারে। আলম এজন্য কোনোদিন তাকে কিছু বলেনি বরং শুনে খুশীই হয়েছে। তাই শ্যালন আজও মাসুদ ইরানীর সঙ্গে এক কথায় বেরিয়ে পড়লো নিঃসঙ্কোচে। একেবারে পল্লীর জনহীন পথে এক্কা ঘোড়ার গাড়িতে পাশা-পাশি বসেছে ওরা। মাসুদ ইরানী ঘোড়ার লাগাম হাতের মুঠায় চেপে ধরে বসেছিলো। হাস্যোদ্দীপ্ত ওর মুখ, শ্যালনকে সম্মুখে বসিয়ে অনুভব করছিলো প্রকৃতির অপূর্ব দৃশ্য।

মেঘশুন্য আকাশ।

বৈকালের শেষ সূর্যাস্তের আলোকরশ্মি ছড়িয়ে পড়ছিলো তাদের চোখেমুখে। এলোমেলো বাতাসে দেহমন যেন আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠছিলো।

ঘোড়ার গাড়ির ঘড় ঘড় আওয়াজের সঙ্গে, ঘোড়ার খুরের খট খট শব্দ এক যাদুময় পরিবেশ সৃষ্টি করছিলো।

মাসুদ ইরানী বললো—মিস শ্যালন, আপনি গান গাইতে জানেন?

জানি, কিন্তু ভাল লাগবে আপনার?

কেন লাগবে না?

আপনি হলেন একজন পৃথিবীর সেরা সঙ্গীত-সাধক আর আমি কোন্ ছার—সামান্য একটি তরুণী।

হাসে মাসুদ ইরানী— সঙ্গীত-সাধক হলেও গায়ক তো নই।

এমুহূর্তে তোমার মিষ্টি গলার সুমিষ্ট আওয়াজ নির্জন প্রন্তরে এক অভিনব সুর সৃষ্টি করবে।

বেশ গাইছি...শ্যালন গান গায়।

এক্কা ঘোড়ার গাড়ির খট খট আওয়াজ আর শ্যালনেরর গানের সুর অদ্ভুত এক পরিবেশের সৃষ্টি করে চলে।

তারপর এক সময় ফিরে আসে মাসুদ ইরানী আর শ্যালন। দিনের পর দিন মাসুদ ইরানী আর শ্যালনের মধ্যে এমনি করে গড়ে উঠে গভীর এক প্রেমের সৌধ। আলম ধীরে ধীরে সরে পড়তে থাকে শ্যালনের মনের গহন থেকে।

এদিকে যেমন মাসুদ ইরানী আর শ্যালনের মধ্যে একটা গভীর সম্বন্ধ গড়ে উঠছিলো, ওদিকে তখন আর্থার পিয়ানো সাধনা নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত কাটিয়ে চলেছে।

আর্থার পিয়ানো বাজায়— মাসুদ ইরানী পায়চারী করে আর কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করে। হঠাৎ একদিন আর্থারের পিয়ানো তাকে আত্মহারা করে ফেললো, মাসুদ ইরানী আনন্দের আতিশয্যে জড়িয়ে ধরলো আর্থারকে, অস্ফুট কণ্ঠে বললো— আপনি সার্থক হয়েছেন মিঃ আর্থার, আপনি জয়ী হবেন!

মাসুদ ইরানী আচম্‌কা খুলে ফেলে তার মাথার কোঁকড়ানো রেশমী সোনালী চুলগুলো।

অবাক চোখে তাকায় আর্থার, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠে— মিঃ আলম!

হাঁ, মাসুদ, ইরানীর কাজ আজ থেকে শেষ হলো।

কিন্তু আপনি---------

এবার আপনাকে মাসুদ ইরানী সাজতে হবে।

আমাকে?

হাঁ, আজ থেকে আপনিই মাসুদ ইরানী। মিঃ আর্থার, আপনার সঙ্গে আমার বিশেষ কতগুলো কথা আছে। —মাসুদ ইরানীর ড্রেস পাল্টে ফিরে এলো বনহুর। বসলো আর্থারের পাশে, সিগারেট কেসটা হাতে তুলে নিয়ে বাড়িয়ে ধরলো—মিঃ আর্থার, নিন।

আর্থার শুধু স্তম্ভিতই নয়, হতভম্ব হয়ে গেছে— সে কল্পনাও করতে পারেনি— আলম মাসুদ ইরানী। তন্দ্রাচ্ছন্নের মত বনহুরের এগিয়ে ধরা সিগারেট কেস থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলো।

বনহুর নিজেও একটা সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে গুঁজে দিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করলো। একমুখ ধূয়া সম্মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বললো— মিঃ আর্থার, পিয়ানো কোনোদিনই আমার চর্চ্চা ছিলো না। কলকাতায় এসে আমি বাধ্য হয়েছি পিয়ানো চর্চ্চা করতে। কয়েক মাসের সাধনায় আমি জয়লাভ করেছি। আমার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। শ্যালন ভালবাসতো আলমকে, এখন সে ভালবাসে পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানীকে। মিঃ আর্থার, এবার আপনাকে কিছুদিনের জন্য মাসুদ ইরানীর অভিনয় করতে হবে— বিশেষ করে শ্যালনের সঙ্গে।

ঢোক গিলে শুষ্ক কণ্ঠে বললো আর্থার— মাসুদ ইরানী!

হাঁ, ভয় নেই আপনাকে আমি সাহায্য করবো। চলুন পাশের ঘরে। বনহুর টেবিলে খুলে রাখা সোনালী কোঁকড়ানো পরচুলাটা তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো— আসুন আমার সঙ্গে।

আর্থার অনুসরণ করলো বনহুরকে।

তারপর নিজের হস্তে আর্থারকে মাসুদ ইরানীর ড্রেস পরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো— ভেরি নাইস্---এই হলেই চলবে। কিন্তু মনে রাখুন, কোনো সময় আপনি শ্যালনের কথায় ঘাবড়ে যাবেন না বা কোন কেনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ করবেন না।

বনহুর আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিলো কেমন করে তার চলতে হবে। প্রথম শ্যালনের বাড়িতে গিয়ে তাকে কিভাবে অভ্যর্থনা জানাতে হবে। তারপর কিভাবে আলাপ—আলোচনা করতে হবে— সব বলে ঠিক করে নিলো বনহুর।

মাসুদ ইরানীর বেশে আর্থারকে ঠিক পূর্বের মাসুদ ইরানীর মতই লাগছে।

বনহুর তার বিরাট প্লিমাউথ্ গাড়ির ড্রাইভিং আসনে মাসুদ ইরানীবেশী আর্থারকে বসিয়ে নিজেও বসলো তার পাশে।

গাড়ি চালিয়ে চললো আর্থার মানে মাসুদ ইরানী।

❑

শ্যালন রেলিং এর পাশে ঝুকে পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো, মাসুদ ইরানীর আসার সময় হয়েছে। প্রতিদিন সে এমনি সময় মাসুদ ইরানীর প্রতীক্ষায় রেলিং -এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকে।

গাড়ি-বারান্দায় গাড়ি পৌছতেই ছুটে এলো শ্যালন তার হাইহিল জুতোর গোড়ালীতে শব্দ তুলে। কিন্তু গাড়ির পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো, বললো— আলম তুমি!

বনহুর হাসিমুখে বললো— হঠাৎ পথের মধ্যে মাসুদ ইরানী আমাকে দেখতে পেয়ে তার গাড়িতে উঠিয়ে নিলেন।

গাড়ির দরজা খুলে নেমে পড়লো বনহুর আর মাসুদ ইরানী

শ্যালন মাসুদ ইরানীর দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে চুম্বন করলো হাতের পিঠে।

তারপর তিনজন এগিয়ে গেলো হলঘরে।

বনহুর বললো— মাসুদ ইরানী, সত্যি আমি দুঃখিত— এতো দিনের মধ্যে আজ শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ ঘটলো।

হেসে বললো মাসুদ ইরানী—আমিও সেজন্য কম দুঃখিত নই মিঃ আলম। যাক্, তবু আপনার সঙ্গে পূর্বে আলাপ ছিলো বলেই আজ পথে আপনাকে দেখতে পেয়ে সঙ্গী করে নিতে পারলাম।

আমার পরম সৌভাগ্য আজ আপনার পিয়ানো শুনতে পাবো। কি বলো শ্যালন, সত্যি কিনা?

নিশ্চয়ই আজ তোমার পরম ভাগ্য আলম।

বনহুর হাসলো।

মাসুদ ইরানী পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসলো।

শ্যালনও উঠে এসে বসলো ওর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

বনহুর বললো— এবার শুরু করুন মিঃ ইরানী।

মাসুদ ইরানী একবার বনহুরের মুখে তাকিয়ে নিয়ে পিয়ানোতে হাত রাখলো। বুকের মধ্যে ওর ঢিপ্ ঢিপ্ করছে তখন।

বনহুরের মনেও যে আলোড়ন শুরু হয়নি তা নয়, যদি কোনো রকম ভুল হয় তাহলে শ্যালন নিশ্চয়ই ধরে ফেলবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার ঠিকভাবে পিয়ানো বাজিয়ে গেলো।

বনহুরের আনন্দ আর ধরে না!

পিয়ানো বাজানো শেষ করে মাসুদ ইরানী তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর মাথা নত করে অভিনন্দন জানালো।

শ্যালনের করতালিতে মুখর হয়ে উঠলো হলঘর।

সেদিন আর বেশিক্ষণ মাসুদ ইরানী অপেক্ষা করলো না, সে শ্যালন আর আলমের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

বনহুর লক্ষ্য করলো, শ্যালনের মুখ বেশ গম্ভীর হয়েছে।

তখনও তাকিয়ে আছে শ্যালন যেদিকে প্লিমাউথ গাড়িখানা অন্তর্ধান হয়েছে।

বনহুর কাঁধে হাত রাখে শ্যালনের।

শ্যালন ফিরে তাকায়, বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মাথা নত করে নেয়।

বনহুর হেসে উঠে— আমি বুঝতে পেরেছি শ্যালন, মাসুদ ইরানী তোমার হৃদয়-মন হরণ করে নিয়েছে।

শ্যালন আবার তাকায় বনহুরের মুখে, সে দেখতে চায় ও-মুখে কোনো রকম পরিবর্তন এসেছে কিনা।

বনহুর শ্যালনের হাত ধরে কক্ষমধ্যে নিয়ে যায়, ওকে বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পাশের সোফায়, বলে বনহুর— শ্যালন, মাসুদ ইরানী তোমাকে বিয়ে করতে চায়, বলো তুমি রাজী আছো?

শ্যালন ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে যায়-----একদিন আলমকে বিয়ে করার জন্য শপথ করেছিলো সে। আজ আর একজনকে বিয়ে করবে বলে কি করে মত দেবে!

শ্যালনকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে বলে বনহুর—বিশ্ববিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী বহু নারীর কামনার পাত্র। শ্যালন, তাঁকে স্বামীরূপে পাওয়া পরম ভাগ্যের কথা। বলে তাকে বিয়ে করতে রাজি আছো?

শ্যালন বলে এবার— হাঁ, রাজী আছি।

তোমাকে কংগ্রাচুলেশন্ জানাচ্ছি শ্যালন। বনহুরের কণ্ঠে আনন্দ ধ্বনি হয়।

শ্যালন করুণ চোখে তাকায়, ব্যথাভরা কণ্ঠে বলে— তুমি রাগ করলে না তো?

রাগ। উহু! তোমার উপযুক্ত আমি নই শ্যালন, তাই আমি মনকে শক্ত করে নিয়েছি। একটু নিশ্চুপ রইলো বনহুর, তারপর বললো— মাসুদ ইরানী যদি কাল আসে তুমি তাকে বলো। শ্যালন, সে তোমার মুখে বিয়ের কথাটা শুনতে চায়।

সেদিন আর বেশি কথা হলো না তাদের মধ্যে।

বনহুর নিজের ঘরের দিকে চলে গেলো।

শ্যালনের চোখে আজ স্বপ্নের মায়াজাল, সে কল্পনার চোখে দেখতে পায়-- সে তার মাসুদ ইরানীর পাশে বসে আছে। মাসুদ ইরানী পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে, তন্ময় হয়ে তাকিয়ে আছে শ্যালন তার মুখের দিকে। ----নির্জন পল্লীর জনহীন পথ। এক্কা ঘোড়ার গাড়ি। পাশাপাশি বসে আছে মাসুদ ইরানী আর সে। মাসুদ ইরানীর হস্তে অশ্বের লাগাম, শরীরে তার কালো ড্রেস, মুখে মিষ্টি মধুর হাসি। ------শ্যালনের শরীরেও ওর মত কালো ড্রেস, বাতাসে চুলগুলো উড়ছে। গান গাইছে শ্যালন, অপূর্ব সুরের ঝঙ্কারে মুখরিত হয়ে উঠেছে পথ আর প্রান্তর। আকাশের নীল ওদের মনে লাগিয়েছে রঙের রামধনু।-----মাসুদ ইরানী শ্যালনকে টেনে নেয়, শ্যালন ওর বুকে মাথা রাখে----- মাসুদ ইরানীর সঙ্গে শ্যালনের দিনগুলো ভেসে উঠে পর পর তার মনের আকাশে।

পাশের কক্ষে তখন বনহুর বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে তাকিয়ে আছে কড়িকাঠের দিকে। আফ্রিকার জঙ্গলে কি করে শ্যালনকে সে গরিলার কবল

থেকে উদ্ধার করেছিলো। কি করে জাহাজে একসঙ্গে কেটেছে ওদের। তারপর কলকাতায় আসার পর থেকে শ্যালন আর তার দিনগুলো কিভাবে এগুচ্ছিলো— সব স্মরণ হতে লাগলো আজ বনহুরের নতুন করে। শ্যালনকে ভাল লেগেছিলো, কেন এতো মুগ্ধ হয়েছিলো ওর প্রতি বনহুর নিজেই যেন বুঝতে পারেনি। নিজের অজ্ঞাতেই সে একদিন আকৃষ্ট হয়েছিলো শ্যালনের মধ্যে। অবশ্য শ্যালনকে সর্বক্ষণ, সর্বদিন ফাঁকি দিয়ে এসেছে। সরলপ্রাণা শ্যালন গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছিলো আলমকে, সে কোন দিন বুঝতে পারেনি— আলম তাকে সর্বসময় এড়িয়ে চলতে চায়! তবে মাসুদ ইরানীর বেশে বনহুরকে অনেকখানি ধরা দিতে হয়েছিলো শ্যালনের কাছে। তা না হলে কোনো উপায় ছিলো না।

আজ শ্যালনকে মাসুদ ইরানীবেশি আর্থারের হাতে তুলে দিতে সত্যি তার অন্তরে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করছিলো। শ্যালনকে নিজের অজ্ঞাতে কখন যে সে এতোখানি ভালবেসেছিলো —সে-ই টের পায়নি। সমস্ত রাত বনহুর অনেক চিন্তা করলো, আবোল-তাবোল কত কি ভাবলো— আজ কেউ বাদ গেলোনা তার চিন্তাধারা থেকে। দস্যু কালু খাঁ থেকে তার মা---- বাবা, মনিরা, নূরী, একমাত্র সন্তান নূরের কথাও আজ স্মরণ হলো।

কান্দাই ফিরে যাবার জন্য মন যেন অস্থির হয়ে উঠেছে। তার আস্তানা, অনুচরবর্গ, অশ্ব তাজ এদের কথা আজ বার বার মনে পড়তে লাগলো। কতদিন হলো বনহুর তার আস্তানা ত্যাগ করে এসেছে।

প্রায় সমস্ত রাত্রিই ঘুম হলো না বনহুরের।

❑

পরদিন এলো মাসুদ ইরানী।

শ্যালন আনন্দে আপ্লুত হলো।

বনহুর তখন নিজের কক্ষে পায়চারী করছে। শ্যালনকে কত বড় ধোকা সে আজ দিতে চলেছে। শ্যালন কি সত্যিই মাসুদ ইরানীকে ভালবেসেছিলো? সে ভালোবেসেছিলো মাসুদ ইরানী আসল মানুষটিকে —তার খোলসটিকে নয়। আজ সরল প্রাণা শ্যালনের পাশে যাকে মাসুদ ইরানী বেশে উপস্থিত করে দিয়েছে বনহুর, সে মাসুদ ইরানীর খোলস ছাড়া কিছু নয়।

মনটা আজ বড় অস্থির লাগছে বনহুরের। পাশের কামরায় শ্যালনের প্রাণখোলা হাসির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। হয়তো বা মাসুদ ইরানীর সঙ্গে সে কোনো ব্যাপারে আনন্দে মেতে উঠেছে।

বনহুর মনকে স্থির করে নেয়, শ্যালনকে আর্থারের হাতে যতক্ষণ সঁপে না দিচ্ছে ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই।

এমন সময় মাসুদ ইরানীর হাত ধরে শ্যালন তার কক্ষে প্রবেশ করে।

বনহুর পায়চারী করছিলো, থমকে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে তাকায়।
শ্যালন বলে— আমরা একটু বাইরে যাচ্ছি আলম।
বেশ যাও। বললো বনহুর।
শ্যালন আর মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার বেরিয়ে গেলো তার কক্ষ থেকে।
শ্যালন মাসুদ ইরানীর হাত ধরে নিয়ে গেলো, প্রায় টেনে নিয়েই চললো সে ওকে।
বনহুর দ্বিতলের রেলিং-এর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। দেখতে পেলো— শ্যালন মাসুদ ইরানীর হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলো। উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসছে।
মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার ঠিক বনহুরের অনুকরণেই অভিনয় করে চলছে। হাসলো বনহুর, আপন মনেই বললো সে— সার্থক আর্থার তুমি!
সেদিনই আর্থারবেশী মাসুদ ইরানী আর শ্যালন ফিরে আসার পর বনহুর ওদের মধ্যে দাঁড়ালো, হেসে বললো— আমি তোমাদের একটি কথা বলতে চাই।
শ্যালন ও আর্থার প্রশ্ন ভরা দৃষ্টি তুলে তাকালো।
বনহুর বললো— শ্যালন, আমি চাই তোমাদের এ প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ়— আরও মজবুত করে দিতে! বলো, তোমরা রাজী আছো?
শ্যালন আর মাসুদ ইরানী মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলো। তারপর বললো শ্যালন— হাঁ, আমরা রাজী আছি।
বনহুর এবার ওদের দু'জনাকে নিয়ে ক্যালকাটা সেন্ট জন্স গীর্জায় গিয়ে উপস্থিত হলো।
ঠিক বিয়ের পূর্ব মুহূর্তে বললো বনহুর— শ্যালন, একটি কথা আছে তোমার সঙ্গে।
শ্যালন বললো— বলো?
বনহুর ওকে গীর্জার এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললো— শ্যালন, সত্যিই তুমি মাসুদ ইরানীকে ভালবাসো তো?
হাঁ, তাকে আমি ভালবাসি।
অন্তর থেকে বললে এ কথা?
হাঁ।
যদি মাসুদ ইরানীর আসল পরিচয় জেনে তুমি তাকে উপেক্ষা করো বা বিয়ে করতে রাজী না হও?
না। আমি তাকে ভালবাসি। তার আসল পরিচয় আমাকে আমার সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে সক্ষম হবে না।
বেশ, তোমার সংকল্প অটুট থাক। বিখ্যাত পিয়ানোবাদক মাসুদ ইরানী আর কেহ নয়— তোমাদের পরম আত্মীয় মিঃ আর্থার।
বিস্ময়ে চমকে উঠলো শ্যালন, অবাক হয়ে তাকালো সে মাসুদ ইরানীর মুখের দিকে।

মাসুদ ইরানীবেশি আর্থার তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।
কারো মুখে কথা নেই।
গীর্জার ফাদার সম্মুখে দণ্ডায়মান।
বনহুর ওপাশে রক্ষিত টেবিল থেকে দু'গাছা ফুলের মালা নিয়ে দু'জনার হাতে দেয়।
ফাদার বলেন— শুভ মুহূর্ত চলে যাচ্ছে। বিয়ের মন্ত্র উচ্চারণ করতে থাকেন তিনি।
শ্যালন স্থবিরের মত মালাটা পরিয়ে দেয় মাসুদ ইরানীবেশি আর্থারের গলায়।
আর্থার তার হস্তস্থিত মালাটা শ্যালনের কণ্ঠে দেয়।
ফাদার ইংরেজিতে উচ্চারণ করেন তাদের বিয়ের মন্ত্র।
বিয়ে হয়ে যায়।
বনহুর আনন্দের হাসি হাসে!

❑
বনহুর আজ বন্ধনহীন।
মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছে সে। শ্যালন আর তাকে বিরক্ত করতে আসবে না কোনোদিন। কথাটা ভাবতেই বনহুরের মনটা যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো। আজ সমস্ত দিনটা সে এতোটুকু স্বস্তি পায়নি— যতই শ্যালনের কথা মন থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে, ততই যেন গভীরভাবে দাগ কেটে বসেছে ওকে। সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ করে চললো সে।
বনহুর হাতঘড়ির দিকে তাকালো।
রাত দু'টো বেজে বিশ মিনিট হয়েছে। আসন ত্যাগ করে উঠতে পড়লো। আজ তাকে জিজ্ঞাসা করবার কেউ নেই! এতোবড় বাড়িখানায় শুধু বনহুর একা— নিঃসঙ্গ!
চাকর-বাকরগণ তাদের নিজ নিজ বিশ্রামকক্ষে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন!
বনহুর তার ড্রেসিং কক্ষে প্রবেশ করে।
তারপর যখন বেরিয়ে আসে তখন তাকে ঠিক একটি শ্রমিকের বেশে দেখা যায়। কাপড়ের নীচে ছোট্ট আণ্ডারওয়ারের মধ্যে লুকিয়ে নিলো একগাছা সিল্ক-কর্ড আর একটি রিভলভার। গাড়িখানা তার গাড়ি-বারান্দায় অপেক্ষা করছিলো, ড্রাইভিং আসনে উঠে বসে ষ্টার্ট দিলো। একেবারে সোজা শ্যামবাজার অভিমুখে রওয়ানা দিলো সে।
কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্যামবাজার এসে পড়লো বনহুর। সে পূর্বের গলি, যে গলির মধ্যে একদিন ড্রাইভারের বেশে অভয়কর বিশ্বাসের গাড়ি নিয়ে সে এসেছিলো। গাড়িখানা একটা এঁদো পঁচা গলির মধ্যে ব্যাক্ করে রেখে

নেমে এলো বনহুর। ঠিক সে দরজায় এসে দাঁড়ালো, যে দরজা খুলে একদিন বেরিয়ে এসেছিলো গুণ্ডাদের সর্দার মহাতক সিং।

বনহুরের মাথায় গামছা বাঁধা। কাপড়টা ছেঁড়া এবং ময়লা, হাঁটুর উপর উঁচু করে পরা রয়েছে! গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া জামা। গলায় কালো ফিতায় গাঁথা মাদুলী। কেউ তাকে কুলী না বলে উপায় নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে টোকা দিলো বনহুর। একবার, দু'বার তিনবার । দরজা খুলে গেলো, একটি ভয়ঙ্কর মুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর লম্বা একটা সেলাম ঠুকে বললো— আমি বালিগঞ্জ থেকে আসছি, কথা আছে সর্দারের সঙ্গে।

ভয়ঙ্কর চেহারার লোকটা বনহুরকে সঙ্গে যাওয়ার জন্য ইংগিত করলো!

বনহুর অনুসরণ করলো তাকে।

বাড়িটা সম্মুখ থেকে ভাংগাচোরা মনে হলেও ভিতরে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। ঠিক একটি হোটেলের অভ্যন্তরের মত! চারদিকে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রসর হলো বনহুর। পরপর কয়েকখানা ঘর পেরিয়ে ওদিকে মাঝখানের একটা ঘরে বেশ কিছুসংখ্যক চেয়ার-টেবিল পাতা রয়েছে। ঘরটা খুব লম্বা এবং প্রশস্ত। প্রত্যেকটা চেয়ার টেবিলে চার-পাঁচজন গুণ্ডা ধরনের লোক বসে হাসি-গল্প করছে আর বোতল বোতল মদ পান করছে। কেউ কেউ তাস নিয়ে জুয়া খেলতে বসেছে।

ওদিকের একটা টেবিলে বসে আছে সেদিনের সে গুণ্ডা সর্দার মহাতক সিং। সে একটা গোটা বোতল মুখের কাছে তুলে নিয়ে পান করছিলো।

তার লোকের সঙ্গে একটি অপরিচিত লোককে দেখে মহাতক হাতের বোতলটা নামিয়ে রাখলো। রক্ত রাঙা চোখ দুটো তুলে তাকালো তাদের দিকে।

লোকটা বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো— ইনি আমাদের সর্দার।

বনহুর সেলাম করলো।

মহাতক বললো— কোথা থেকে এসেছিস বেটা?

কণ্ঠে ভীতিভাব এনে বললো কুলীবেশি দস্যু বনহুর— হুজুর বালিগঞ্জ থেকে। ভীম সিং আমাকে পাঠিয়েছে।

ভীম সিং?

হাঁ হুজুর।

বনহুর মনে মনে কিন্তু অবাক না হয়ে পারলো না। সেদিন অভয়কর বিশ্বাসের ড্রাইভারের বেশে এসে মহাতকের কণ্ঠে যে ভাষা সে শুনেছিলো সে নিখুঁত হিন্দি ভাষা— বাংলা যেন বলতেই জানেনা আর কি। আর আজ সুন্দর বাংলা বলছে, কোনো ভুল নেই তার কথায়।

মহাতক বললো আবার— ভীম সিং-এর খবর কি?

হুজুর, ভীম সিং এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। সে আমাকে পাঠিয়েছে।

হাঁ, এবার মনে পড়েছে— তার কাছে আমার জরুরী একটা কাজ ছিলো। তুমি বসো, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। মহাতক কাগজ আর কলম নিয়ে বসলো।

চিঠিখানা লিখা শেষ করে হাতে দিলো মহাতক কুলীবেশি দস্যু বনহুরের।

বনহুর চিঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

মহাতক ডাকলো— কালকেই সে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে বলো!

আজ্ঞে বলবো। বেরিয়ে যায় কুলীবেশি বনহুর।

বনহুর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে এলো গলিপথ থেকে। বেশ কিছু দূর চলার পর একটা লাইট পোষ্টের পাশে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে বের করলো মহাতকের দেয়া চিঠিখানা। মেলে ধরলো চোখের সামনে। চিঠিতে লিখা আছে— সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অক্ষর—

"ভীম— মাং--বং ---একং---হাং---ব
সিং---মিং--- পাং --- খিং--- পুং--- ডং--
জাং--- থাং--- বেং --- আঃ--- সেং--
টাং--- মিং--- দিং-- বোং--

তোমার মহা-

বনহুর চিঠিখানা নিয়ে ফিরে এলো নিজের বাসায়। কুলীর ড্রেস পাল্টে এসে বসলো আলোর সামনে। সিগারেট কেট বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে নিলো, তারপর মহাতকের দেয়া চিঠিখানা বারবার পড়তে লাগলো। কিছু বোঝা যাচ্ছে না, সংকেতপূর্ণ শব্দ লিখেছে মহাতক ভীম সিং-এর কাছে। অদ্ভুত শব্দ ----আপন মনে হাসলো বনহুর।

এবার সে একটা কাগজ আর কলম তুলে নিলো। তারপর লিখে চললো, কতবার যে আবোল-তাবোল কত কি লিখলো! কতবার ছিঁড়ে টুকরো করে ফেললো তার ইয়ত্তা নেই।

বনহুর আবার মনোযোগ দিলো মহাতকের চিঠিখানায়।

বনহুর লিখলো, বহুবার ছিঁড়লো— হঠাৎ একবার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল! আপন মনেই বলে উঠলো, পেয়েছি— পেয়েছি এবার। লেখা কাগজখানার পাশে মেলে ধরলো মহাতকের দেয়া সাংকেতিক চিঠিখানা মিলিয়ে পড়তে লাগলো। প্রথম মহাতকের সাংকেতিক চিঠিখানা পড়ে নিলো সে—

ভীম্---মাং--- বং--- একং--- হাং--- ব --সিং
মিং--- পাং-- খিং-- পুং-- ডং--জাং--
থাং--- বেং-- আঃ---সেং--- টাং--- মিং --
দিং--- বোং---

ঐ চিঠিখানার সঙ্গে মিলিয়ে এবার পড়তে লাগলো নিজের লিখাটা —

ভীম সিং, মালিককে-—বলো—এক —হাজার

বস্তা— সিমেন্ট —পাঠাতে —খিদির—পুর— ডকে
জাহাজ—থাকবে — আমি —সেখানে গিয়ে—টাকা—
মিটিয়ে —দিবো---

উল্লসিত ভাবে হেসে উঠলো বনহুর, তারপর কাগজ দু'খানা ছিঁড়ে ফেললো টুকরা টুকরা করে।

❑

খিদিরপুর ডক।

হাজার বস্তা সিমেন্ট ভর্তি হয়েছে জাহাজে। অল্পক্ষণ পরই জাহাজ খিদির পুর ডক ছেড়ে রওয়ানা দেবে।

রাত তখন বারোটা বেজে গেছে।

ডকের খালাসীরা এবার সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম নিতে চলে গেছে। দু'চারজন এখনও ঘোরাফেরা করছে বটে কিন্তু তারা কোনো মাল বহনের আশায় নয়, কোনো পরিচিত বন্ধুর খোঁজে হয়তো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হয়তো বা একটা বিড়ির প্রয়োজন হয়েছে বা এক খিলি পান খাবে ওর পয়সায়।

জাহাজের সিঁড়ি এখনও উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। ডেকের রেলিং— এর পাশে দু'টো লোক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিম্নস্বরে কিছু কথাবার্তা বলছিলো।

অদূরে ডেকের অন্ধকারে আর একটি কালোমূর্তি দাঁড়িয়ে ছিলো রেলিং-এ ঠেশ দিয়ে। সমস্ত শরীর কালো ড্রেসে আবৃত। মাথায় জমকালো ক্যাপ। অন্ধকারে তাকে মোটেই দেখা যাচ্ছিলো না।

ডকে দাঁড়িয়ে যারা এতোক্ষণ কথাবার্তা বলছিলো তারা এবার পাশের ক্যাবিনে প্রবেশ করলো। ক্যাবিনের দরজাটা টেনে দিলো প্রথম ব্যক্তি। ক্যাবিনের আলোতে দেখা গেলো— ওরা দু'জনের একজন মহাতক সিং, দ্বিতীয় জন অন্য কেহ নয়— স্বয়ং অভয়কর বিশ্বাস। বেশ কিছুদিন তিনি নীরব থাকার পর আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছেন। ভুলে গেছেন কালোমূর্তির শাসনবাণী। আবার অভয়কর বিশ্বাস শুরু করেছেন কালোবাজারী। গোপনে তিনি দেশ—বিদেশে ব্ল্যাকে সিমেন্ট চালান দিয়ে যাচ্ছেন।

মহাতকের নিকট হতে আজকের সিমেন্টের টাকা গুণে নিলেন অভয়কর বিশ্বাস।

জাহাজ ছাড়ার ভোঁ বেজে উঠেছে।

ব্যাগ হস্তে উঠে দাঁড়ান অভয়কর বিশ্বাস।

ঠিক্ সে মুহূর্তে ক্যাবিনে প্রবেশ করে কালো মূর্তি— হস্তে উদ্যত রিভলভার। চোখে কালো চশমা।

মুহূর্তের জন্য চমকে উঠলো উভয়ে। কিন্তু মহাতক সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিলো, আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো ওর চোখ দুটো! দাঁতে দাঁত পিষে বললো— কে তুই?

কালোমূর্তি অন্য কেউ নয়— স্বয়ং দস্যু বনহুর। কালো চশমার আড়ালে তার চোখ দুটো দিয়েও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হতে লাগলো। কঠিন কণ্ঠে বললো সে—খবরদার নড়বে না!

মহাতকের নিশ্বাস ফোঁস ফোঁস করে বইছে, রাগে ফুলে উঠেছে ওর দেহের মাংসপেশীগুলো। গোঁফ দুটো সজারু কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠেছে। কলকাতার সেরা গুণ্ডা সে। সমস্ত গুণ্ডাদলের সর্দার মহাতক— আর সে কি না ভয় পাবে সামান্য এক কালোমূর্তি দেখে। এতোক্ষণ ঝাপিয়ে পড়তো সে কালো মূর্তির উপর। কিন্তু ওর হস্তের আগ্নেয় অস্ত্রটার জন্যই সে অগ্রসর হতে দ্বিধা বোধ করছিলো। কিন্তু সে সুযোগ খুঁজছিলো।

বনহুর রিভলভার ঠিক রেখে বাম হাতটা বাড়িয়ে দেয় অভয়কর বিশ্বাসের দিকে— ব্যাগ দাও।

অভয়কর আর মহাতক দৃষ্টি বিনিময় করেন।

ব্যাগটা যেমন বাড়িয়ে দিতে যান অভয়কর বিশ্বাস। অমনি মহাতক সিং ঝাপিয়ে পড়ে কালোমূর্তির উপর। কিন্তু ঠিক্ সে মুহূর্তে কালোমূর্তির হস্তের রিভলভার গর্জে উঠলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে ক্যাবিনের মেঝেতে পড়ে গেলো মহাতক সিং।

বনহুর দ্রুত হস্তে অভয়কর বিশ্বাসের হাত থেকে টাকার ব্যাগটা এক ঝটকায় কেড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

ততক্ষণে ছুটে আসে আরও অনেকে।

মহাতকের রক্তাক্ত দেহটাকে মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখে চীৎকার করে উঠে সবাই, খুন ---খুন--- খুন--

জাহাজ সবেমাত্র তখন বন্দর ত্যাগ করতে শুরু করেছে।

কিন্তু বন্দর ত্যাগ করা আর হলো না, সিমেন্টভর্তি জাহাজখানা আবার নোঙ্গর করতে বাধ্য হলো!

এখানে যখন মহাতকের লাশ নিয়ে মহা হুলস্থূল পড়েছে, অভয়কর বিশ্বাস ক্যাবিনের দেয়ালে মাথা ঠুকে বিলাপ করে চলেছেন— তাঁর লক্ষ লক্ষ টাকা ছিলো ঐ ব্যাগটার মধ্যে। কালোমূর্তি শুধু মহাতক সিংকে খুন করেই উধাও হয়নি, সর্বস্ব নিয়ে গেছে অভয়কর বিশ্বাসের।

বনহুর তখন তার গাড়ি নিয়ে উল্কা বেগে ছুটে চলেছে সোজা খিদিরপুর থানা অভিমুখে। ইতিমধ্যে সে দেহের কালো ড্রেস পাল্টে নিয়ে স্বাভাবিক এক ভদ্রলোকের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নিয়েছে। টাকার ব্যাগ আর রিভলভারটা সে লুকিয়ে রেখেছে ড্রাইভিং আসনের নীচে। কেউ তাকে দেখলে বুঝতে

পারবে না— একটু পূর্বেই সে একজনকে নিহত করে লক্ষ টাকা নিয়ে পালিয়েছে।

সে জাহাজ থেকে যখন ডকে নেমে আসে তখন তার গাড়িটা ডকের বাইরে একটা পানির টাঙ্কির নীচে দাঁড়িয়ে ছিলো। জায়গাটা অত্যন্ত নির্জন এবং অন্ধকার। বনহুর এখানেই তার ড্রেস দ্রুত পাল্টে নিতে সক্ষম হয়েছিলো।

বনহুর যখন খিদিরপুর পুলিশ অফিসে এসে পৌঁছলো তখন খিদিরপুর থাকা অফিসার একটা কেস থেকে সবেমাত্র ফিরে এসেছেন। চেয়ারে বসে কেবলমাত্র একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করবেন ঠিক সে মুহূর্তে বনহুর থানার মধ্যে প্রবেশ করে ব্যস্ত কণ্ঠে জানালো— স্যার, এক্ষুণি আপনাকে খিদিরপুর ডকে যেতে হবে। একটা মালবাহী জাহাজে এমাত্র খুন হয়েছে!

খুন হয়েছে?

হাঁ স্যার।

আপনি কে?

আমি অভয়কর বিশ্বাসের একজন কর্মচারী। স্যার, শুধু খুন নয়— আমাদের মালিকের প্রায় লক্ষ টাকার বেশি টাকাসহ ব্যাগ নিয়ে হত্যাকারী উধাও হয়েছে।

হত্যাকারী টাকাও নিয়েছে?

হাঁ স্যার। আপনি বিলম্ব করবেন না স্যার, এক্ষুণি চলুন।

বনহুর জানে, পুলিশ সন্ধান নিলেই সমস্ত গোপন ব্যাপার ফাঁস হয়ে যাবে। চোরা কারবারের জন্য অভয়কর বিশ্বাসও রেহাই পাবে না। সমস্ত সিমেন্ট আটক হবে পুলিশের হাতে!

নিজের গাড়িতে করেই বনহুর নিয়ে চললো ও-সি এবং কয়েকজন পুলিশকে।

খিদিরপুর ডকে পৌঁছতে বেশি বিলম্ব হলো না। বনহুর স্বয়ং পুলিশবাহিনী সহ হাজির হলো সিমেন্টভর্তি জাহাজটায়। যে ক্যাবিনে খুন হয়েছিলো সে ক্যাবিনে এসে পৌঁছলো তারা।

অভয়কর বিশ্বাসের নজর পুলিশে পড়তেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন। খুন হোক, অর্থ যাক তবু ক্ষতি নেই, কিন্তু পুলিশকে তার সবচেয়ে বেশি ভয়— বিশেষ করে তার সিমেন্টের জাহাজে। অভয়কর হকচকিয়ে গেলেন।

খিদিরপুর থানার ও সি হেমন্তবাবু যখন লাশ ইনকোয়ারী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তখন সরে পড়লো বনহুর সকলের অজ্ঞাতে। এবার সে ডকের অফিসে এসে রিসিভার তুলে নিলো, তারপর ফোন করলো লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে। ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রনাথ স্বয়ং ফোন ধরলেন ওপাশে।

বনহুর রাজেন্দ্রের গলা শুনেই চিনতে পারলো, বললো সে ইন্সপেক্টার সাহেব, আপনি এক্ষুণিই পুলিশ সুপার মিঃ বোসকে নিয়ে চলে আসুন।

খিদিরপুর ডকে যে জাহাজটি একটু পূর্বে বন্দর ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো সে জাহাজে রহস্যজনক একটি খুন হয়েছে।

মিঃ রাজেন্দ্রের গলা— রহস্যজনক খুন!

বললো— বনহুর— হাঁ রহস্যজনক খুন! আপনি এক্ষুণি পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে আসুন।

গম্ভীর কণ্ঠস্বর ইন্সপেক্টার রাজেন্দ্রের —আপনি কে? কোথা থেকে বলছেন?

বনহুর মৃদু হাসলো— আমি অভয়কর বিশ্বাসের পরম বন্ধু।

ওপাশ থেকে মিঃ রাজেন্দ্রের উভগ্রীব কণ্ঠ —আপনার নাম?

কিন্তু বনহুর তার পূর্বেই রিসিবার রেখে দেয়। বেরিয়ে আসে ডকের অফিস-রুম থেকে। অদূরে তার গাড়ি অপেক্ষা করছিলো, গাড়িতে বসে ষ্টার্ট দেয়।

❑

সোজা বনহুর গাড়ি নিয়ে বস্তির দিকে চলে যায়। অপরিচ্ছন্ন স্যাঁতসেঁতে গলির মধ্যে খোলার জীর্ণ-কুঠিগুলো সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে। পঁচা দুর্গন্ধভরা নিকৃষ্ট গলিপথ।

বনহুরের গাড়ি এসে থামলো গলির মুখে। গাড়ি থেকে নেমে বস্তির মধ্যে প্রবেশ করলো সে। টাকার ব্যাগটা বের করে নিলো ড্রাইভিং আসনের তলা থেকে।

সমস্ত বস্তি তখন নিদ্রায় ঢলে পড়েছে।

বনহুর সম্মুখের একটি দরজার বেড়া ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। কুঠিরের মিটমিটে আলোতে দেখলো অদূরে মাদুরের উপরে শুয়ে আছে গুটিকয়েক ছেলেমেয়ে আর পাশে একটি অর্ধ বয়স্ক মহিলা। ওপাশে আর একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে অর্ধবয়স্ক এক হাড় জিড়জিড়ে লোক।

বনহুর বেড়ায় টোকা দিয়ে শব্দ করলো।

ধড়মড় করে উঠে বসলো লোকটা, বনহুরকে দেখে আর্তচীৎকার করতে যাচ্ছিলো, বনহুর ওর মুখে হাত চাপা দিয়ে বলে উঠে— চেঁচাবে না, গলা টিপে মারবো। তারপর ব্যাগ খুলে বের করে টাকার বাণ্ডিল, —এই নাও, স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে আরামে থেকো। কথাটা বলে কয়েকখানা নোট গুঁজে দেয় সে লোকটার হাতের মুঠায়।

লোকটার চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়! ভয় আর আনন্দ দুটো আভাসই ফুটে উঠেছে তার মুখমণ্ডলে। ভাবছে লোকটা— সে তো স্বপ্ন দেখছেনা?

ততক্ষণে স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ঘুম ভেংগে গেছে, সবাই তাকাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর বেরিয়ে যায়, প্রতিটি কক্ষে প্রবেশ করে সবাইকে টাকাগুলো বিলিয়ে দেয়। তারপর বেরিয়ে আসে বস্তি থেকে। গঙ্গার তীরে এসে দাঁড়ায় এবার, খালি ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় গঙ্গার বুকে।

গঙ্গার শীতল হাওয়ায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চুপ হয়ে। মনটা আজ বড় হাল্কা মনে হচ্ছে ওর।

বেশ কিছু সময় গঙ্গাতীরে দাঁড়িয়ে থাকার পর গাড়িতে চেপে বসলো। গাড়িখানা এবার ছুটে চললো হ্যারিসন রোড ধরে হাওড়া ব্রীজের দিকে।

সমস্ত কলিকাতা নগরী নিস্তব্ধ।

ফুটপাতের আলোগুলো কেমন স্তিমিত মনে হচ্ছে আজ। আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টির পূর্ব লক্ষণ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গুড় গুড় শব্দে মেঘ ডাকছে।

বনহুর গাড়ি নিয়ে চলেছে।

ঠিক ব্রীজের উপরে গাড়িখানা আসতেই হঠাৎ বনহুর লক্ষ্য করলো— দুটো লোক ব্রীজের উপরে ঝাপটা-ঝাপটি করছে। একটি পুরুষ—অন্যটি নারী তাতে কোনো ভুল নেই। যদিও বেশ দূরে এ ব্যাপারটা চলেছে তবু বনহুর ভালভাবেই দেখতে পাচ্ছে। এবার সে গাড়ির স্পীড় কমিয়ে দিলো। গাড়িখানা থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত সম্মুখে ব্রীজের এক পাশে এ ধস্তাধস্তি চলেছে, পুরুষটির হাত এড়িয়ে মহিলাটি পালাবার চেষ্টা করছে কিন্তু সক্ষম হচ্ছে না।

বনহুর গাড়ি ব্রেক কষে থামিয়ে ফেললো। স্পষ্ট দেখতে পেলো—ব্রীজের এক পাশে একটি ছোট্ট কার দাঁড়িয়ে আছে। কারটি ঐ ধস্তাধস্তিরত ব্যক্তিদ্বয়ের বলেই মনে হলো।

বনহুর গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো।

ঠিক সে মুহূর্তে মহিলাটি পুরুষ লোকটির হাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো গঙ্গার জলে।

বনহুর ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো, একবার লোকটির দিকে ফিরে তাকিয়ে দেখে নিলো, পরক্ষণেই বনহুর ঝাপিয়ে পড়লো গঙ্গার বুকে।

যেমন করে হোক মহিলাটিকে বাঁচাতেই হবে। কে এ মহিলা, আর পুরুষ লোকটিই বা কে? কিন্তু পুরুষ লোকটি তখন দ্রুত তার গাড়িতে গিয়ে চেপে বসেছে। অল্পক্ষণেই গাড়ি নিয়ে লোকটা অদৃশ্য হলো ব্রীজের ওপাশে।

বনহুর তখন গঙ্গার অথৈ জলে মহিলাটির সন্ধানে হাতড়ে চলেছে।

পরবর্তী বই

দিল্লীর বুকে বনহুর

দিল্লীর বুকে বনহুর—২৬

❑

বনহুর যখন গঙ্গার বুক থেকে তীরে উঠে এলো, তখন তার হাতের উপর এগিয়ে আছে সংজ্ঞাহীন এক নারী-দেহ। যদিও গঙ্গাবক্ষস্থ ভাসমান ল্যাম্পের আলো এবং ব্রীজের লাইটের ঝাপটা আলো-রশ্মি এসে পড়ছিলো তবু বনহুর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলো না, কে এ নারী।

বনহুর যখন সংজ্ঞাহীন নারীটিকে নিয়ে তার গাড়ির পাশে এসে পৌঁছলো তখন লাইটের উজ্জ্বল আলোতে মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলো, এ যে. অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা আরতী দেবী। ভাগ্যিস্, আশেপাশে তখন কোন লোক ছিল না। গভীর রাত্রির নির্জনতায় ভরে উঠেছিলো গঙ্গাতীর ও ব্রীজের উপরিভাগ। বনহুর আর বিলম্ব করা উচিৎ মনে করলো না। হঠাৎ তাকে এবং আরতী দেবীকে দেখলে লোকে নিশ্চয়ই জঘন্য কিছু মনে করে বসবে। বিপদে পড়ার ভয় করে না বনহুর কিন্তু একটা অহেতুক হট্টগোল বা ফ্যাসাদ এ সময় পছন্দ নয় তার। বনহুর গাড়ির পিছন আসনে আরতী দেবীকে শুইয়ে দিয়ে ড্রাইভিং আসনে চেপে বসলো। যদিও তার ভিজে কাপড়ে খুব অসুবিধা হচ্ছিলো, তবু নিপুন ড্রাইভারের মত গাড়ি চালিয়ে চললো।

বনহুরের গাড়ি যখন তার বাসায় এসে পৌঁছলো, তখন চাকর-বাকর সব নাক ডাকিয়ে ঘুমাচ্ছে। আরতীর সংজ্ঞাহীন দেহটা নামিয়ে নিজের শয্যায় এনে শুইয়ে দিলো বনহুর। কিন্তু ভিজে কাপড়ে ওকে এভাবে কতক্ষণ রাখা যায়। এতে খারাপ হবার সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট।

ভিজে কাপড়টা আরতীর দেহের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে লেপটে গিয়েছিলো, সহজে খুলে ফেলার কোন উপায় ছিলো না। বাসায় কোনো মেয়ে পরিচারিকা নেই, তা হলেও তাকে নিয়ে ওর কাপড়-চোপড় পাল্টে নেওয়া যেতো।

বনহুর লাইটের উজ্জ্বল আলোতে তাকালো আরতীর এলিয়ে-পড়া সংজ্ঞাহীন দেহটার দিকে। যৌবনভরা দীপ্তময় একটি দেহ—বনহুর ধীরে ধীরে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো। একটা সঙ্কোচ আর দ্বিধা তার মনকে সঙ্কোচিত করে ফেললো। অসম্ভব, সে কিছুতেই ওর জামা-কাপড় পাল্টে দিতে পারবে না। পারবে না ওর দেহে হাত রাখতে।

কিন্তু ভোর হতেও বেশি বিলম্ব নেই। অল্পক্ষণ পরে চাকর-বাকর সব জেগে পড়বে, তখন ওকে এ অবস্থায় তার বিছানায় শায়িত দেখলে নিশ্চয়ই ওদের মনে নানারকম সন্দেহ জাগবে। তাছাড়া এভাবে রাখাটা ঠিক্ নয়। বনহুর একটা চাদর এনে আরতীর দেহে মুড়ে দিলো। তারপর মুক্ত

জানালার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে বনহুর নিজের ভিজে কাপড় পাল্টে নিয়েছে। সিগারেটে বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো বনহুর।

ভোরের আকাশ সবে তখন ফর্সা হতে শুরু হয়েছে।

বনহুর একটির পর একটি সিগারেট নিঃশেষ করে চললো। মনের মধ্যে নানারকম ভাবনার ফুলঝুরি ঝরে পড়তে লাগলো। আরতীকে সে দেখেছিলো একদিন অভয়কর বিশ্বাসের বাসভবনে। মাসুদ ইরানীর বেশে যেদিন সে পিয়ানো বাজাচ্ছিলো সেখানে। সেদিন বনহুর আরতীর পরিচয় জানতো না, তবে মেয়েটি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো সকলের অজ্ঞাতে। আরতীর মধ্যে সে দেখেছিলো সত্যিকারের একটি আদর্শ নারী-মূর্তি। ধীরস্থিরা গম্ভীরা একটি যুবতী তারপর আরতীই একদিন স্বয়ং গিয়ে হাজির হয়েছিলো মাসুদ ইরানীর খোঁজে স্বপ্নরাগ হোটেলে একেবারে তার ক্যাবিনে। সেদিন বনহুর তার চোখেমুখে যে উচ্ছ্বাস আর আনন্দের দ্যুতি দেখেছিলো সত্যি তা অপূর্ব। মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুরে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। প্রায়ই সে যেতো মাসুদ ইরানীর পিয়ানো শুনতে। কিন্তু যেদিন থেকে মাসুদ ইরানী হারিয়ে গেলো শ্যালনের মধ্যে সেদিন থেকে আরতীও আর তার মাসুদ ইরানীর সন্ধান পায়নি। শুধু আরতীই নয়, সমস্ত কলকাতায় মাসুদ ইরানীর অন্তর্ধান নিয়ে একটা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিলো। পত্রিকায় পত্রিকায় এ ব্যাপার নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। কিন্তু মাসুদ ইরানীর সন্ধান আর পাওয়া যাচ্ছে না। সবচেয়ে মাসুদ ইরানীর ভক্তগণ মুষড়ে পড়েছিলো বেশি।

পত্রিকায় মাসুদ ইরানী সম্বন্ধে নানারকম আলোচনা পড়ে হাসতো বনহুর। সমস্ত কলকাতাবাসীর মনে সে অহেতুক একটা চঞ্চলতা সৃষ্টি করছে। কিন্তু সরে না পড়ে কোনো উপায় ছিলো না। বিশেষ করে শ্যালনের জন্য তাকে সরে পড়তে হয়েছে। শ্যালন ভালবেসে ছিলো মাসুদ ইরানীকে, তাই বনহুর ছলনা করে আর্থারকে সাজিয়ে ছিলো সে মাসুদ ইরানীর ড্রেসে। তার বাসনা সিদ্ধ হয়েছে। শ্যালনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছে সে।

বনহুর মুক্তির নিশ্বাস ফেলেছিলো।

হঠাৎ আবার একি এক সমস্যা এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে। কে এই লম্পট শয়তান যে আরতীর ইজ্জৎ লুটে নেবার চেষ্টা করছিলো। গভীর রাত্রিতে ব্রীজের উপর তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে কাবু করে নিয়েছিলো। আরতী নিশ্চয়ই শয়তান লোকটির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। ঠিক সে মুহূর্তে সে যদি ঐ স্থানে গিয়ে না পৌঁছতো তাহলে আরতীকে বাঁচানো যেতো না। কেউ জানতে পারতো না আরতী কোথায় চলে গেছে। অর্থলোভী অভয়কর বিশ্বাস অর্থের লোভে তখন খিদিরপুর ডকে মৃত মহাতকের পাশে দাঁড়িয়ে টাকার জন্য বিলাপ করছে।

—মাগো, উঁঃ.....

ফিরে তাকায় বনহুর, চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তার। আরতীর জ্ঞান ফিরে এসেছে। বনহুরের মুখমণ্ডল দীপ্ত-উজ্জ্বল হয়ে উঠে। এতোক্ষণ একটা দুঃচিন্তা বনহুরের মনে উঁকি দিচ্ছিল—আরতীর জ্ঞান আর ফিরে যদি না আসে। যদি ওর মৃত্যু হয় তাহলে তখন কি হবে। সরে আসে আরতীর পাশে, ঝুকে পড়ে বনহুর—আপনি কি খুব অসুস্থ বোধ করছেন?

আরতী চোখ দুটো মেলে তাকায়, তখন সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে আসেনি। বনহুরের কণ্ঠ তার কানে পৌছেছে কিনা সন্দেহ। অর্ধ-নির্মীলিত আঁখি দুটি বনহুরের মুখে স্থির রেখে বলে আরতী—আমি কোথায়?

বনহুর আরতীর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলে—আপনি নিরাপদ স্থানে শুয়ে আছেন।

না, আমাকে তুমি ধরে এনেছো। তুমি শয়তান......

বনহুর দেখলো হঠাৎ আরতী বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

তার কণ্ঠ ক্ষীণ জড়িত হলেও তাতে ক্রুদ্ধভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এতো বেশি উত্তেজিত হলে পুনরায় অজ্ঞান হতে পারে। বনহুর আরতীর দৃষ্টি নিজের দিকে ভালোভাবে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে বললো—আমি সে নই।

না না, আমি তোমার সব চালাকি জানি। দুষ্ট বদমাইশ শয়তান কোথাকার......

মিস আরতী, আপনি অযথা ক্রুদ্ধ হচ্ছেন। আমি সে নই, ভাল করে তাকিয়ে দেখুন, আমি সে নই।

তবু আরতী উম্মাদের মতো বলে চলেছে—আমাকে যেতে দাও। আমাকে যেতে দাও। আমি তোমার সব চালাকি জানি। শয়তান হরনাথ, তুমি আমাকে নতুন নামে ডেকে ভোলাতে চেষ্টা করছো!

হরনাথ—নতুন নামে ডেকে....এসব কি বলছে আরতী! তবে কি গঙ্গার বুকে হাবুডুবু খেয়ে তার মস্তিষ্ক বিকার ঘটেছে। হয়তো তাই হবে, কিন্তু ওর আরও বিশ্রাম দরকার। বনহুর আরতীর মাথায় হাত রেখে শান্তস্বরে বললো—আপনি এখন ঘুমাতে চেষ্টা করুন। পরে আপনাকে আপনার পিতার কাছে পৌছে দিবো।

বনহুরের কথায় আরতী ঘুমালো না বা চোখ মুদলো না। সে ভালো করে তাকালো বনহুরের দিকে, ধীরে ধীরে তার দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে এলো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললো—কে, কে আপনি?

আমার পরিচয় পরে জানতে পারবেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শয়তান নই। মিস আরতী.....আপনি....

আরতী? কে আরতী? আরি আরতী নই।

আপনি এখনও সুস্থ হননি, সুস্থ হলেই সব বুঝতে পারবেন।

আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি। আমি আরতী নই—আমি আরতী নই....

ভোরের আলো তখন ফুটে উঠেছে।

বনহুর বয়কে ডেকে বললো—গরম দুধ নিয়ে আয়।

অল্পক্ষণে গরম দুধ এলো।

বনহুর বয়ের হাত থেকে দুধের গেলাস হাতে নিয়ে বললো—নিন, এ গরম দুধটুকু খেয়ে নিন।

আরতী কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে তন্ময় হয়ে দেখছে, হয়তো ভাবছে—কে এ যুবক।

বনহুর বলে—আমি কি খাইয়ে দিবো?

উঠে বসে আরতী, হাত বাড়িয়ে বনহুরের হাত থেকে দুধের গেলাসটা হাতে নেয়।

বনহুর বলে—আপনি দুধটুকু খেয়ে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমান।

যতক্ষণ জানতে না পেরেছি আমি কোথায়, ততক্ষণ আমি ঘুমাতে পারবো না।

বেশ, আমি বলছি—আপনি এখন হাওড়া শালাকিয়া এরিয়ার একটি বাসায় রয়েছেন। এ বাসাটি আমার। আমান নাম মিঃ আলম।

আশ্চর্য কণ্ঠে বললো আরতী—হাওড়া! আমি কি তাহলে কলকাতায় এসেছি?

সেকি! সে কি আপনি তো কলকাতাই থাকেন।

না না, আমি কলকাতায় থাকি না। আমি কলকাতা চিনি না।

আপনি এসব কি বলছেন মিস আরতী?

কে—কে আরতী! আমি আরতী নই.....

বনহুর বুঝতে পারলো, আরতীর স্বাভাবিক জ্ঞান এখনও ফিরে আসেনি। সে নিশ্চুপ রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বললো—আপনি দুধটুকু খেয়ে নিয়ে, আপনার জামা-কাপড় পাল্টে নিন। কারণ এখনও আপনার জামাকাপড় সম্পূর্ণ ভিজা রয়েছে।

বলুন আপনি হরনাথের কে?

আমি তার কেউ নই! যাক্ পরে সব জানতে পারবেন, আপনি অনুগ্রহপূর্বক আপনার জামা-কাপড় পাল্টে নিন। কিন্তু দুধের গেলাসটা আগে শূন্য করে ফেলুন দেখি?

এবার আরতী তার হস্তস্থিত গেলাসের দুধটুকু এক নিঃশ্বাসে পান করে নিলো।

বনহুর বললো—পাশের কামরায় জামা-কাপড় আছে.....

বনহুর কথা শেষ না করে হঠাৎ থেমে গেলো, তারপর বললো—কিন্তু আমার বাসায় তো কোন মেয়েমানুষ নেই। মিস আরতী, আপনাকে আমার পাজামা আর পাঞ্জাবী পরতে হবে।

আরতী গম্ভীর কণ্ঠে বললো—আমি ওসব পরতে পারবো না। তাছাড়া আমার জামা-কাপড় প্রায় শুকিয়ে গেছে।

অনেক বলেও আরতীর জামকাপড় পাল্টানো গেলো না। সে যেমন ছিলো তেমনি রইলো। এবার আরতী জেদ ধরে বসলো—আমাকে দেশে পৌঁছে দিন।

দেশ! অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলো বনহুর।

হাঁ, আমার দেশে আমাকে পৌঁছে দিন।

বেশ তো, একটু সুস্থ হয়ে উঠুন, আপনার বাবার কাছে আপনাকে পৌঁছে দিবো।

বাবা? আমার তো বাবা নেই।

সেকি, আপনি দেখছি গঙ্গায় ডুবে সব ভুলে গেছেন! আপনার বাবা অভয়কর বিশ্বাস কলকাতার ধনকুবের.....

অভয়কর বিশ্বাস....সে কেন আমার বাবা হতে যাবেন! আমি তাকে চিনি না।

মিস আরতী.....

আমাকে আরতী বলে ডাকবেন না, কারণ আমি মিস আরতী নই।

তবে আপনি কে?

আমি মিস লুসী ফিগাই।

লুসী ফি-গাই।

হাঁ, আমার ঐ নাম।

আপনি মিস আরতী নন?

না না-না, আমি আরতী নই। মিস আরতী কে—আমি চিনি না।

বনহুর বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। আরতী নয়—মেয়েটি শেষ পর্যন্ত উন্মাদ হয়ে গেলো! আরতীকে সে ভালোভাবে চেনে। সে মুখ, সে চোখ, কথা বলার সে ভঙ্গী—না না, এ আরতী না হয়েই যায় না।

বনহুর তখন আরতীকে বিশ্রাম করতে বলে পাশের কক্ষে চলে যায়।

❑

আরতীকে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই রাজী করাতে পারে না বনহুর। তার বাবা অভয়কর বিশ্বাস নয়—এ কথাই সে বারবার বলে চলে।

বনহুর একদিন একজন বিজ্ঞ ডাক্তার ডেকে আরতীকে পরীক্ষা করলো, সত্যিকার কোনোরকম মস্তিষ্ক বিকার ঘটেছে কিনা? কিন্তু ডাক্তার বললেন, আরতীর মস্তিষ্ক স্বাভাবিক আছে, কোনোরকম অসুখ এখন তার নেই।

বনহুর চিন্তিত হলো.....আরতী তাকে চিনতে না পারলেও আরতীকে সে ভালোভাবে চেনে। আরতী মাসুদ ইরানীর পিয়ানোর সুর ভালোবাসতো, কতদিন সে মাসুদ ইরানীর পাশে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিয়েছে। কাজেই আরতী তার অতি পরিচিত জন।

সেদিন রাত্রিতে বনহুর পাশের কামরায় শুয়ে শুয়ে মিস আরতীর কথা ভাবছে। আজ প্রায় সপ্তাহ হতে চললো আরতীকে গঙ্গার বুক থেকে উদ্ধার করে এনেছে। বনহুর ভেবেছিলো, আরতীর জ্ঞান ফিরে এলেই তাকে তার বাসায় পৌঁছে দেবো, কিন্তু যা ভেবেছিলো তা হয়নি। আরতীর জ্ঞান ফিরে আসার পর কিছুতেই স্বীকার করেনি—সে আরতী। হঠাৎ বনহুর শয্যা ত্যাগ করে, ওদিকে রাখা শ্যালনের পিয়ানোর পাশে গিয়ে বসে সে। বনহুর জানে পিয়ানোর সুর আরতীর অতি প্রিয়, বিশেষ করে মাসুদ ইরানীর হাতে। এই আরতীর স্বাভাবিক জ্ঞান ফিরে আনার নিপুণ কৌশল।

বনহুর পিয়ানো বাজাতে শুরু করলো।

অদ্ভুত অপূর্ব সুর!

আরতী কিন্তু যেমন শয্যায় শুয়েছিলো তেমনি শুয়ে রইলো। যদিও সে পিয়ানোর সুরে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু শয্যা ত্যাগ করে ছুটে যায়নি।

বনহুর বার বার তাকাচ্ছিলো দরজার দিকে, এবার হয়তো আরতী ছুটে আসবে তার পাশে। কিন্তু কই সে তো এলো না।

পিয়ানো বাজানো বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো বনহুর! পর্দা ঠেলে প্রবেশ করলো আরতীর কক্ষে। আরতী শয্যায় যেমন শুয়েছিলো তেমনি শুয়ে আছে। বনহুর অবাক হলো....আরতী তার পিয়ানো বাজানো শুনলে কিছুতেই এভাবে শয্যায় শুয়ে থাকতে পারতো না। তবে—কি এ আরতী নয়?.....

বনহুর আরতীর শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালো।

আরতী অবাক হয়ে উঠে বসলো, কারণ আজ এক সপ্তাহের মধ্যে কোনোদিন রাতে এ লোকটি তার কক্ষে প্রবেশ করেনি। আজ হঠাৎ এ গভীর রাতে সে তার কামরায় কি উদ্দেশ্য নিয়ে আগমন করেছে। ভীত হলো সে মনে মনে—তবে কি কোনো কুৎসিৎ অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে!

বনহুর আরতীর দিকে তাকিয়ে বললো—মিস লুসী, আজ আমাকে আপনি সব খুলে বলুন। আমি সব শুনবো। কারণ, আমি এতদিন জানতাম, আপনি আরতী দেবী ছাড়া অন্য কেউ নন, কিন্তু আজ আমার সে ভুল ভেংগে গেছে। বলুন আপনি কে? কি আপনার পরিচয়?

আমি কতদিন বলতে চেয়েছি, আপনি শুনতে চাননি।

আজ বলুন, সব খুলে বলুন মিস লুসী? বনহুর একটা সোফা টেনে বসে পড়লো।

আমি মিস আরতী নই আপনাকে পূর্বেই বলেছি। আমার নাম মিস লুসী ফিগাই। আমার বাড়ি কলকাতায় নয়—দিল্লী শহরে।

দিল্লী!

হাঁ। আমার বাবা ছিলেন দিল্লীর বাঞ্ছারাম হোটেলের মালিক বাঞ্ছারাম ফিগাই।

বনহুর মনের মধ্যে এ নামটা বার দুই উচ্চারণ করে নিলো তারপর বললো—বলুন? সব বলুন আপনি?

আমি কোনোদিন কলকাতায় আসিনি। আমার বাবার এক বন্ধু কলকাতায় থাকেন। তারই সঙ্গে আমি কলকাতায় বেড়াতে আসি। আমার বাবার বন্ধুকে আমি কাকা বলে ডাকি, তিনিও আমাকে মেয়ের মত ভালোবাসতেন। বিশ্বাস করে তাঁর সঙ্গে চলে এসেছি, কিন্তু আমার বাবার বন্ধুর ছেলে আমার উপর অত্যন্ত জঘন্য আচরণ করেছে। সে আমাকে ফুসলিয়ে তার গাড়িতে বেড়ানোর নাম করে নিয়ে এসেছিলো, কিন্তু পরের ঘটনা অত্যন্ত অশোভনীয়....আমি এর বেশি আর বলতে পারবোনা। আমি তার হাত থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য গঙ্গায় লাফিয়ে পড়েছিলাম......একটু নিশ্চুপ থেকে বললো আবার মিস লুসী—আপনি কেন আমাকে বাঁচালেন? আমাকে কেন আপনি বাঁচালেন?

আপনি উত্তেজিত হবেন না মিস লুসী, আমি যা জিজ্ঞাসা করবো সঠিক জবাব দিন?

লুসী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে। লোকটাকে একদিন সে অবিশ্বাস করেছিলো, প্রথমে ভেবেছিলো এ সে লোক যে তার সর্বনাশ করতে চেষ্টা নিয়েছিলো। কিন্তু পরে সে ভুল ভেংগে গিয়েছিলো লুসীর, যখন তার সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। এর মুখে সে ঐ কুৎসিৎ লালসাপূর্ণ ভাব দেখতে পায়নি। এর কণ্ঠে শুনতে পায়নি সে প্রিয়সী সম্বোধন। লুসী আশ্বস্ত হয়েছিলো। বনহুরের আচরণে সে অত্যন্ত খুশী হয়েছিলো, ভাল লেগেছিলো ওকে। বললো লুসী—বলুন!

বনহুর প্রশ্ন করলো—আপনার বাড়ি দিল্লী? আর আপনার বাবা ছিলেন দিল্লী শহরের বাঙ্গারাম হোটেলের মালিক বাঙ্গারাম?

হাঁ।

এখন বাঙ্গারাম জীবিত নেই?

না।

আপনার মা আছেন?

আছেন। তিনিই এ হোটেল দেখাশোনা করেন।

আপনার বাবার বন্ধুর বাড়ি কলকাতা বলেছেন কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে দিল্লী বেড়াতে যান।

না ঠিক বেড়াতে যান না।

তবে?

তিনিও বাঙ্গারাম হোটেলের একজন মালিক। কারণ বাবার হোটেলে তারও শেয়ার আছে।

তাই তিনি হিসাব-নিকাশ নিতে যান আর কি?

হাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন।

আপনি কি তাকে ছোটবেলা হতেই দেখে আসছেন?

ছোটবেলা হতেই তাকে দেখে আসছি।

আচ্ছা মিস লুসী?

বলুন?

আপনার বাবার বন্ধুর নামটা কি এখনও কিন্তু আমাকে আপনি বলেন নি।

আমার বাবার বন্ধুর নাম কালীচরণ ভদ্রে।

আর তার সন্তানের?

ওর নাম ধরতে আমার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে আসে।

তবু বলতে হবে?

ধীরেনচরণ ভদ্রে।

ধীরেনচরণ ভদ্রে?

হাঁ, বড় শয়তান, বড় দুষ্ট সে।

আমি তাকে চিনি মিস লুসী, তার বাবা কালিচরণ ভদ্রের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। কলকাতার ধনী স্বর্ণ ব্যবসায়ী কালীচরণ?

আপনি ঠিক বলেছেন। বাবার বন্ধু তিনিও স্বর্ণ ব্যবসায়ী বটে। কিন্তু তিনি তো প্রকাশ্যে এ ব্যবসা করেন না? আপনি কি করে জানেন এ সংবাদ?

আমার অজানা কিছুই নেই মিস লুসী। আপনার বাবার বন্ধুর বাড়িটাও আমি চিনি—টালীগঞ্জে।

আপনি দেখছি সব জানেন।

হাঁ, আমি চিনি। এখন আপনাকে সচ্ছন্দে আপনার বাবার বন্ধুর কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো।

না না, আমি ওখানে আর যাবো না। আমি ওখানে আর যাবো না.....

তাহলে আপনি কোথায় যাবেন বা যেতে চান?

আমার মায়ের কাছে আমাকে পৌছে দিন।

দিল্লী?

হাঁ, আমাকে দিল্লী রেখে আসুন। আমাকে আপনি বাঁচিয়েছেন, এ কাজটুকু আপনাকে করতেই হবে।

বনহুর তখন ভেবে চলেছে.....কি আশ্চর্য! মিস আরতী আর মিস লুসীর মধ্যে কি অদ্ভুত মিল রয়েছে। কিছুতেই এদের দু'জনকে পৃথক বলে মনে হয় না। মিস আরতী কলকাতায় আর মিস লুসী কোন্ সুদূর দিল্লী শহরে.....

কি ভাবছেন আপনি?

ভাবছি আপনার কথা।

হাঁ, আমাকে উদ্ধার করে আপনি ভুল করেছেন মিঃ আলম। এখন আমার বোঝা আপনাকে অত্যন্ত বিব্রত করে তুলেছে।

না, এ তেমন আর কি। দিল্লী শহরে কোনদিন যাইনি, একবার গেলে শহরটা দেখে আসা যাবে।

বনহুরের কথায় খুশী হলো মিস লুসী, বললো সে—আমাদের হোটেলেই থাকবেন, মা আপনাকে পেলে অনেক খুশী হবেন।

মিস লুসীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করার পর বনহুর নিজ কক্ষে চলে গেলো।

❑

দিল্লী এক্সপ্রেস।

উল্কাবেগে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় শুধু বনহুর আর লুসী।

ওদিকের সিটে মিস লুসী জড়োসড়োভাবে বসে আছে গাড়িতে হেলান দিয়ে। চোখমুখ তার নিতান্ত স্বচ্ছ-স্বাভাবিক নয়। হাজার হলেও সে একটি তরুণী। অজানা-অচেনা এক যুবকের সঙ্গে নির্জন এক ক্যাবিনে তার মনে নানারকম সঙ্কোচ আর দ্বিধার উদয় হচ্ছিলো। মনের ভাব-ধারার কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাচ্ছিলো তার চোখেমুখে।

বনহুর যদিও একটা বইএর মধ্যে ডুবে ছিলো তবুও দৃষ্টি মাঝে মাঝে চলে যাচ্ছিলো মিস লুসীর দিকে। লুসীর অবস্থা মনে মনে বেশ আঁচ করে নিচ্ছিলো সে। কারণ একটা যুবতী একটি যুবকের পাশে নিতান্ত একা— সত্যি বড় অসহায়! হাসি পাচ্ছিলো বনহুরের—লুসী বার বার হাই তুলছে কিন্তু ঘুমানোর সাহস হচ্ছে না তার।

বনহুর বসেছিলো সম্পূর্ণ বিপরীত আসনে। মাঝে প্রচুর জায়গা রয়েছে। বনহুর এবার বইখানা বন্ধ করে রেখে হাতঘড়ির দিকে তাকালো—রাত একটা পঁচিশ। মিস লুসী, আপনি শুয়ে পড়ুন। কথাটা শেষ করে বনহুর নিজে শুয়ে পড়লো হাতের উপর মাথাটা রেখে।

লুসী কিন্তু তবু শুতে পারলো না, বসে বসে হাই তুলছে।

বনহুর শুয়ে পড়লেও সহজে সে ঘুমাতে পারলো না, হাতের আড়ালে সে লুসীকে লক্ষ্য করছে। লুসীর সুন্দর মুখখানা তাকে আকৃষ্ট করছে; তার মধ্যে জেগে উঠেছে পুরুষত্ব মনোভাব। কিন্তু তার স্বভাব নয় দুর্বলের প্রতি অন্যায় আচরণ করা। লুসী এখন একটি পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখির মত অসহায়। তার প্রতি যে কোনো অত্যাচার করলে সে পারবে না এতটুকু বাঁধা দিতে! পারবে না সে চীৎকার করে কাউকে ডাকতে বা লাফিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে। ক্যাবিনের দরজা-জানালা এখন সম্পূর্ণ বন্ধ। একটু পূর্বে মুষলধারে বারিপাত শুরু হয়েছিলো। বৃষ্টির ঝাপটা আসছিলো কামরার ভিতরে, তাই বনহুর বাধ্য হয়ে বন্ধ করে দিয়েছে জানালাগুলো। এখনও বাইরে বৃষ্টি পড়ছে অবিরত।

বনহুর মাথা উঁচু করে বললো—মিস লুসী, আপনি শুয়ে পড়ুন।

মিস লুসী তবু সাহস পাচ্ছিলো না, কি জানি যদি ঘুমিয়ে পড়লে মিঃ আলম তাকে আক্রমণ করে। অজানিত একটা ভয় তার মনকে চঞ্চল করে তুলছিলো।

বনহুর তার মনোভাব বুঝতে পেরে হেসে বললো—মিস লুসী, আপনি যা ভাবছেন তা মিথ্যা। আপনি নিঃসন্দেহে ঘুমাতে পারেন।

এবার লুসী না শুয়ে পারলো না।

বনহুর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লো।

এবার সত্যি ঘুমিয়ে পড়লো লুসী আর বনহুর।

দিল্লী মেল তখন তীর বেগে ছুটে চলেছে।

এক সময় ঘুম ভেংগে গেলো লুসীর। ধড়ফড় উঠে বসলো সে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছে। তাকালো ওদিকে সিটের দিকে। মিঃ আলম অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। সত্যি, ভদ্রলোক অত্যন্ত সৎ এবং মহৎ। শ্রদ্ধায় মিস লুসীর মাথা নুয়ে এলো যেন। এমন পুরুষ সে কমই দেখেছে, তাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় পেয়েও এ যুবকটি কোনো রকম কুৎসিৎ ইঙ্গিত করেনি।

মিস লুসী তাকিয়ে রইলো বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে। এমন-ভাবে মিস লুসী ওকে কোনোদিন দেখেনি। বড় ভালো লাগলো ওকে! সুন্দর বলিষ্ঠ দীপ্তময় একটি ঘুমন্ত মুখ।

কতক্ষণ লুসী তাকিয়ে ছিলো বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে খেয়াল নেই। হঠাৎ দেখলো সে....চলন্ত গাড়িখানার দরজা খুলে গেলো আস্তে করে! একটা গালপাট্টাবাঁধা লোক প্রবেশ করলো গাড়ির মধ্যে। লোকটার হাতে সুতীক্ষ্ণধার একটা ছোরা, ক্যাবিনের আলোতে ঝকঝক করে উঠলো।

মিস লুসী চিৎকার করতে যাবে ঠিক সে মুহূর্তে লোকটা লুসীর মুখ বাম হস্তে চেপে ধরলো। তবু একটা আর্তনাদের ক্ষীণ শব্দ বেরিয়ে এলো লুসীর মুখ থেকে।

ঘুম ভেংগে গেলো বনহুরের। তাকিয়েই উঠে বসলো বিদ্যুৎ গতিতে। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো আগুনের ভাটার মত।

ডাকু তখন মিস লুসীকে চেপে ধরে তার বুকের কাছে সুতীক্ষ্ণধার ছোরাখানা উদ্যত করে ধরেছে।

বনহুর সহসা এগুতে পারলো না, কারণ সে এতোটুকু অগ্রসর হলেই দুর্বৃত্ত লুসীর বুকে ছোরা বসিয়ে দিতে কসুর করবে না।

দাঁতে দাঁত পিষে বনহুর বললো—কোন্ সাহসে তুমি এ কামরায় প্রবেশ করেছো?

ডাকুও তেমনি কঠিন কণ্ঠে জবাব দিলো—এ কামরা শুধু তোমার জন্য নয়। তাছাড়া লুসীকে নিয়ে তুমি কোথায় ভাগছো শুনি?

বনহুর অবাক হলো, ডাকু তা হলে নতুন লোক নয়। সে রীতিমত লুসীকে চেনে। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হলো; বললো সে—লুসীকে তুমি চেনো দেখছি!

শুধু চিনিই না, সে আমার শিকার।

কে তুমি?

হেসে উঠলো ডাকু—হাঃ হাঃ হাঃ আমার পরিচয় জানতে চাও! হুঁ...আমার পরিচয় জানে লুসী।

লুসীর মুখ তখন মরার মুখের মত বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে! চোখেমুখে ভীতি আর উদ্বিগ্নতার চিহ্ন, করুণ চোখে তাকাচ্ছে লুসী বনহুরের মুখের দিকে। লুসী আর্তকণ্ঠে বলে উঠে—ধীরেন, তুমি আবার আমার কাছে এসেছো। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে.....

বনহুর বুঝতে পারে—এই সে ধীরেনচরণ ভদ্রে, যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য লুসী একদিন গঙ্গার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সুযোগের অপেক্ষা করছে বনহুর, কেমন করে লুসীকে ওর কবল থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনবে। এখনও লুসী শয়তানটার হাতের মুঠায়, ওর বুকের কাছে উদ্যত সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

বনহুরের হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ হয়ে উঠেছে। অধর দংশন করে সে। শয়তান ধীরেনচরণ লুসীকে নিয়ে পিছন হটছে।

গাড়ি তখন উদ্দাম গতিতে ছুটে চলেছে। গাড়ির জানালাগুলো সব বন্ধ। শুধু দরজাটা খোলা অবস্থায় রয়েছে। গাড়ি যখন লক্ষ্ণৌ ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলো সে মুহূর্তে শয়তান ধীরেনচরণ গাড়ির পা-দানিতে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে। তারপর গাড়ি যখন ফুল স্পীডে চলতে শুরু করেছিলো তখন সে প্রবেশ করেছিলো গাড়ির মধ্যে।

ধীরেনচরণ যেমন লুসীকে নিয়ে পিছন হটতে গিয়ে আসনে ধাক্কা খেয়েছে, অমনি বনহুর লাফিয়ে পড়ে আক্রমণ করে তাকে। আচম্‌কা আক্রমণে ধীরেন পড়ে যায় গাড়ির মেঝেতে। লুসীও পড়ে যায় তার সঙ্গে। বনহুর লুসীকে এক টানে সরিয়ে দিয়ে বাম হস্তে চেপে ধরে শয়তানটার গলা। আর দক্ষিণ হস্তে ছোরাসহ ধীরেনের দক্ষিণ হস্তখানা এঁটে ধরে।

শুরু হলো ভীষণ ধস্তাধস্তি।

মিস লুসী ওদিকে দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে দারুণ উৎকণ্ঠতার ভাব।

বনহুর নিরস্ত্র আর ধীরেনচরণের হস্তে সুতীক্ষ্ণধার ছোরা।

বনহুর চেষ্টা করছে ওর হাত থেকে ছোরাখানা সরিয়ে নিতে।

সেকি তুমুল লড়াই। দস্যু বনহুর আর ধীরেনচরণ ভদ্রে। চলন্ত ট্রেন উল্কাবেগে ছুটে চলেছে। মেলের প্যাসেঞ্জারগণ নিজ নিজ আসনে নিশ্চিত মনে ঘুমাচ্ছে, কেউ জানে না তাদেরই ট্রেনের একটি কামড়ায় এতো কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে!

মিস লুসী এগুতে চেষ্টা করছে.....গাড়ির চেইন টানবে, কিন্তু ওদিকে যাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

ধীরেনচরণ যতই শক্তিমান হোক,দস্যু বনহুরের সঙ্গে পেরে উঠা মুস্কিল।

ধীরেন অল্পক্ষণেই কাবু হয়ে পড়লো। তার হাতের ছোরাখানা ছিটকে পড়েছে দূরে। এবার সে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বনহুরের এক একটা ঘুষি এসে পড়ছে ধীরেনচরণের নাকের উপর। এবার সে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দিল্লী এক্সপ্রেস যখন লক্ষ্ণৌ ব্রীজ অতিক্রম করছিলো। ধীরেন হঠাৎ বনহুরের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে লাফিয়ে পড়লো ব্রীজের নীচে যমুনাবক্ষে।

বনহুর ট্রেনের দরজায় ঝুকে তাকালো নীচের দিকে। গাঢ় অন্ধকারে কিছু দেখা গেলো না। ট্রেন তখন ব্রীজ অতিক্রম করে ছুটে চলেছে।

দরজা বন্ধ করে ফিরে এলো বনহুর মিস লুসীর পাশে। পাশের আসনে ছিটকে পড়া ধীরেনের হস্তের ছোরাখানা হাতে তুলে নিয়ে একবার ছোরাখানা লক্ষ্য করে ছুড়ে ফেলে দিলো জানালা দিয়ে বাইরে।

লুসীর দু'চোখে বিস্ময়! নির্বাক দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে সে বনহুরের বলিষ্ঠ দীপ্ত ঘর্মাক্ত মুখমণ্ডলের দিকে। হঠাৎ লুসীর দৃষ্টি চলে যায়, দেখতে পায় বনহুরের দক্ষিণ বাহুর একটি জায়গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। হয়তো ধীরেনচরণের ছোরার সামান্য একটু আঁচড় লেগেছিলো।

লুসী ব্যস্ত কণ্ঠে বলে উঠে—ইস্ কি সর্বনাশ, আপনার হাত কেটে রক্ত পড়ছে!

লুসীর কথায় বনহুর ফিরে তাকায় নিজের বাহুর দিকে। এতোক্ষণ সে খেয়ালই করেনি, তার বাহু কেটে রক্ত পড়ছে।

তাড়াতাড়ি লুসী বনহুরের ক্ষতটা চেপে ধরে। তারপর নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে দিতে থাকে যত্ন করে। বলে সে—আমার জন্য আপনাকে এতো কষ্ট ভোগ করতে হলো মিঃ আলম!

বনহুর পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে বলে—এমন কিছু হয়নি মিস লুসী, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

সত্যি আপনার মত মহৎজন আমি এর পূর্বে দেখিনি। আপনি মহান ব্যক্তি।

অত্যন্ত বাড়িয়ে বলেছেন মিস লুসী।

না, আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

যতক্ষণ না আপনাকে আপনার মায়ের কাছে পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।

মিঃ আলম।

বলুন মিস লুসী?

না থাক, আজ নয় পরে বলবো।

বেশ তাই বলবেন।

লুসী বনহুরের হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। অপূর্ব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে লুসী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুরও চট করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না।

লুসী বলে—মিঃ আলম, আপনি কি আমাকে মায়ের কাছে পৌছে দিয়েই চলে আসবেন?

না, আমি কয়েকদিন দিল্লীতে অপেক্ষা করবো, কারণ এ শহরটি আমি দেখিনি।

আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো লুসীর চোখ দুটো, বললো সে—তাহলে আমাদের হোটেলেই থাকছেন তো?

সেকথা এখনও সঠিক বলতে পারি না মিস লুসী।

কেন? আমাদের হোটেলে থাকাটা আপনার কাছে কি কষ্টকর হবে?

ঠিক তা বলছি না, তবে কখন কোথায় থাকবো বলে উঠতে পারছি না কিনা।

না, আপনাকে আমাদের ওখানেই থাকতে হবে।

বেশ, চেষ্টা করে দেখবো।

চেষ্টা নয়—থাকতেই হবে। মিস লুসী এতক্ষণে যেন অনেকটা সচ্ছ হয়ে এসেছে। বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে সে। একান্ত আপন জন বলে ওকে মনে হয় ওর।

বনহুর সিগারেট বের করে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে। একরাশ ধুম্র নির্গত করে বলে—মিস লুসী, আপনার আর আমার মধ্যে পরিচয় অতি অস্বাভাবিক। কিন্তু আপনার মধ্যে যে একটি রূপ আমি দেখেছি, সো অতি আশ্চর্য।

কি রকম? প্রশ্ন করলো লুসী।

বললো বনহুর—ঠিক আপনার মতই আর একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিলো।

অবাক হয়ে শুনতে থাকে লুসী!

বনহুর বলে—আমি প্রথমে তাকেই মনে করেছিলাম। কারণ আপনার আর তার মধ্যে অদ্ভুত মিল রয়েছে।

এবার বুঝেছি—তারই নাম বুঝি মিস আরতী।

হাঁ, সে মেয়েটির নাম মিস আরতী।

আপনার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ মিঃ আলম?

আমার পিয়ানোভক্ত সে।

ও। ছোট্ট একটা শব্দ করলো লুসী।

বনহুর আর লুসী এরপর আর দু'চোখ বন্ধ করলো না। লুসী এবার বনহুরের পাশ থেকে সরে পরের আসনেও গেলো না। ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে রইলো।

লুসীর চোখেমুখে তখনও ভয়ের আভাস।

কথার ফাঁকে বার বার তাকাচ্ছে সে গাড়ির দরজার দিকে।

বনহুর অভয় দিলে বললো—এবার নিশ্চিন্ত থাকুন মিস লুসী, আর সে আসবে না।

❑

দিল্লী ষ্টেশন।

দিল্লী এক্সপ্রেস এসে থামলো।

গাড়ি থামতেই বনহুর আর মিস লুসী নেমে পড়লো। লুসীর চোখেমুখে আনন্দোচ্ছ্বাস—আবার সে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে তার মাতৃভূমিতে।

ট্রেন থেকে নামবার পূর্বেই বনহুর তার কালো চশমাটা পরে নিয়েছিলো। বনহুরের হাতে শুধুমাত্র একটি সুটকেস।

দিল্লী ষ্টেশনে বনহুরের এ প্রথম পদক্ষেপ। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অগ্রসর হলো বনহুর আর মিস লুসী।

সামনে এগুতেই কতগুলো শিখ ড্রাইভার বনহুর আর লুসীকে ঘিরে ধরলো—ট্যাক্সি চাইএ বাবু সাব? ট্যাক্সি চাইএ?

অমনি ঘিরে ধরলো কয়েকজন টাংঙ্গীওয়ালা—টাংঙ্গী লিয়ে বাবুজী? টাংঙ্গী লিয়ে.....টাংঙ্গী লিয়ে? বহুৎ জোরদার ঘোড়েওয়ালা টাংঙ্গী....

যদিও ভোর হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, লাইটগুলো তখনও দপ দপ করে জ্বলছে। কুলি আর টাংঙ্গীওয়ালাদের চীৎকার আর হাঁকাহাঁকিতে সরগরম হয়ে উঠেছে দিল্লী ষ্টেশন।

এখানের কুলি, খালাসী সবাই দিল্লীর অধিবাসী, তাদের চেহারা দেখলেই তা বোঝা যায়। দোহারা লম্বা, গায়ের রঙ লালচে-তামাটে, মাথার চুল সামান্য কটা এবং খুব ছোট করে ছাটা। চোখগুলো একটু ঘোলাটে ধরণের। পরনে ঢিলা পাজামা আর হাঁটু অবধি লম্বা ঝুল জামা। মাথায় মস্ত বড় পাগড়ী রয়েছে। কারো কারো মুখে দাঁড়ি আছে, কারো শুধু গোঁফ। কতকটা পাঞ্জাবী দেশের লোকের মত চেহারা এদের।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করে অবাক হলো বনহুর। এদেশের ভিখারীদের ভিক্ষে করার ভঙ্গী দেখে। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা—ওরা হাত দিয়ে থোত্‌নায় আঘাত করে একরকম অদ্ভুত শব্দ করছে—হেঁ কুঁ, হেঁ কু, হুঁয়া হুঁয়া, বাবু পয়সা দে, বাবু পয়সা দে....কেউ কেউ উচ্চারণ করছে—বাবু তোর লাথি খাই একটা পয়সা দে.....

এ সব অদ্ভুত উক্তি শুনে হাসি পেলো বনহুরের। ভিখারী বাচ্চাগুলো একেবারে জোঁকের মত পিছু লাগলো। বনহুর এদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য দ্রুত পা চালালো। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা, পয়সা না নিয়ে ছাড়বে না। যদিও বনহুরের ইচ্ছা ছিলো আরও কিছুটা অগ্রসর হয়ে তবে ট্যাক্সি নেবে কিন্তু তা হলো না। অগত্যা একটা ট্যাক্সি সামনে দেখে এগুলো। তখনও পিছনে গুটিকয়েক ট্যাক্সিচালক আর টাংঙ্গীওয়ালা ঘিরে রয়েছে। ভিখারী বাচ্চাদল তো আছেই! বনহুর প্রত্যেকের হাতে কিছু পয়সা গুঁজে দিয়ে ট্যাক্সিতে চেপে বসলো।

এতক্ষণে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো বনহুর।

লুসীও পাশে বসেছে।

শিখ ড্রাইভার বললো—কাঁহা যাইয়ে বাবুসাব?

লুসীই বললো—মোগলাই রোড়ে বাঞ্ছারাম হোটেল।

বহুৎ আচ্ছে। বলে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো শিখ ড্রাইভার।

বনহুর তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। দিল্লী নগরী কেন্দ্রস্থল অতিক্রম করে ট্যাক্সি তখন ছুটে চলেছে। পথের দু'ধারে সুউচ্চ অট্টালিকা আর মনোরম দোকানপাট। ট্রাম, বাস আর ট্যাক্সিগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে নিজ নিজ পথে এগিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে দোতলা বাসগুলো একটির পর একটি চলেছে, যেন ছোট ছোট পিপীলিকার মাঝে এক একটি ডেঁয়ে পিঁপড়ে। সত্যি বড় সুন্দর লাগছে বনহুরের কাছে এ দিল্লী শহরটি।

আরও একটা জিনিস বনহুরকে অবাক করলো—অসংখ্যা গাড়ি আর যানবাহনের মধ্যে উটের গাড়িগুলো। ঠিক এক্কা গাড়ির মত দেখতে; কতকটা টাঙ্গার মত মনে হয়। উটগুলো তো আর ঘোড়ার মত ছুটতে পারে না, আস্তে মনে হলেও বেশ দ্রুত পা চালিয়ে যাচ্ছিলো।

প্রশস্ত পথ।

পথে অসংখ্য যানবাহনের ভীড় থাকলেও তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছিলোনা। বনহুর আর লুসীর গাড়ি এক সময় মোগলাই রোডে বাঞ্ছারাম হোটেলের সম্মুখে এসে থামলো।

দিল্লী শহরের প্রায় এক প্রান্তে এ হোটেল। মোগলাই রোড হয়ে কিছুটা অগ্রসর হলেই আগ্রা যাওয়ার বড় পথ। বাঞ্ছারাম হোটেল খুব বড় এবং সেকেলে ধরনের। অতি পুরানো হোটেল। নীচে হোটেল আর উপর তলায় থাকে মিস লুসীর মা বাঞ্ছারাম পত্নী মিসেস বাঞ্ছারাম।

বনহুর আর লুসীর গাড়ি থেকে নেমে পড়লো।

বনহুর ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিলো। লুসী পথ দেখিয়ে অগ্রসর হলো।

পিছনে অনুসরণ করলো বনহুর।

দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো লুসী আর বনহুর। মহানগরী দিল্লীর বুকে এমন ফাটল-ধরা জিরজিরে অট্টালিকা কেমন যেন বেখাপ্পা লাগছিলো বনহুরের কাছে।

চুন-বালি খসে পড়া, ইটগুলো কঙ্কালের দাঁতের মত হিস হিস করছে যেন। কালি আর ঝুলগুলোও ঝাড়া হয়নি যেন কতকাল। একটা দরজার সামনের এসে দাঁড়ালো, লুসী বললো—এটা আমার মায়ের ঘর।

বনহুর কোনো কথা বললো না। সে আশ্চর্য হয়েছে—লুসী যে তাকে নিয়ে হোটেলের সিড়ি বেয়ে এতোদূর এলো, তবু একটি লোক সে দেখতে পেলো না।

লুসী দরজার পুরোন পর্দাটা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো। বনহুর তাকে অনুসরণ করলো। ভিতরে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালো বনহুর। বিস্ময়ে থ' মেরে গেলো সে!

একটি জমকালো পাহাড় যেন বসে আছে একটা চৌকির উপর। লুসী ততক্ষণে ছুটে গিয়ে জমকালো পাহাড়টার বুকে ঝাপিয়ে পড়েছে—মা—মাগো!

জমকালো পাহাড়টা আদতে মানুষ, এবং একটি মহিলা। মাঝারী একটি চৌকির উপর জেঁকে বসে আছে মহিলাটি। সম্মুখে মস্ত বড় একটা পানের বাটা, বাংলাদেশের পানের বাটার মত নয়। ঠিক একটা পিতলের ডেক্‌চির মত।

লুসীকে মহিলাটির বুকের মধ্যে একটি ছোট্ট পুতুলের মত মনে হলো।

কিন্তু আশ্চর্য, লুসীর মা মিসেস বাঞ্ছারাম কন্যাকে দেখে কিছুমাত্র খুশী হয়েছে বলে মনে হলো না। লুসী মায়ের মুখে বারকয়েক চুমু দিয়ে বললো—মা, জানো ইনি কে?

জমকালো মিসেস বাঞ্ছারাম তার গোলাকার প্যাটপ্যাটে চোখ দুটো তুলে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে, তারপর বললো—এ-ই বুঝি তোকে উদ্ধার করে এনেছে?

হাঁ মা, ইনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। সত্যি ইনি না থাকলে আমাকে আর ফিরে পেতে না।

মিসেস বাঞ্ছারাম যখন কথা বলছিলো, তখন মনে হচ্ছিলো বাংলা বলা ঠিকমত অভ্যাস নেই তার। বেশ একটু থিতিয়ে থিতিয়ে বললো—ভালো কথা। যাও লুসী ওকে থাকবার ঘর দেখিয়ে দাও।

একটা ধন্যবাদ বা সহানুভূতিসূচক কোন কথাই উচ্চারণ করলো না মিসেস বাঞ্ছারাম। কন্যাকে ফিরে পেয়ে এতোটুকু খুশী হয়েছে বলে মনে হলো না।

লুসী বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—আসুন আমার সঙ্গে।

বনহুর নীরবে অনুসরণ করলো লুসীকে।

ওদিকের কামরায় লুসী প্রবেশ করে ডাকলো—আসুন।

বনহুর পাশের কামরায় প্রবেশ করতে গিয়ে একবার ফিরে তাকালো নিজের অজ্ঞাতে মিসেস বাঞ্ছারামের দিকে। বনহুর তাকাতেই দেখলো মিসেস বাঞ্ছারাম কেমন যেন অগ্নিদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাড়াতাড়ি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে পাশের কামরায় প্রবেশ করলো বনহুর।

মিস লুসী তখন পাশের কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বনহুর লুসীর পাশে এসে দাঁড়ালো। সব যেন কেমন রহস্যময় বলে মনে হলো তার কাছে। মিস লুসীকে গঙ্গার বুক হতে উদ্ধার থেকে হোটেল বাঞ্ছারাম পর্যন্ত ঘটনাটি বিদ্যুৎগতিতে মাথায় খেলে গেলো একবার।

মিস লুসী বললো—আপনি এ কক্ষে থাকবেন। এ কক্ষটা আমাদের নিজস্ব গেষ্টদের থাকবার জন্য।

বনহুর একবার কক্ষমধ্যে তাকিয়ে দেখে নিলো। দোতলায় এ কামরাটা খুব ছোট নয়। বাইরের মত ভিতরেও চুন-বালি খসা। ইটগুলো দাঁত বের করে হাসছে। ওদিকে দুটো জানালা। জানালার শিকগুলো সেকেলে, জং ধরে জিরজিরে হয়ে গেছে। কক্ষটা পুরোন হলেও ভিতরের আসবাবগুলো বেশ মূল্যবান এবং আধুনিক। এক পাশে একটা খাট—শাল কিংবা মেহগনি কাঠের তৈরি হবে। খাটে দুগ্ধফেননিভ শয্যা পাতা রয়েছে। মেঝেতে পুরু কার্পেট, কয়েকখানা সোফাসেট বেশ রুচিমত সাজানো আছে।

লুসী সুইচ টিপে ফ্যান চালু করে দিলো। বললো সে—আপনি বিশ্রাম করুন। আমি খাবার আনছি।

বনহুরকে কোনো কথা বলার সময় না দিয়ে বেরিয়ে গেলো লুসী। খুশীতে আজ সে উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

বনহুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো, তারপর একটা সোফায় বসে সিগারেট কেস্ বের করে একটা সিগারেট ধরালো। ধূম্র পান করতে করতে কক্ষমধ্যে নিপুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো! হঠাৎ বনহুর দেখলো.....তার পায়ের নীচে কার্পেটখানায় এক জায়গায় খানিকটা জমাট রক্ত লেগে আছে। কিন্তু রক্তটা বেশ করে মুছে তুলে ফেলা হয়েছে। লাল কার্পেট—রক্তের দাগ চট্ করে কেউ ধরতে পারবে না। রক্তটা শুকিয়ে কালো হয়ে উঠেছে।

বনহুর উবু হয়ে রক্তের দাগটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখছিলো এমন সময় দরজায় পদশব্দ শুনে সজাগ হয়ে বসে সে।

ট্রের উপরে খাবার নিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে মিস লুসী। বনহুরকে সোফায় বসে থাকতে দেখে বলে—আপনি এতোক্ষণ জামা-কাপড় ত্যাগ করেননি মিঃ আলম?

ও, সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। বনহুর হস্তস্থিত অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে উঠে দাঁড়ায়।

মিস লুসী টেবিলে খাবারগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বলে—চট করে ফিরে আসবেন কিন্তু বাথরুম থেকে।

বনহুর জামাটা খুলে আলনায় রেখে বাথরুমে প্রবেশ করলো।

পুরোন হলেও বেশ রুচিপূর্ণ বাথরুম।

বনহুর ঠাণ্ডা পানিতে বেশ করে চোখমুখ ধুয়ে নিলো, মন থেকে হিজিবিজি চিন্তাধারা মুছে ফেলতে চেষ্ট করলো, বিশেষ করে তখনকার মত।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখলো, মিস লুসী টেবিলে তার খাবার সাজিয়ে নিয়ে বাংলার বধুর মত গালে হাত দিয়ে নিশ্চুপ বসে আছে। ফ্যানের হাওয়ায় চুলগুলো উড়ছে।

বনহুর এসে বসলো টেবিলে পাশের চেয়ারে।

মিস লুসী পাকা গৃহিণীর মত বললো-খিদেয় খুব কষ্ট পেয়েছেন। নিন, চট্পট খেয়ে নিন এবার। প্লেটে খাবার উঠিয়ে দিচ্ছিলো লুসী।

বনহুর খেতে বসলো সুবোধ বালকের মত, ক্ষুধাও পেয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু খাবারগুলো যেন কণ্ঠ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিলো। বনহুরের দৃষ্টি নিজের অজ্ঞাতে মেঝের কার্পেটে চলে যাচ্ছিলো। ওখানে নিশ্চয়ই কোনো নরহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তার বুকের রক্ত কার্পেটখানাকে সিক্ত করে তুলেছিলো এক সময়। কিন্তু সে সে ব্যক্তি ছিলো, কেনই বা তাকে হত্যা করা হয়েছিলো.....এমনি নানা চিন্তায় বনহুর আনমনা হয়ে পড়েছিলো।

মিস লুসী বললো—মিঃ আলম, খাবারগুলো বুঝি খুব খারাপ লাগছে?

বনহুরের এতোক্ষণ তেমনভাবে কোনো খেয়ালই হয়নি—খাবারগুলো শুধু গলাধঃকরণ করেই চলেছিলো, কেমন লাগছে খেতে তা তো লক্ষ্য করেনি। এবার বলে উঠলো—চমৎকার হয়েছে!

তবে খাচ্ছেন না কেন?

এই তো অনেক খেয়ে ফেলেছি।

মিঃ আলম, আমার মা কিন্তু বড্ড খামখেয়ালী। তাকে আপনার কেমন লাগলো?

এ্যা কি বললেন?

আমার মাকে আপনার কেমন লাগলো?

বনহুর মুখের খাবারটুকু গিলে বললো—অত্যন্ত মধুর।

কি বললেন?

মানে, বেশ লোক কিন্তু উনি।

মাকে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন না, না তার ভিতরটা কেমন উনি খুব ভাল মানুষ।

আমি সো বুঝতে পেরেছি মিস লুসী যখন তাকে প্রথম দেখেছি।

এ-কথা সে-কথার মধ্যে খাওয়া-পর্ব শেষ হয়।

তখনকার মত শয্যায় দেহটা এলিয়ে দেয়ে সে।

মিস লুসী বেরিয়ে যায়।

বনহুর বাইরে বের হবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছিলো, এমন সময় লুসী এসে দাঁড়ায় তার পাশে, হেসে বলে—বাইরে যাবেন বুঝি?

বনহুর টাইটা ঠিক করতে করতে বলে—হাঁ, দিল্লী শহরটা একবার পরিভ্রমণ করে আসি।

মিঃ আলম, আমিও যাবো আপনার সঙ্গে।

চলুন।

অবশ্য আপনার কোনো অসুবিধা হলে.....

না না, আপনি গেলে আমার ভালোই হবে, কারণ এখানের পথঘাট আমার কিছু চেনা নেই।

মিস লুসী সহ বনহুর বেরিয়ে পড়লো।

বনহুর আর লুসী যখন গাড়িতে উঠে বসেছিলো তখন হঠাৎ বনহুরের দৃষ্টি চলে গেলো হোটেলের দ্বিতলের বেলকুনিতে। একখানা হেড়ে মুখ আলগোছে সরে গেলো যেন আড়ালে। বনহুর বুঝতে পারলো—ও মুখখানা অন্য কারো নয়, মিসেস বাঞ্ছারামের।

ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

দিল্লীর চৌরঙ্গীর মোড়ে এসে বললো বনহুর—মিস লুসী, ট্যাক্সি ছেড়ে, চলুন টাংঙ্গী গাড়িতে যাওয়া যাক। সবদিক ভালোভাবে দেখতে পাওয়া যাবে।

তাই হলো। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে একটা টাংঙ্গী ধরে উঠে বসলো বনহুর আর মিস লুসী। প্রথমে বনহুর আগ্রার পথে রওয়ানা দিলো। তাজমহলের অনেক নাম শুনেছে সে কিন্তু আজও দেখবার সৌভাগ্য হয়নি।

টাংঙ্গী আগ্রার পথে অগ্রসর হলো।

শহর ছেড়ে সোজা একটা পথ চলে গেছে আগ্রার দিকে। পথের দু'ধারে ধূসর প্রান্তর, মাঝে মাঝে নানারকম বৃক্ষ-লতা-গুল্মের ঝাড় আর সবুজ বনানী। পথের দু'পাশ দিয়ে সারিবদ্ধ শাল আর সেগুন গাছ।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো—পথের পাশের গাছপালার মধ্যে অসংখ্য ময়ূর আর ময়ূরী পেখম তুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাংঙ্গীর শব্দে সরে যাচ্ছিলো কোনোটা বা ফিরে দেখছিলো টাংঙ্গীর দিকে। ময়ূরপাখি ছাড়াও কাকাতুয়া আর ময়নার ঝাক এ-গাছ থেকে ও-গাছে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

মুগ্ধ নয়নে বনহুর এ সব দৃশ্য দেখছিলো।

লুসী এসব জায়গার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। সে সব বুঝিয়ে বলে দিচ্ছিলো। এ সব অঞ্চলের আবহাওয়া অত্যন্ত শুষ্ক। একটা উষ্ণতা অনুভব করছিলো বনহুর নিজের দেহে। আকাশ সচ্ছ নির্মল। কোথাও মেঘের খণ্ড ভেসে নেই। বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে।

বনহুরের টাংঙ্গীর পাশ কেটে চলে যাচ্ছে কতরকম যানবাহন। বেশির ভাগ ট্যাক্সি আর উটের গাড়ি। কচিৎ দু'চারটে বড় বাস চলে যাচ্ছে দিল্লী থেকে আগ্রার দিকে। লুসী বললো—এ রাস্তা ছাড়াও আগ্রা যাওয়ার আর একটি পথ আছে। সে পথটি অত্যন্ত জনাকীর্ণ এবং যানবাহন পরিপূর্ণ।

কিন্তু আমার পক্ষে এ পথটাই বেশি শ্রেয়ঃ।

আপনি দেখছি নির্জনতা বেশি পছন্দ করেন।

হাঁ মিস লুসী আমি তাই চাই।

আচ্ছা মিঃ আলম, প্রথমে তাজমহল দেখতেই যাবেন মনস্থ করেছেন। না অন্য কোথাও?

না, অন্য কোনো জায়গা দর্শনের পূর্বে আমি আগ্রার তাজমহল দেখাই মনস্থ করেছি।

এ-কথা সে-কথার মধ্যে এক সময় বনহুর আর লুসী এসে পৌঁছে গেলো আগ্রায়। বেশ কিছু দূরে থাকতেই তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য বনহুরের দৃষ্টি

গোচর হলো। নীল আকাশের বুকে যেন শিল্পীর তুলি দিয়ে আঁকা একটি ছবি।

তাজের বড় গেটটার সম্মুখে এসে টাংগী থাকলো।

নেমে দাঁড়ালো বনহুর আর মিস লুসী।

গেটের মুখেই কতগুলো ফেরিওয়ালা শ্বেত পাথরের ছোট-বড় তাজমহল আর নানারকম পাথরের খেলনা নিয়ে বিক্রি করছে। কাঠের পুতুল আর মোমের পুতুলগুলো বড় সুন্দর—মনোরম! বিশেষ করে বনহুর একটা তাজমহল তুলে নিলো হাতে, অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে।

লুসী হেসে বললো—সত্যিকারের তাজমহলের কাছে এসে নকল তাজমহল নিয়ে মাতলেন দেখছি।

বনহুর একটু লজ্জিত হলো, ফেরিওয়ালার হাতে ছোট্ট তাজমহলটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো—রেখে দাও, ফেরার পথে নেবো।

লুসী আর বনহুর গেট পার হয়ে ভিতরে প্রবেশ করলো।

অপূর্ব সে দৃশ্য!

বনহুর কিছুক্ষণ নির্বাক স্থির নয়নে তাকিয়ে রইলো। সেখান হতে তাজের সম্পূর্ণ অংশটা দেখা যাচ্ছে। শুভ্র বলাকার মত ধবধবে সাদা মর্মরে গাঁথা তাজমহল। বনহুর কবি নয়, না হলে সে এ মুহূর্তে একটি সুন্দর কবিতা সৃষ্টি করতে পারতো। মখমলের গালিচার মত সবুজ দূর্বার চাদর বিছানো, মাঝখানে ফোয়ারার সারি। দু'পাশ কাঁচি-ছাটা পাইন গাছ। ফোয়ারার দু'পাশ দিয়ে দুটো পথ সোজা চলে গেছে তাজের দিকে! দক্ষিণ দিকের পথ দিয়ে অগ্রসর হলো লুসী আর বনহুর। কারণ এ পথেই দর্শকগণ এগিয়ে চলেছে। আর যারা ফিরে আসছে তারা বাম দিকের পথ ধরে আসছে।

বনহুর আর লুসী অগ্রসর হলো তজমহলের দিকে।

তাজের নিকটে পৌছতেই আরও অবাক হলো বনহুর। একটি লোক সকলের পা থেকে জুতো খুলে নিচ্ছে, আর যাদের মাথায় কোনোরকম সাহেবী টুপী রয়েছে সেগুলোও খুলে রাখছে সে। লোকটির সম্মুখে জুতো আর টুপি স্তূপাকার হয়ে উঠেছে। কয়েকটি লোক সারিবদ্ধভাবে জুতো ত্যাগ করার পর বনহুর আর লুসী গিয়ে দাঁড়ালো।

খাদেম লোকটা বনহুরের জুতো খুলে নিয়ে তাদের এক রকম সাদা কাপড়ের জুতো পরতে দিলো।

বনহুর আর লুসী কাপড়ের জুতো পরে নিয়ে এগুলো। অপূর্ব সুন্দর এ তাজমহল! শ্বেত পাথরে তৈরি তাজের গায়ে শুধু পবিত্র কোরানের আয়াত লেখা রয়েছে। তাজের কারুকার্য-নৈপুণ্য বনহুরের চোখে যেন তাক লাগিয়ে দিলো। না জানি কোন্ আলেম-শিল্পীর নিপুণ তুলির আঁচড়ে খোদাই করা হয়েছে এ আরবী অক্ষরগুলো।

তাজের চারপাশে চারটি মিনার। বনহুর লুসীসহ একটি মিনারে উঠে গেলো! অবশ্য তাকে এখানে খাদেমের হাতে কিছু বখ্শীস দিতে হলো।

মিনারের ভিতরে সিঁড়িগুলো বেশ চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে উপরের দিকে উঠে গেছে। প্রত্যেকটা সিঁড়ির বাঁকে একটি জানালা। ভিতরে আলোর কোন ব্যবস্থা নেই। এসব জানালাপথে পৃথিবীর আলো-বাতাস প্রবেশ করে মিনারের ভিতরটা উজ্জ্বল করে তোলে।

লুসী আর বনহুর মিনারের একেবারে শেষ অবধি উঠে গেলো। উপর থেকে জানালাপথে নীচে তাকালো বনহুর। নীচের লোকজনদের একেবারে ছোট্ট ঠিক লিলিপুটের মত মনে হলো।

কিন্তু নামবার সময় হলো মজাটা।

লুসী এতগুলো সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে উঠতে বেশ হাঁপিয়ে পড়েছিলো, নামবার সময় অত্যন্ত হাঁপাচ্ছিলো সে।

বনহুর বললো মিস লুসী, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তবে আমার হাত ধরে নেমে চলুন।

লুসী যেন এতোক্ষণে আশ্বস্ত হলো। বনহুরের হাতের উপর হাত রাখলো।

বনহুর আর লুসী নীচে নামতে লাগলো।

লুসীর কোমল উষ্ণ হাতখানা বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠায় ঘেমে ভিজে উঠেছে। বনহুর নিজের মধ্যে একটা অনুভূতি উপলব্ধি করলো যেন। কেমন যেন একটা আলোড়ন তার ধমনীর রক্তকে চঞ্চল করে তুললো। লুসীর দেহের সেন্টের সুমিষ্ট একটা গন্ধ তাকে মোহগ্রস্ত করে ফেললো! বনহুর লুসীকে আকর্ষণ করলো নিজের দিকে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলো সে, লুসীর হাত ধরে দ্রুত নেমে এলো নীচে।

লুসী বনহুরের আচরণে.অবাক হলো, কিন্তু সে কোনোরকম উক্তি প্রকাশ করলে না।

মিনার থেকে বেরিয়ে এলো ওরা দু'জনা।

তাজমহলের অপরূপ দৃশ্য প্রাণভরে উপভোগ করতে লাগলো বনহুর আর লুসী। যদিও লুসী ইতিপূর্বে আরো কয়েকবার তাজমহল দেখবার সুযোগ লাভ করেছে, তবু আজ নতুন করে যেন দেখছে সে তাজের সৌন্দর্য।

তাজমহলের পিছনে এসে দাঁড়ালো ওরা।

যমুনা.....তার উপরে যেন ভাসছে তাজমহল।

স্নিগ্ধ-শীতল বাতাস বইছে। যমুনার বুকে পালতোলা নৌকাগুলো মন্থর গতিতে হেলেদুলে এগিয়ে চলেছে কোন্ অজানার পথে।

বনহুর নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। তাজের তুষারধবল ছায়া ভাসছে যমুনার বুকে, কেমন যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে তাজের প্রতিবিম্বটা।

কতক্ষণ বনহুর তাকিয়েছিলো হয়তো তার মনের মধ্যে মমতাজের মুখখানাই উদয় হচ্ছে; তার পাশে আর একটি মুখ-সে হলো সম্রাট শাহজাহান!

লুসীর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর—বেলা শেষ হয়ে এলো, চলুন আজকের মত ফেরা যাক।

বনহুর ফিরে দাঁড়ায়-চলো। পরক্ষণেই বলে সে—মাফ করবেন, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

না না, আপনি এখন থেকে আমাকে 'তুমি'ই বলবেন। কারণ আমার চেয়ে আপনি অনেক বড়।

একটু হাসলো বনহুর।

তাজমহলের খাদেমকে বলে বনহুর আর লুসী তাজের ভিতরে প্রবেশ করলো। বাইরের মত ভিতরটাও কারুকার্যখচিত। শ্বেত পাথরের গায়ে শিল্পীর নিপুণ হস্তের ছোঁয়ায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে কোরআনের বাণীগুলো।

মেঝেতে পাশাপাশি দুটো কবর। মূল্যবান গেলাপে ঢাকা রয়েছে কবর দুটো। ভিতরে প্রবেশ করতেই সুমিষ্ট একটা গন্ধ বনহুর আর লুসীকে সাদর সম্ভাষণ জানালো! চন্দন আর লোবানের সুমিষ্ট গন্ধ এ! হৃদয়ে যেন একটা অনুভূতি অনুভব করলো ওরা। বাদশাহ আজ ঘুমিয়ে পড়েছে, পাশে তার ঘুমন্ত মহিষী। কেমন একটা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে স্থানটিতে।

বনহুরের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এলো নিজের অজ্ঞাতে। মনের কোণে উদয় হলো একটি মুখ—সে ঐ নূরী। না জানি নূরীর মৃতদেহ আজ কোথায় মিশে গেছে.....

খাদেম জানালো তাদের এবার বেরিয়ে যেতে হবে।

বনহুর আর লুসী বেরিয়ে এলো তাজমহলের ভিতর থেকে। লুসী বললো—এখানে কারো প্রবেশ নিষেধ কি-না, তাই খাদেম আমাদের বেশিক্ষণ থাকবার জন্য অনুমতি দিলেন না।

তাজমহল থেকে বিদায় নিয়ে বনহুর আর লুসী রওয়ানা দিলো সেকেন্দ্রা অভিমুখে। সেখানে নিশ্চিন্তে নিদ্রিত রয়েছেন দিল্লীর সম্রাট আকবর বাদশাহ্।

সেকেন্দ্রায় পৌঁছেতেই বনহুর অবাক হয়ে দেখলো সেকেন্দ্রা গ্রেট। দূর থেকেই লালে লাল মনে হচ্ছিলো, কে যেন আবির ঢেলে দিয়েছে। বেলাশেষের সূর্যের রশ্মিতে রক্তাক্ত মনে হচ্ছিলো সব!

আকবরের সমাধিসৌধ দেখার পর বনহুর আর লুসী অন্দরমহলে চললো। সেকি সুন্দরভাবে তৈরি রাজপ্রাসাদ! দিল্লীর সম্রাট আকবরের বেগম মহল। পাশাপাশি সারি সারি কক্ষ। বেগম মহলের পাশেই চুরি মহল। এখানে আকবরের বেগমগণ চুরি পরতেন। এবার বনহুর আর লুসী চললো আরও ভিতরে, আকবরের হিন্দু বেগম মহলে।

বেশ সুন্দরভাবে তৈরি এ অন্দরমহলটা।

এখানে আকবরের হিন্দু বেগমগণ বাস করতেন। আকবরের কয়েকখানা তৈলচিত্র টাঙ্গানো রয়েছে দেখলো ওরা। এ তৈলচিত্রে আকবর হিন্দু-সাজে সজ্জিত রয়েছেন। সেকি গম্ভীর বীর-পুরুষ চেহারা। দাড়িগুলো দু'ভাগে ভাগ করে কানের পিঠে সুন্দরভাবে আটকানো। কানে এবং গলায় মতির মালা শোভা পাচ্ছে। মাথায় মণি মুক্তা খচিত মুকুট।

বনহুর প্রতিটি ছবির পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখছিলো। সম্রাট আকবরের শত শত চিহ্ন তার দৃষ্টির সম্মুখে ভেসে বেড়াচ্ছে যেন। এবার তারা আকবরের রাজপ্রাসাদ দেখা শেষ করে বেরিয়ে এলো। শেরশাহের স্থাপিত পাথরের ঘোড়ার মূর্তির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। পাথরে খোদাই করা এ অশ্বমূর্তিটা সত্য বনহুরের মনে স্মরণ করিয়ে দিলো তার প্রিয় তাজের কথা। তাজের কথা মনে হতেই আনমনা হয়ে গেলো বনহুর।

লুসী বললো—আজ ফিরে চলুন মিঃ আলম। আবার আসা যাবে। এখনও অনেক বাকী আছে।

হাঁ, আজ ফেরা যাক।

বনহুর আর লুসী এবার ট্যাক্সী নিয়ে চেপে বসলো।

বনহুর বললো—সত্যি লুসী, তোমার জন্যই আজ দিল্লী এলাম। তাইতো দেখতে পেলাম এতো সব।

বললো লুসী—ক'দিন থাকলে আরও কত কি দেখতে পাবেন—কুতুব মিনার, মতি মসজিদ, দিল্লী দুর্গ, দিল্লী দরবার, ময়ূর সিংহাসন.....

হাসলো বনহুর—ময়ূর সিংহাসন এখনও আছে নাকি?

আসল নেই, তবে নকলটা আছে।

বেশ তাহলে আর একদিন আসা যাবে।

হোটেল বাঞ্ছারামে পৌঁছতে কিছুটা সময় লেগে গেলো। বনহুর আর লুসী হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলো উপরে। লুসী বনহুরসহ প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

লুসী অগ্রে ছিলো, আর বনহুর পিছনে।

লুসী লক্ষ্য না করলেও বনহুরের দৃষ্টি এড়ালো না, লুসী আর সে প্রবেশ করতেই কে যেন মিসেস বাঞ্ছারামের কক্ষ থেকে দ্রুত পাশের কক্ষে চলে গেলো। লোকটা যে সিগারেট পান করছিলো তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কারণ তখনও সিগারেটের একটা মিষ্টি গন্ধ কক্ষমধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো।

লুসী মায়ের কণ্ঠ জড়িয়ে ধরে চুমু দিলো তার ফুটবলের মত গণ্ডে। মা কোনোরকম উক্তি প্রকাশ করলো না।

লুসী বললো—মা, উনি আগ্রায় তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন।

বেশ এবার ওকে ওর ঘরে যেতে দাও। আর তুমি খেয়ে নিজের কামরায় চয়ে যাও। টেবিলে তোমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে।

মিস লুসী আনন্দভরা কণ্ঠে বললো—তুমি খাবে না মা?

আজ আমি সকাল সকাল খেয়ে নিয়েছি।

লুসী আর বনহুর পাশের কক্ষে চলে গেলো।

বনহুরের জন্য টেবিলে খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

লুসী বললো—নিন, এবার খেয়ে নিন। ইস্ সারা দিন যা পরিশ্রম গেছে। বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে আপনার!

বনহুর জামাটা খুলতে খুলতে বললো—মোটেই না!

আমার কিন্তু বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে মিঃ আলম।
বনহুর জামাটা আলনার রেখে, শয্যায় গা এলিয়ে দেয়!
লুসী বলে—বারে, শুয়ে পড়লেন যে?
এতো বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, বিশ্রাম না করে খাবার উপায় নেই।
তাহলে আমি চলি, গুড্ নাইট।
অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো বনহুর—গুড্ নাইট!
মিস লুসী বেরিয়ে যায়।
বনহুর আর শুয়ে থাকে না, দ্রুত শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়ে। কলিং বেল টিপতেই বৃদ্ধা বয় চাঁদ এসে হাজির হলো-কিছু চাই বাবু?
বনহুর বললো—আমার মোটেই ক্ষুধা নেই, টেবিলের খাবারগুলো নিয়ে যাও!
সেকি বাবু, খাবেন না তা কি হয়! না খেলে গিন্নি-মাতা রাগ করবেন। আপনাকে খেতে হবে।
কিন্তু খাবার যে কোনো উপায় নেই চাঁদ। আচ্ছা চাঁদ, তুমি খেয়ে নিয়েছো?
কন কি বাবু? আমরা চাকর-বাকর মানুষ—সবার শেষে খাবো।
বনহুর খুশী হয়ে বললো—তা হলে এক কাজ করো চাঁদ।
বলুন বাবু?
আমার খাবারগুলো চেয়ারে বসে খেয়ে নাও।
ছিঃ ছিঃ ছিঃ তা কি হয়?
কেন হবে না। আমি বলছি খাও।
কিন্তু......
কেউ জানবে না। খাবার পর এঁটো থালাগুলো নিয়ে গিয়ে বলো বাবু খেয়েছে, বাস্ তা হলেই হলো।
বৃদ্ধা চাঁদ চাকর মানুষ, তাদের জন্য সব সময় আজে-বাজে খাবারগুলো থাকে ভালো খাবার কোনোদিনই তাদের ভাগ্যে জোটে না। সবার শেষে যা থাকে তাই ওরা খায়। বাবুর জন্য টেবিলে ঢাকা দেওয়া ভালো খাবারগুলোর লোভ চাঁদ ছাড়তে পারলো না। টেবিল থেকে থালাটা মেঝের এক কোণে নামিয়ে রেখে খেতে শুরু করলো।
বনহুর শয্যায় বসে তাকিয়ে রইলো চাঁদের দিকে।
খাওয়া শেষ হতে না হতে চাঁদ ঢলে পড়লো মেঝের কার্পেটে। বনহুর জানতো, আজ তার খাবার বিশুদ্ধ নেই....এটা তার সন্দেহ হয়েছিলো কাজেই সে খাবার স্পর্শ করেনি। যদিও ক্ষুধায় তার পেট চোঁ চোঁ করছে!
বনহুর দ্রুতহস্তে বয়ের দেহ থেকে তার পোশাকটা খুলে নিলো এবার, তারপর বয়কে তার শয্যায় শুইয়ে দিয়ে বেশ করে চাদর চাপা দিলো।
এবার বনহুর বয়ের ড্রেস আর নিজের সুটকেসটা নিয়ে বাথরুমে প্রবেশ করলো।

বনহুরের সুটকেসটার মধ্যে ছিলো তার ছদ্মবেশ ধারনের নানা-রকম জিনিসপত্র। বনহুর যখন তার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো তখন তাকে দেখলে বয় চাঁদ ছাড়া কিছু মনে হবে না। তেমনি দাড়ি-গোঁফ আর মাথার চুলগুলো সাদা, ভ্রূতেও পাক ধরেছে! একটু উবু হয়ে হাঁটছে সে—ঠিক চাঁদের মতই।

বনহুর সম্মুখের দরজা ভালোভাবে আটকে দিয়ে পিছন দিকের জানালার শার্শী খুলে বেরিয়ে পড়লো তার কক্ষ থেকে। অত্যন্ত দ্রুত সে এ কাজগুলো করে নিলো।

আর সে মুহূর্ত বিলম্ব না করে প্রবেশ করলো মিস লুসীর কক্ষে। মিস লুসী তখন বাথরুম থেকে ফিরে এসে সবেমাত্র খাবার টেবিলে বসেছে। মাথার উপর ইলেকট্রিক ফ্যানটা ভনভন করে ঘুরছে।

ফ্যানের হাওয়ায় মিস লুসীর চুলগুলো এলোমেলো হয়ে উড়ছিলো। দেহের কাপড়খানাও ঠিক সংযত নেই, এলিয়ে পড়েছে হাতের উপর।

চাঁদের আগমন টের পেয়ে বলে মিস লুসী, কিরে—এতোরাতে জেগে আছিস দেখছি?

দিদিমনি, তোমার খাবারটা বড্ড ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, যদি বলো গরম করে এনে দি। বনহুর তার গলার স্বর যতদূর সম্ভব চাঁদের অনুকরণ করে নিলো।

মিস লুসী জানে, চাঁদ তাকে অত্যন্ত স্নেহ করে, ছোট থেকে সে-ই নাকি ওকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে। কাজেই চাঁদের কথায় সে কিছুমাত্র অবাক না হয়ে বললো—আমার কিন্তু বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে, খাবার গরম করতে দেরী হবে না তো?

এই তো এলাম বলে...বৃদ্ধ বয়ের বেশে দস্যু বনহুর লুসীর খাবার নিয়ে বেরিয়ে যায়!

হোটেলে প্রবেশ করে সে।

ছোট্ট কামরায় হোটেলের ম্যানেজারের খাবার ঢাকা দেওয়া আছে সে দেখতে পেলো। দ্রুতহস্তে টেবিল থেকে খাবারের থালা হাতে তুলে নিয়ে লুসীর খাবারগুলো ঢাকা দিয়ে রাখলো যেমন ছিলো ঠিক তেমনি করে।

ফিরে এলো লুসীর কামরায়।

লুসীর সম্মুখে খাবার সাজিয়ে রেখে সরে দাঁড়ায় বৃদ্ধ বয়।

লুসী গোগ্রাসে খেতে শুরু করলো।

বনহুরের সন্দেহ জেগেছিলো-যেমন তার খাবারে কোন বিষক্ত ঔষধ মেশানো হয়েছিলো, তেমনি লুসীর খাবারেও থাকতে পারে, তাই সে কৌশলে পাল্টে নিয়েছিলো খাবারগুলো! কারণ এখানে আসার পর তার সমস্ত ব্যাপারগুলো তেমন সুবিধার মনে হচ্ছিলো না। বিশেষ করে লুসীর মায়ের আচরণ কেমন যেন ঘোলাটে ঠেকছিলো।

লুসী খাওয়া শেষ করে বললো—চাঁদ, ওগুলো নিয়ে যা।

চাঁদ টেবিলের এঁটো থালাগুলো নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো। ডাকলো লুসী—ওগুলো রেখে একবার শুনে যাবি।

আচ্ছা দিদিমনি।

চাঁদ বেরিয়ে যায়, একটু পরে ফিরে আসে সে—দিদিমনি, কিছু বলবে?

মিস লুসী তার দেহের জামাটা খুলে ফেললো। তারপর নাইট ড্রেস পরে নিলো সে। বৃদ্ধ চাঁদকে সে যেন কোনো সঙ্কোচই করে না। ছোটবেলা হতে ওকে দেখে আসছে, ওর হাতেই মানুষ হয়েছে কিনা তাই চাঁদ কতকটা ওর মায়ের মতই। বললো লুসী—চাঁদ, আজ বড্ড ঘুরেছি, পা দুটো আমার ব্যথা হয়ে গেছে। একটু টিপে দিবি?

এবার চাঁদবেশি দস্যু বনহুর একটু হতভম্ব হলো, শেষ পর্যন্ত তাকে....না না, এতে দোষ কি! বললো—দেবো দিদিমনি।

লুসী টেবিল থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বললো—আমি বই পড়ছি, তুই বেশ করে আমার পা দু'খানা দেবে দে চাঁদ।

লুসী বিছানায় শুয়ে পড়লো।

চাঁদ বসলো ওর পাশে! কিন্তু সহসা লুসীর দেহে হাত রাখতে দ্বিধা বোধ করছিলো। সত্যি তো আর সে বৃদ্ধ চাঁদ নয়। তবু কোনো উপায় নেই, চাঁদের অভিনয় তাকে করে যেতে হবে।

লুসীর দেহে হাত রাখলো, আলগোছে টিপতে-লাগলো ওর পা দু'খানা।

লুসী বইখানা কিছুক্ষণ চোখের সামনে মেলে ধরে তারপর বন্ধ করে রাখলো বুকের উপর, বললো—চাঁদ, ও ঘরে বাবু ঘুমিয়েছে?

বোধ হয় ঘুমিয়েছে কিন্তু কেন দিদিমনি?

না এমনি বলছিলাম। আচ্ছা চাঁদ?

বলুন দিদিমনি?

বাবুকে তোর কেমন মনে হয়?

তেমনি সুবিধের বলে মনে হয় না আমার।

সে কিরে?

হাঁ কেমন যেন বেয়াড়া ধরনের লোক।

লুসী এবার বেশ রেগে গেলো, পা দু'খানা ওর হাতের তলা হতে সরিয়ে নিয়ে বললো—কি করে বুঝলি সে বেয়াড়া।

ঐ রকম মনে হয়।

খবরদার, ওর সম্বন্ধে আর ওরকম কথা বলবি না। উনি বড় ভালো মানুষ। ওকে আমার খুব ভালো লাগে।

সত্যি আপামনি?

হাঁ। জানিস না উনি আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে বাঁচিয়েছেন!

চাঁদ!

বলুন আপামনি?

ওকে আমি ভালবেসে ফেলেছি।

দিদিমনি।

হাঁ চাঁদ। জানিস না তুই, উনি মানুষ নন—দেবতা। ওকে আমি অন্তর দিয়ে ভালবেসেছি।

তুমি ভুল করেছো আপামনি।

না, আমি ভুল করিনি। চাঁদ,ওর মত মানুষ আমি আর দ্বিতীয় জন দেখিনি। জানিস না চাঁদ, আমি ওকে কতখানি ভালোবেসে ফেলেছি।

তা হয় না। তা হয় না দিদিমনি। একজন বিদেশী মানুষকে হঠাৎ এমন ভালোবাসা অত্যন্ত ভুল।

চাঁদ, যার সম্বন্ধে কিছু জানিস না, তার সম্বন্ধে কিছু বলতে যাসনে।

কিন্তু আমি বলছি ওকে ভালোবেসে নিজেকে বিনষ্ট করোনা দিদিমনি.....

মিস লুসী চাঁদের গালে ঠাই করে একটা চড় বসিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে, তারপর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে—বেরিয়ে যা আমার সম্মুখ থেকে....যা বলছি.....

শুভ্র দাড়ি-গোঁফের আড়ালে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠলো বনহুরের মুখে! ধীরে ধীরে কক্ষ ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলো বনহুর। ভাবলো, হায়রে নারী জাতি, তোমরা শুধু সরল মনে সবাইকে বিশ্বাস করতেই জানো! জানোনা উজ্জ্বল আলোর পেছনেই আছে গভীর অন্ধকার।

বনহুর নিজের কামরার দিকে অগ্রসর হলো, কিন্তু হঠাৎ তার কানে প্রবেশ করলো একটি চাপা কণ্ঠস্বর। থমকে দাঁড়ালো সে। কথার শব্দটা মিসেস বাঞ্ছারামের ঘর থেকেই আসছে বলে মনে হলো।

বনহুর লঘু পদক্ষেপে এগিয়ে গেলো মিসেস বাঞ্ছারামের কক্ষের জানালার বদ্ধ শার্শীর পাশে। নিকটবর্তী হতেই শোনা গেলো অস্পষ্ট পুরুষ কণ্ঠ—বিশ হাজার দিয়েছি, কিন্তু মাল এখনও আমার ভোগে এলো না।

মিসেস বাঞ্ছারামের কণ্ঠ—সে দোষ কি আমার? আমি তো বারণ করিনি। নিয়ে যাও তুমি, আমার লোক সব ব্যবস্থা করে রেখেছে।

সেই দুষ্ট লোকটাকেও তো অজ্ঞান করা হয়েছে?

হাঁ, তার খাবারেও ক্লোরফরম ঔষধ মিশানো হয়েছিলো। আর লুসীর খাবারেও। কিন্তু শোন ধীরেন, লুসীকে এতো বড় করতে আমার যা খরচা হয়েছে তা বিশ হাজারের অনেক বেশি। কাজেই আমাকে আরও দশ হাজার দিতে হবে, এবং পূর্বেও সে ভাবে কথা হয়েছিলো তোমার সঙ্গে।

বনহুর কান পেতে শুনছে। যা সে সন্দেহ করেছিলো তাই সত্য, লুসী নিশ্চয়ই মিসেস বাঞ্ছারামের মেয়ে নয়—কে সে। কার মেয়ে লুসী....আর ধীরেন, ধীরেন তাহলে ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়েও মরেনি—সে বেঁচে আছে!

বনহুরের চিন্তায় বাধা পড়লো, আবার শোনা গেলো ধীরেনের কণ্ঠ—দশ হাজার দিতে রাজী আছি, কিন্তু যখন তোমার লুসী আমার বাধ্যের মধ্যে আসবে তার আগে নয়।

বনহুর জানালার ফাঁকে দৃষ্টি রেখে দেখলো—সেই লোক যে দিল্লী মেল থেকে লুসীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলো—সেই ধীরেনচরণ। বনহুরের চোখ দুটো হিংস্র হয়ে উঠলো।

আবার বনহুর শুনতে পেলো ধীরেনের গলা—গাড়ি হোটেলের সম্মুখে তৈরি আছে!

আরও একটু বিলম্ব করো ধীরেন, কারণ এখনও হোটেলে লোক আছে। হাঁ, শোন আর একটা সুখবর আছে বলবো এবার।

কি সুখবর?

গত পরশু রাতে ভীম সিংহকে হত্যা করা হয়েছে......

চমকে উঠে বনহুর, ভীম সিং—অভয়কর বিশ্বাসের বিশ্বস্ত অনুচর ভীম সিং। তার রিভলভারের গুলীতে একটি হাত ওর নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো চিরতরে। তবে কি সে ভীম সিং.....

আবার শোনা গেলো মিসেস বাঞ্ছারামের গলা—ধীরেন, এখন তুমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত থেকো। লুসীর ব্যাপারে শুধু সে-ই জানতো আর কেউ জানেনা—লুসী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা.....

আর একবার বনহুর চমকে উঠলো, লুসী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা—আশ্চর্য!

মিসেস বাঞ্ছারাম তখনও বলে চলেছে—ঐ ভীম সিং ওকে চুরি করে আমাকে এনে দিয়েছিলো। শুনেছি ওরা দুটি যমজ বোন ছিলো ঠিক এক রকম দেখতে। হাঁ, তার জন্য ভীম সিং আমার কাছ থেকে নগদ দশ হাজার টাকা নিয়েছিলো।

ধীরেনের কণ্ঠ—ভীম সিংকে হত্যা করে সব মুছে ফেলেছেন!

হাঁ, লুসীর গোপন সংবাদ একমাত্র সে-ই জানতো।

তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্য কি ছিলো মিসেস বাঞ্ছারাম?

লুসী যখন বড় হবে তখন ভীম সিংকে আরও পাঁচ হাজার দেয়ার কথা ছিলো, কারণ লুসী বড় হয়ে অপূর্ব সুন্দরী হবে—এটা সে জানতো এবং তার দামও হবে অনেক বেশি।

তাই বুঝি?

হাঁ, তাই সে বার বার কলকাতা থেকে ছুটে আসতো আমার কাছে, তার বাকী পাওনাটা বুঝে নিতে। আমাকে ভয় দেখাতো—লুসীকে সব বলে দেবে।

তাই আপনি.....

হাঁ, তাই আমি পরশু রাতে তাকে খতম করে দিয়েছি।

বনহুর আড়ালে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারলো, সেদিন তার কামরায় কার্পেটে যে জমাট শুকনো রক্তের দাগ লক্ষ্য করেছে তা ঐ হতভাগ্য ভীম সিং-এর বুকের রক্ত।

আর বিলম্ব করা উচিৎ মনে করলো না বনহুর, সে দ্রুত নিজের কামরায় প্রবেশ করে শুধু রিভলভারটা তুলে নিলো পকেটে। তারপর বেরিয়ে এলো বাইরে। হোটেলের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নীচে।

হোটেলের সম্মুখে গাড়ি অপেক্ষা করছে দেখতে পেলো বনহুর। নিশ্চয়ই এটা সে গাড়ি যে গাড়িখানার কথা একটু পূর্বে ধীরেনের মুখে শুনেছে।

বনহুর গাড়িখানার পাশে গেলো, ড্রাইভার বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

বনহুরের দেহে এখনও বৃদ্ধ বয় চাঁদের ড্রেস। বললো বনহুর—এই ড্রাইভার, তোমাকে ভিতরে ডাকছেন মিসেস বাঞ্ছারাম।

ড্রাইভার সোজা হয়ে বললো—আমাকে?

হাঁ, কিছু বখশীস দিবেন উনি নিজের হাতে।

চলো! ড্রাইভার অনুসরণ করলো চাঁদকে।

চাঁদবেশি বনহুর ড্রাইভারকে নিয়ে হোটেলের মধ্যে ম্যানেজারের ছোট্ট কামরায় প্রবেশ করলো। দেখলো ম্যানেজার চেয়ারে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। বুঝতে পারলো—লুসীর খাবার খেয়ে তার এ অবস্থা হয়েছে। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে ড্রাইভারের বুকে রিভলভার উঁচু করে ধরলো। তারপর নাকের কাছে একটা রুমাল চেপে ধরতেই ড্রাইভার এলিয়ে পড়লো মেঝেতে।

বনহুর কৌশলে এ কাজগুলো সমাধা করে নিলো।

ড্রাইভার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলতেই বনহুর ওর দেহের ড্রেস খুলে নিলো। পরেও নিলো ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। চাঁদ বয়ের ড্রেসটা পড়ে রইলো সেখানে।

গাড়িতে এসে বসে রইলো চুপ করে।

অল্পক্ষণ পর কয়েকজন মানুষ একটি যুবতীর সংজ্ঞাহীন দেহ ধরাধরি করে নিয়ে এলো গাড়ির পাশে।

ড্রাইভারবেশী দস্যু বনহুর বুঝতে পারলো, এ অন্য কেহ—নয় মিস লুসী। তাকে নিশ্চয়ই ঘুমে ক্লোরফরম করে অজ্ঞান করা হয়েছে। গাড়ির হ্যাণ্ডেল চেপে বসে রইলো বনহুর।

লুসীকে লোকগুলো উঠিয়ে দিলো গাড়ির পিছন আসনে ড্রাইভিং আসনের পাশে চেপে বসলো শয়তান ধীরেন, বললো—ড্রাইভার চলো। জিম্‌সী রোড, ২৪ নং এ।

আচ্ছা স্যার। মুখে 'আচ্ছা স্যার বললেও জিম্‌সী রোড কোথায় জানে না বনহুর, দিল্লীর পথঘাট তার তেমন করে পরিচিত নয়। তবু গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

জনহীন রাজপথ।

গাড়ি উল্কা বেগে ছুটতে শুরু করলো।

ধীরেন বললো-কোন্ পথে যাচ্ছো?

স্যার, এ পথ দিয়েও যাওয়া যায়।

এ পথটাই বুঝি নির্জন?

হাঁ স্যার।

খুব সাবধানে গাড়ি নেবে ড্রাইভার। দেখো কেউ যেন টের না পায়। তোমাকে মোটা বখ্‌শীস দেবো।

স্যার, একটা কথা বলবো?

বলো?

জিম্‌সী রোড় আপনাদের জন্য খুব নিরাপদ নয়।

কেন?

কারণ ওখানে গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার থাকেন। বড় সতর্ক ব্যক্তি তিনি। হঠাৎ যদি......

তুমি কোথাকার কথা বলছো ড্রাইভার, জিম্‌সী রোডে পুলিশ গোয়েন্দা...

ঠিক্ সে মুহূর্তে বনহুর ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে রিভলভার চেপে ধরে ধীরেনের বুকে—খবরদার নড়বে না!

বিস্ময়ভরা ভীত কণ্ঠে বলে ধীরেন—কে তুমি?

হেসে উঠে বনহুর—আমিই জিম্‌সী রোড়ের সে পুলিশ গোয়েন্দা।

তুমি! তুমি.....

হাঁ, বন্ধু এবার তোমার পরিত্রাণ নেই।

সুচতুর ধীরেন হক্‌চকিয়ে গেলো, একেবারে পুলিশ গোয়েন্দার কবলে পড়বে, কল্পনাও করতে পারেনি সে। কি করে উদ্ধার পাবে আর লুসীকে আত্মসাৎ করবে, এ চিন্তাই করতে লাগলো।

ঠিক্ সে মুহূর্তে পিছন আসনে মিস লুসী আর্তকণ্ঠে কোঁকিয়ে উঠলো। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো বনহুর।

ধূর্ত ধীরেন আচম্বিতে বনহুরের হাতে আঘাত করতেই তার রিভলভারখানা ছিটকে পড়লো গাড়ির সামনের নীচে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর রিভলভার তুলে নিতে গেলো কিন্তু জমাট অন্ধকারে সে কিছুই দেখতে পেলো না।

সে সুযোগে ধীরেন গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে অদৃশ্য হলো পথের ওপাশে। আর তার সন্ধান পাওয়া গেলো না!

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

দিল্লীর পথঘাট তার পরিচিত নয়, কাজেই এ-পথ সে-পথ গাড়ি চালিয়ে বড় একটা হোটেলের সম্মুখে এসে গাড়ি রাখলো বনহুর।

লুসী তখন অনেকটা সুস্থ হয়ে এসেছে। বনহুর ওকে বললো—লুসী ভয় নেই—আমি মিঃ আলম।

আপনি!

সব পরে তোমাকে বললো, এখন আমার হাত ধরে নেমে এসো।

কোথায় যাবো?

এটা একটা হোটেল। এ হোটেলের একটা ক্যাবিন রিজার্ভ করে থাকবো।

লুসীর মাথাটা তখনও ঝিমঝিম করছে, তবু বনহুরের শরীরে ড্রাইভারের ড্রেস দেখে বললো—আপনার শরীরে এ ড্রেস কেন?

সব পরে জানতে পারবে। এসো লুসী। বনহুর গাড়ির দরজা খুলে হাত বাড়ায় লুসীর দিকে।

লুসীসহ বনহুর হোটেলে এসে উঠলো।
দিল্লীর বড় হোটেল গুলশান।
বনহুর বিপদে পড়লো....তার শরীরে এখন ড্রাইভারের ড্রেস। কাজেই হোটেলের ম্যানেজারের কাছে লুসীকে মালিক-পত্নী বলে পরিচয় দিলো সে।
হোটেলের ম্যানেজার মাহমুদ রিজভী অত্যন্ত ভালো মানুষ। তিনি স্বয়ং লুসীর জন্য ভালোভাবে সব ব্যবস্থা করে দিলেন। কারণ লুসী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেনি।
প্রথমে ম্যানেজার মাহমুদ রিজভীর একটু সন্দেহ হয়েছিলো, কিন্তু পরে জানলেন, পথে হঠাৎ মাথা ঘুরে যাওয়ায় তার এ অবস্থা। তখন তিনি আর ভালোভাবে তার থাকা এবং খাওয়ার সব জোগাড় করে দিলেন।
লুসী রইলো ক্যাবিনে আর ড্রাইভারবেশি বনহুর রইলো তার দরজার পাশের বেলকুনিতে। অবশ্য ম্যানেজারের মত নিয়েই সে এখানে শুয়ে পড়লো।
লুসীর তখন ভালোই জ্ঞান হয়েছে, বললো—একি করেছেন?
হেসে বললো বনহুর—ড্রাইভারের ভাগ্যে এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যায় বলো?
রাতটা কোনোরকমে কাটলো।

❑

পরদিন ড্রাইভারবেশী বনহুর ম্যানেজার সাহেবের কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে গেলো? যাবার সময় বললো—স্যার, মিসেস পারভিনের দিকে একটু লক্ষ্য রাখবেন। আজ স্বয়ং মালিক মিঃ আলম আসবেন, আমি তাকে আনতে যাচ্ছি।
বনহুর লুসীর পরিচয় মিসেস পারভিন বলে দিয়েছিলো!
ম্যানেজার মাহমুদ রিজভী ড্রাইভারকে ভরসা দিলেন।
বনহুর চলে গেলো!
তারপর যখন বনহুর ফিরে এলো তখন তার দেহে মূল্যবান স্যুট। সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে তার চেহারা। কয়েক ঘন্টা পূর্বের সে ড্রাইভার যে এখনকার মিঃ আলম, এ কথা কেউ যেন ভাবতেই পারবে না।
ম্যানেজারকে এসে তার পরিচয় জানালো বনহুর।
ম্যানেজার সসম্মানে অভ্যর্থনা জানালেন, এবং বললেন—আপনার স্ত্রী এখন ভালো আছেন। তিনি নিজে মিঃ আলমকে নিয়ে চললেন লুসীর কামরার দিকে।
বনহুর আজ বিব্রত হলো না, কারণ এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। লুসীর স্বামীর অভিনয় তাকে করতেই হবে, বাঁচাতে হবে লুসীকে। তাকে পৌঁছে দিতে হবে তার বাবা অভয়কর বিশ্বাসের কাছে।

বনহুর লুসীর কক্ষে প্রবেশ করতে লুসী খুশীতে উচ্ছল হলো। এখন বনহুরের দেহে কোনোরকম ছদ্মবেশ নেই। স্বাভাবিক ড্রেস তার। বনহুরকে দিল্লীর কেউ চেনেনা, জানে না তার আসল পরিচয়। কাজেই বনহুরের স্বাভাবিক ড্রেসে এখানে কোনো অসুবিধা ছিলো না।

মাহমুদ রিজভী বনহুরকে ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে চলে গিয়েছিলো।

মিস লুসী বললো—মিঃ আলম, আপনার জন্য আমি উদ্বিগ্ন রয়েছি। বলুন আমার মা কোথায়? এবং আমার এ অবস্থা কেন?

বনহুর ঠোঁটের উপর আংগুল চাপা দিয়ে বললো—আস্তে বলো লুসী! কেউ শুনে ফেললে বিপদ ঘটবে, কারণ তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ নও।

বনহুর একটা আসনে বসে পড়ে সিগারেট ধরালো।

লুসী নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে বনহুরের সুন্দর-বলিষ্ঠ মুখমণ্ডলের দিকে। দৃষ্টি সে যেন ফিরিয়ে নিতে পারছিলো না।

বনহুর বললো—লুসী, যাকে তুমি মা বলে পরিচয় দাও, সে তোমার মা নয়।

লুসী অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—আপনি কি বলছেন মিঃ আলম!

লুসী, মাফ করো—আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলবো, যা তোমার কাছে অশোভনীয় লাগবে।

বলুন মিঃ আলম?

শোন লুসী, আমাকে কয়েকদিন দিল্লীতে অপেক্ষা করতে হবে, আমার সঙ্গে তোমাকেও। লুসী, এ হোটেলেই আমরা থাকবো। আমাদের একটা মিথ্যা অভিনয় করতে হবে—অবশ্য আমাদের মঙ্গলের জন্যই। তোমাকে আমি যদিও বোনের মত ভালবাসি, কিন্তু আপাততঃ তুমি আমার স্ত্রীর অভিনয় করবে।

লজ্জায় লুসী মাথা নীচু করলো, রক্তাভ হয়ে উঠলো তার গণ্ড। হাজার হলেও লুসী বাংলার মেয়ে।

বনহুর মৃদু হাসলো, বললো—অবশ্য তুমি এতে কিছু মনে করবে না।

লুসী একবার দৃষ্টিটা তুলে তাকালো , তারপর মুখ নীচু করে নিলো।

লুসী, প্রথমে জেনে নাও—তুমি মিসেস বাঞ্ছারামের কন্যা নও। তুমি কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা।

অভয়কর বিশ্বাস!

হাঁ।

না না আমি, আমি....আমার মা মিসেস বাঞ্ছারাম.....চুপ করে শোন লুসী। গম্ভীর কণ্ঠস্বর বনহুরের!

লুসী তাকালো। আর কোনো কথা বলতে পারলো না সে।

বনহুর বললো—শিকারী এখনও তোমার পিছু ছাড়েনি। ধীরেনচরণের নিকট তোমার মিসেস বাঞ্ছারাম তোমাকে বিশ হাজার টাকায় বিক্রয় করেছে।

আমার মা আমাকে ধীরেনচরণের নিকটে বিক্রয় করেছেন!
হাঁ লুসী, এখন তুমি ধীরেনচরণের ক্রয় করা বস্তু।
অসম্ভব?
মিসেস বাঞ্ছারামের নিকটে কিছুই অসম্ভব নয় লুসী। তোমাকে সে ক্রয় করেছিলো ভীম সিং এর নিকট থেকে।
ভীম সিং! কলকাতার সে হিন্দুস্থানী একহাতশুন্য ভীম সিং?
সেই তোমাকে ছোটবেলায় হরণ করে আনে, এবং সুদুর দিল্লী নগরীতে বিক্রয় করে। বনহুর সে মুহূর্তে শোনা সমস্ত কথাগুলো বলে লুসীর কাছে। কোনো কথাই গোপন করে না। কেমনভাবে সে ড্রাইভার সেজে ধীরেনচরণ থেকে তাকে নিয়ে এ হোটেলে এসে উঠেছে, এবং মনিব-পত্নী বলে তার পরিচয় দিয়েছে—সব বলে বনহুর।
লুসীর মুখে কোনো কথা সরে না যেন। মুখমণ্ডল গম্ভীর থমথমে হয়ে পড়ে। ললাটে ফুটে উঠে চিন্তার রেখা।
বনহুর বলে—লুসী, তোমাকে যেদিন প্রথম গঙ্গবক্ষ থেকে উদ্ধার করেছিলাম, সেদিন আমি তোমাকে আরতী বলে ভুল করেছিলাম; কারণ তোর চেহারার সঙ্গে মিস আরতী দেবীর হুবহু মিল আছে। মিস আরতী অভয়কর বিশ্বাসের কন্যা।
আমি এখন কি করবো মিঃ আলম?
তোমার বাবার কাছে যাবে।
আমি তাকে চিনি না। কোনোদিন তাকে দেখেছি বলে মনে হয় না।
সব সচ্ছ হয়ে যাবে লুসী, তুমি কিছু ভেবো না।
কিন্তু ধীরেনচরণ যদি.....
হাঁ, সে আবার তোমাকে চুরি করার চেষ্টা করবে!
আমি ধীরেনচরণের হাত থেকে বাঁচতে চাই। আমাকে বাঁচান আপনি?
তোমাকে বাঁচানোর জন্যই আমি আরও কয়েকদিন দিল্লী অপেক্ষা করবো। ধীরেনচরণ তোমার অন্বেষণে দিল্লী শহর চষে ফিরছে। লুসী, তোমাকে অত্যন্ত সতর্ক এবং সাবধানে থাকতে হবে।
আমাকে দিল্লী থেকে নিয়ে চলুন মিঃ আলম।
যাবে, কিন্তু যেখানেই যাও ধীরেনচরণ তোমাকে রেহাই দেবে না। তাই তাকে তোমার চলার পথ থেকে সরিয়ে তবে আমার নিস্কৃতি।
লুসীর চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো, কৃতজ্ঞতায় মন তার কানায় কানায় ভয়ে উঠেছে। যদিও মনটা বড় ভালো লাগছিলো না, কারণ একি আজব কথা শুনলো সে। মিসেস বাঞ্ছারাম তার জননী নয়। আজ নতুন করে স্মরণ হতে লাগলো অনেক কথা। তার জ্ঞান হবার পর থেকে সে দেখছে মিসেস বাঞ্ছারামকে। তার স্নেহ বলে কিছু ছিলো না, কেমন যেন নীরস কঠিনভাবে সব সময় দেখে এসেছে সে তাকে। কোনো কোনো সময় লুসীর মন বিদ্রোহ হয়ে উঠেছে, মিসেস বাঞ্ছারামের আচরণ অসহ্য লেগেছে তার

কাছে। হয়তো হোটেলে কোনো ধনবান ব্যক্তির আগমন হলে লুসীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে পাঠানোর চেষ্টা চলেছে তার কাছে। অর্থের লোভে লুসীকে অসৎ কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা চলেছে রীতিমত। কিন্তু লুসীকে বাগে আনতে পারেনি কোনদিন। লুসীর মনে পড়ে আর একটি দিনের কথা.....মিসেস বাঞ্ছারামের কোনো এক আত্মীয় এসেছিলো, লুসীকে নিয়ে গিয়েছিলো দিল্লী দুর্গ দেখবার নাম করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিল্লী-দুর্গে যায়নি সে, নিয়ে গিয়েছিলো সেকেন্দ্রা পার্কে। সেখানে তাকে জোরপূর্বক আলিঙ্গন করেছিলো শয়তান ভদ্রলোক, জানিয়েছিলো প্রেম-নিবেদন। কিন্তু লুসী তাকে প্রশ্রয় দেয়নি, চরম আঘাত করেছিলো—জোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলো সে তার গালে।

এরপর লোকটার সঙ্গে মিসেস বাঞ্ছারামকে গোপনে আলাপ-আলোচনা করতে শুনেছে। হঠাৎ যদি সেখানে লুসী গিয়ে পড়েছে, অমনি কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেছে তাদের। এসব দেখে লুসীর মন বড্ড খারাপ হয়েছে। কিন্তু ভেবে পায়নি এর পিছনে তার মা মিসেস বাঞ্ছারামের কি স্বার্থ ছিলো! আজ সব সচ্ছ হয়ে গেছে, মিঃ আলম তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

বনহুর বললো—কি ভাবেছো লুসী?

ভাবছি আমার জীবনের বিগত ইতিহাসের কথাগুলো।

যাক তুমি যখন সব বুঝতে পেরেছো?

হাঁ মিঃ আলম। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।

এমন সময় কলিংবেল বেজে উঠলো, বয় প্রবেশ করলো কক্ষে, বললো—স্যার, ম্যানেজারবাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

আসতে বলো। বললো বনহুর।

বেরিয়ে গেলো বয়।

বনহুর বললো—লুসী, এবার আমাদের অভিনয় করতে হবে। কারণ, এখানে আমরা স্বামী-স্ত্রী, বুঝলে।

ঘাড় কাৎ করে সম্মতি জানালো লুসী।

ম্যানেজার কক্ষে প্রবেশ করতেই লুসী মাথায় কাপড় তুলে দিলো।

বনহুর উঠে অভ্যর্থনা জানালো তাকে।

ম্যানেজার মাহমুদ রিজভী অত্যন্ত ভদ্র এবং অমায়িক লোক। এতোবড় একটা হোটেলের কর্মকর্তা হলেও তিনি মিশুক লোক। আসন গ্রহণ করে বললেন মিঃ মাহমুদ—আপনার স্ত্রী কেমন আছেন আজ?

বনহুর বললো—ভালো আছেন। সত্যি, আপনি যা উপকার করেছেন সেজন্য আমি কৃতজ্ঞ।

না না, এমন আর কি করেছি, যা করেছি সো তো আমার কর্তব্য।

আমার ড্রাইভারের নিকটে আপনার অনেক প্রশংসা শুনলাম। ঐ মুহূর্ত আপনি যা করেছেন তা আপনার কর্তব্যের চেয়ে অনেক বেশি করেছেন।

হ্যাঁ, উনি না হলে আমার কি যে হতো! ওনার সহায়তা আমাকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়েছে, বললো মিস লুসী।

মিঃ মাহমুদ বললেন—ছিঃ ছিঃ বেশি বাড়িয়ে বলেছেন মিসেস পারভিন বেগম। আপনারা বিদেশী, আপনাদের সেবা করাই আমাদের কাজ। এখানে আপনাদের কোনোরূপ অসুবিধা হবে না।

আরও কিছু সময় গল্প-সল্প করার পর চলে গেলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী।

এবার লুসী বললো—বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছিলাম কিন্তু?

এরি মধ্যে হাঁপিয়ে পড়েছিলে লুসী? আরও অনেক বাড়ি। লুসী, আমাকে একবার এক্ষুণি বেরুতে হবে, তুমি সাবধানে থাকবে।

কোথায় যাবেন এখন?

বাইরে, কিন্তু কোথায় যাবো সঠিক বলতে পারছি না।

আমার কিন্তু ভয় করছে।

সাবধানে থেকো, আমি বাইরে বেশিক্ষণ বিলম্ব করবো না।

মিঃ আলম!

আস্তে বলো—কারণ বাংলাদেশের মেয়েরা স্বামীকে এভাবে সম্বোধন করে না।

লজ্জিত হলো লুসী, বললো সে—আমিও যাবো আপনার সঙ্গে!

না, তা হয় না লুসী, আমি কোথায় যাবো ঠিক্ নেই কি না।

লুসী আর কোনো কথা বললো না।

বনহুর লুসীর দিকে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বেরিয়ে গেলো।

❑

বনহুর ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

এ ট্যাক্সিখানা সে আজই ক্রয় করেছে। নতুন ঝকঝকে কুইন কার! বনহুর এ-পথ সে-পথ কিছু সময় ঘুরে বেড়ালো। বিশেষ করে দিল্লী শহরটা তার ভালোভাবে জানা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। বেশ কিছুক্ষণ বনহুর ঘুরে বেড়ালো শহরের বিভিন্ন স্থানে।

দিল্লীদুর্গের সম্মুখে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো বনহুর। সুউচ্চ ফটকের সম্মুখে দু'জন রাইফেলধারী পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে। একজন অফিসার ধরনের লোক অদূরে একটা উঁচুস্থানে দাঁড়িয়ে কি যেন লিখছিলেন। বনহুর জানতে পারলো, তিনি দুর্গে যারা প্রবেশ করছেন তাদের নাম লিখে নিচ্ছেন, এবং একটা টিকিট দিচ্ছেন। বিনা পারমিশানে দুর্গে প্রবেশ করা সম্ভব নয়।

বনহুর এগিয়ে এলো, একটি পারমিশান কার্ড নিয়ে প্রবেশ করলো, গেটের ভিতরে। খানিকটা প্রশস্ত পথ পেরিয়ে বিরাট বড় বড় কয়েকখানা অট্টালিকা।

বনহুর এগুতেই একটি লোক এগিয়ে এলো, খাঁটি উর্দুতে বললো— আপনি দুর্গের মধ্যে যাবেন? না বাইরেই দেখবেন?

উর্দুতেই জবাব দিলো বনহুর—আমি দুর্গের মধ্যে যাবো।

লোকটা বনহুরকে নিয়ে অগ্রসর হলো, অবশ্য ওদের কাজ এ্যা, তবে কিছু বখশীসের আশা আছে এ আর কি।

সম্মুখের বড় কামরাটায় প্রবেশ করলো লোকটা, তার পাশে দাঁড়িয়ে বনহুর।

বনহুর দেখলো লোকটা দেয়ালের একস্থানে একটা চক্রাকার চাবি ঘুরাতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মেঝের একস্থানে একটা সুড়ঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো।

লোকটা এবার সুড়ঙ্গ পথে নামতে লাগলো, বনহুর অনুসরণ করলো তাকে। সুড়ঙ্গ পথ বেশি প্রশস্ত নয়, পাশাপাশি দু'জন মানুষ নামতে বা উপরে উঠতে পারে। লোকটা আরও বললো, দিল্লী-দুর্গে প্রবেশের আর একটি পথ আছে, সেপথ অতি দুর্গম। এখন কীটপতঙ্গ [illegible] ভগ্ন অবস্থায় সে পথ রোধ হয়ে পড়েছে!

সিঁড়ির ধাপ বেয়ে বনহুর আর লোকটি নেমে এলো নীচে। দুর্গের মধ্যে ইলেকট্রিক আলো নেই, সেকালে ঝাড়বাতি, লণ্ঠন বা ঐ ধরণের কোনো আলো জ্বালান হতো। লোকটি দু'হস্তে দুটি মোম-জ্বেলে গিয়েছিলো, সিঁড়ির মধ্যে অন্ধকার একটু বেশি। বনহুর আরও লক্ষ্য করলো সিঁড়ির দু'পাশে শ্বেত পাথরের বড় বড় টুকরা রাখা হয়েছে। ঐ পাথরগুলো অত্যন্ত সচ্ছ, পাথরের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর আলো প্রবেশ করছে। ঐ রকম শ্বেত পাথর দুর্গের নানাস্থানে দেয়ালে গাঁথা রয়েছে দেখলো বনহুর।

নীচে নেমে আসার পর ঘুরেফিরে দেখতে লাগলো সে। একস্থানে বন্দীদের আটকে রাখা হতো। মোটা মোটা শিখ দিয়ে সে স্থানটি ঘেরাও করা রয়েছে। সে কি মজবুত প্রকোষ্ঠ, কোনো-ক্রমে এখান থেকে বন্দিগণ পালাতে সক্ষম হতো না! অন্য এক স্থানে অপরাধী দাস-দাসীদের বন্দী করে রাখা হতো, সেস্থানটি বন্দীদের কারাকক্ষের চেয়ে কিছুটা পৃথক ধরণের। অন্য এক-স্থানে ফাঁসীর মঞ্চ। এ ফাঁসীমঞ্চে অপরাধীদের ফাঁসী দেয়া হতো। রশি ছাড়া সব ঠিক রয়েছে। পাশাপাশি কয়েকটা ফাঁসীর মঞ্চ। এক সঙ্গে কয়েকজনকে ফাঁসী দেয়া হতো হয়তো। প্রত্যেকটা ফাঁসীমঞ্চের নীচে এক একটি কূপ রয়েছে। লোকটা বনহুরকে বুঝিয়ে বললো, অপরাধী বন্দীদের ফাঁসী দেয়ার পর এসব কূপে তাদের ফেলে দেয়া হতো। এ কূপগুলোর সঙ্গে যুমনা নদীর যোগাযোগ আছে। লাশগুলো একেবারে চলে যেতো যমুনায়। এখন সে কূপগুলো বড় বড় পাথরের চাপ দিয়ে ঢাকা রয়েছে।

বনহুর এবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো, সৈনিকগণ যেখানে থাকতো বা বিশ্রাম করতো! ছোট ছোট অনেকগুলো কামরা। এগুলোতে সৈনিকগণ কি করতো ঠিক্ বোঝা গেলো না। ওদিকে তাকাতেই দেখলো দুর্গের মধ্যে

সারি সারি কামান খাড়া করা রয়েছে। কামানের মুখগুলো সব বাইরে। মাটি ভেদ করে উঠে গেছে উপরে। কিন্তু উপরে কামানের মুখ—টের পাবার জো নেই। কৌশলে বসানো হয়েছে কামানগুলো। শত্রুর আগমন জানতে পারলেই সম্রাটের আদেশে এ সব কামান গর্জে উঠতো। আজ অবশ্য কামানগুলো সম্পূর্ণ অকেজোভাবে রয়েছে।

বনহুর আরও কিছুক্ষণ ঘুরে ঘুরে দেখলো। কত পুরানের স্মৃতি ভাসতে লাগলো তার চোখের সম্মুখে। দিল্লী-দুর্গ দেখা শেষ করে বনহুর উঠে এলো উপরে। হাতঘড়িটা দেখে নিলো, তারপর গাড়িতে এসে বসলো।

মতি মসজিদ, কতুবমিনার দেখা শেষ করে বনহুর আগ্রে গেটে এসে গাড়ি রাখলো, প্রথমেই তার নজরে পড়লো কঠিন পাথরে তৈরি বিরাট ঘোড়ার মূর্তি। সামনের দু'খানা পা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই সুউচ্চ প্রাচীর, যার উপর থেকে ঘোড়া নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলো অমর সিংহ। এখানের প্রধান গেটের নাম অমরসিংহ গেট। দিল্লী দুর্গের চেয়ে এ দুর্গটি আরও বড়। এ দুর্গ তৈরি করেছিলেন সম্রাট আকবর। ভিতরে প্রবেশ করে দেখলো নানারকম প্রাকোষ্ঠ। দেওয়ানই খাস মহল, সম্রাটের আরামখানা। বেগম মহল, বেগমদের গোসলখানা। প্রত্যেকটা কক্ষে এক কালে মণি-মুক্তা-হীরা খচিত ছিলো, আজ আর সে সব নেই।

শাহজাহানকে যে কক্ষে বন্দী করে রাখা হয়েছিলো সেখানে গিয়ে বনহুর কিছুক্ষণ মৌন রইলো। তারপর গেলো উপরে, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন বলেছিলেন বৃদ্ধ শাহজাহান তার আদরিণী কন্যা জাহানারাকে, মা জাহানারা এখান থেকে লাফিয়ে পড়ে মরবো মা?

জাহানারা পিতাকে আঁকড়ে ধরে বলেছিলো—বাবা, আত্মহত্যা করা যে মহাপাপ।

বনহুরের কানে যেন আজ জাহানারার কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি জাগলো। শুনতে পেলো বৃদ্ধ শাহজাহানের কম্পিত কণ্ঠ।

চিরকুমারী জাহানারার কবর দেখলো, কোনোরকম সাজসজ্জা বা আড়ম্বড়ের বালাই নেই। শ্যামল দূর্বা-ঘাসে আচ্ছাদিত কবরের বক্ষস্থল। শিয়রে একখণ্ড শীলা, তাতে লিখা রয়েছে জাহানারার হৃদয়ের কথা, তার অন্তরের বাণী।

তারপর বনহুর দিল্লীর শ্রেষ্ঠ আউলিয়া "চেরাগে দেহেলি" নিজাম উদ্দিনের গোর জিয়ারৎ করলো।

এবার ফিরে চললো সে, অনেক দেখেছে আজ আর নয়। লুসী হয়তো তার প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে।

নিজাম উদ্দিনের মাজার থেকে গাড়ি নিয়ে বনহুর সোজা চললো হোটেল গুলশানের দিকে।

আজ একদিনে বনহুর অনেক কিছু পথঘাট সব চিনে নিলো, চিনে নিলো বড় বড় নামকরা জায়গাগুলো। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, বনহুরের গাড়িখানা

তখন লাবলীং ক্লাবের সম্মুখপথ দিয়ে চলছিলো। বনহুরের দৃষ্টি আর্কষণ করলো লাবলীং ক্লাবের চোখ ঝলসানো আলোকসজ্জা।

বনহুর ব্যাক করে গাড়িখানা এনে রাখলো লাবলীং ক্লাবের সম্মুখে। নেমে পড়লো সে, ক্লাবে প্রবেশ করতেই অর্কেস্ট্রার সুর তার কানে এসে পৌঁছলো। বনহুর ক্লাবের ভিতরে প্রবেশ করে একটা টেবিলের পাশে বসে পড়লো।

এ ক্লাবটি শুধুমাত্র বিদেশীদের জন্য। দিল্লীর অধিবাসিদেরকে এ ক্লাবে কমই দেখতে পেলো বনহুর। বাঙালীর সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

ডায়াসে তখন যন্ত্রসংগীতের ঐক্যতান একটানা বেজে চলেছে। উজ্জ্বল তীব্র আলোকে আলোকিত ক্লাবকক্ষ। ওদিকে ডাইনিং হলটি গমগম করছে। অভিজাত সম্প্রদায়ের সুবেশধারী নানা বয়সী নর-নারী সরগরম করে তুলেছে স্থানটি।

বনহুর একটা সিগারেট ধরালো। দৃষ্টি তার ক্লাবকক্ষের চারদিকে সতর্কভাবে ঘুরে ফিরছে। বয় এসে দাঁড়াতেই খাবারের অর্ডার দিলো, লাবলীং হোটেলের সুস্বাদু খাবারের লোভ বনহুর ত্যাগ করতে পারলো না, তাছাড়া ক্ষুধায় পেটের নাড়ি চোঁ চোঁ করছিলো তার।

খাবার এলো, তার সঙ্গে এলো মাংস আর মদ।

বনহুর খেতে শুরু করলো।

ওদিকে ডাইনিং হলের টেবিলে ছুরি-কাঁটা-চামচের ঠুং ঠাং শব্দের সঙ্গে চলেছে নানা রকম হাসিগল্পের ফুলঝুরি। তার সঙ্গে ভেসে আসছে বিলেতী মদের তীব্র গন্ধ, আর অভিজাত সম্প্রদায়ের নর-নারী দেহের প্রসাধনীর সুবাস।

বনহুর খেতে বসে লক্ষ্য করছিলো এসব নর-নারীদেরকে এবং কান পেতে শুনছিলো তাদের আলাপ-আলোচনা।

হঠাৎ একটা হাসির শব্দে বনহুর ফিরে তাকালো। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতখানা থেমে গেল মাঝপথে। প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ একটা যুবতী একটি পুরুষের কণ্ঠ বেষ্ঠন করে হাসির ঝঙ্কার তুলেছে। উভয়ের হস্তে সুরার পাত্র। যুবতীর দিকে চোখ পড়তেই দৃষ্টি নত করে নিলো। কিন্তু নিজের অজ্ঞাতেই আবার তার চোখ দুটো ফিরে গেলো নগ্ন তরুণীর দিকে।

লোকটা তখন তরুণীর কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ওর গণ্ডে চুম্বন দিয়ে চলেছে। যুবতীও প্রতিদান দিয়ে যাচ্ছে ঠিকভাবে। ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হলো বনহুরের।

বনহুর বিল চুকিয়ে দিয়ে যেমন উঠতে যাবে অমনি দেখলো ক্লাবকক্ষে প্রবেশ করলো মিসেস বাঞ্জারাম—তার সঙ্গে রয়েছে সে শয়তান ধীরেনচরণ!

বনহুর দ্রুত মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, যাতে তাকে দেখে না ফেলে ওরা। আত্মগোপন করে একটা থামের আড়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালো বনহুর।

মিসেস বাঞ্জারাম ও ধীরেনচরণ চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে এগিয়ে গেলো হোটেলের ম্যানেজারের ক্যাবিনের দিকে।

বনহুরও এসে দাঁড়ালো ক্যাবিনের দরজায়। শুনতে পেলো লাবলীং ক্লাবের ম্যানেজারের কণ্ঠে অভ্যর্থনা বাণী। মিসেস বাঞ্ছারাম, পরিচিতা তাঁর। কিছুক্ষণ চাপা স্বরে আলাপ হলো মিসেস বাঞ্ছারাম, ধীরেনচরণ আর লাবলীং ক্লাবের ম্যানেজারের মধ্যে। অতি নিম্ন-কণ্ঠে কথাবার্তা চললো, কাজেই বনহুর বুঝতে পারলো না কিছু।

এবার বিদায় সম্ভাষণের পালা।

বনহুর সতর্কতার সঙ্গে বেরিয়ে এলো লাবলীং ক্লাব থেকে। গাড়িতে বসে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো।

অল্পক্ষণ পর বেরিয়ে এলো মিসেস বাঞ্ছারাম ও ধীরেনচরণ। ওদিকে গাড়িখানার দিকে এগিয়ে গেলো তারা।

গাড়িখানা চলে যেতেই বনহুর তার গাড়ি থেকে পুনরায় নেমে পড়লো, সোজা প্রবেশ করলো ম্যানেজারের ক্যাবিনে। গাঢ় নীল মখমলের পর্দা ঠেলে এগুতেই ম্যানেজার অবাক কণ্ঠে বললেন—কি চান আপনি!

বনহুর চারিদিকে তাকিয়ে দেখে নিলো, কামরায় একমাত্র ম্যানেজার ছাড়া আর দ্বিতীয় জন ছিল না। ক্লাবের অভ্যন্তর হতে তখন অর্কেস্ট্রার সুর ভেসে আসছে। আরও ভেসে আসছে তরুণ-তরুণীদের উচ্ছল হাসির শব্দ।

বনহুর ম্যানেজারের নিকটে এগিয়ে এসেই রিভলভার চেপে ধরলো তার বুকের কাছে। তারপর গম্ভীর চাপা কণ্ঠে বললো—বলুন এ মুহূর্তে যারা বেরিয়ে গেলো তারা আপনাকে কি বলে গেলো?

কে আপনি?

আমি যে-ই হই, জবাব দিন আমার প্রশ্নের?

এক্ষুণি পুলিশ ডাকবো!

তার পূর্বেই আপনার মৃতদেহ গড়িয়ে পড়বে মেঝেতে। বলুন ওরা কি বলে গেলো? মিথ্যা বলার চেষ্টা করলে মৃত্যু অনিবার্য।

ম্যানেজার এবার ভয় পেয়ে গেলেন, এ অবস্থায় ভয় পাবারই কথা। ম্যানেজারের কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলো বনহুর প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে। তবু দমবার লোক নন পাকা লোক ম্যানেজার; বললেন—যারা এমাত্র বেরিয়ে গেলো তারা আমার আত্মীয় এবং আমার সঙ্গে তাদের পারিবারিক আলাপ-আলোচনা হয়েছে।

আমি জানি তারা কে। তাদের পরিচয় আমার অজ্ঞাত নেই। এবং যা তারা বলছে তাও আমি জানি। কিন্তু জানো, যার সর্বনাশ তোমরা করতে চাইছো সে এখন আমার হাতের মুঠায়?

মিস লুসী তোমার হাতের মুঠায়? সে তোমার কাছে আছে?

হাঁ।

কে তুমি?

দস্যু বনহুর!

বিস্ময়ভরা অস্ফুটে ধ্বনি করে উঠলো ম্যানেজার—দস্যু বনহুর! দক্ষিণ পশ্চিম কান্দাই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ দস্যু.......

হাঁ, আমিই সে!

ম্যানেজারের মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তাকালেন সে বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভারখানার দিকে। বনহুর এবার কঠিন কণ্ঠে বললো—বলবে যা আমি জানতে চাইলাম?

ম্যানেজারের কণ্ঠ বাকহীন হয়ে পড়েছিলো, তিনি তখন ভেবে চলেছেন—সুদূর কান্দাই-এর দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল থেকে দস্যু বনহুর দিল্লী শহরে এলো কি করে! দস্যু বনহুরের নাম তিনি শুনেছেন, আরও শুনেছেন কি ভয়ঙ্কর দুর্দান্ত দস্যু সে।

ম্যানেজারকে ভাবতে দেখে বললো বনহুর—কি ভাবছো? যাক আজ তোমাকে রেহাই দিলাম, কিন্তু মনে রেখো—মিস লুসীর কোনো ক্ষতি করেছো তখনই তোমার মৃত্যু হবে।

বনহুর আর বিলম্ব না করে বেরিয়ে গেলো জানালার শার্শী খুলে পিছন পথ দিয়ে।

পরক্ষণেই বনহুর লাফিয়ে পড়লো রাস্তায়, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে চেপে বসলো।

ততক্ষণে ম্যানেজার দরজা খুলে বেরিয়ে আসেন ক্লাবঘরের মধ্যে, চীৎকার শুরু করে দেন—দস্যু দুস্য, ডাকু ডাকু......

সঙ্গে সঙ্গে ডায়াসে অর্কেস্ট্রা বাদ্য থেমে যায়, আরও থেমে যায় ডাইনিং হলের তরুণ-তরুণীর কলকণ্ঠে হাস্যধ্বনি। ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে পড়ে ক্লাবকক্ষ। কিন্তু পর মুহূর্তেই একটা হট্টগোল শুরু হয়—কোন্ দিকে কে পালাতে থাকে তার ঠিক নেই।

ম্যানেজার রিসিভার তুলে নেন হাতে—হ্যালো পুলিশ পুলিশ, দস্যু বনহুরের আবির্ভাব ঘটেছে আমার লাবলীং ক্লাবে....শীঘ্র চলে আসুন!

অল্পক্ষণে পুলিশ চলে এলো, সমস্ত ক্লাব তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো কিন্তু দস্যু বা ডাকুর কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

লাবলীং ক্লাবে একটা ভীতিকর থমথমে ভাব জেগে উঠলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ক্লাব জনশূন্য হয়ে পড়লো। পুলিশ অনেক সন্ধান নিয়েও দস্যুকে আবিষ্কারে সক্ষম হলো না।

ম্যানেজারের মুখে সমস্ত শুনে দিল্লী পুলিশ ইন্সপেক্টর ডায়রী লিখে নিলেন।

❑

বনহুর ইচ্ছে করেই ম্যানেজারের নিকটে তার আসল পরিচয় দিয়েছিলো। পরদিন দস্যু বনহুরের আবির্ভাব-সংবাদ প্রচার হলো। কাগজে কাগজে দিল্লীর

বুকে জাগলো এক ভীতিকর আতঙ্ক। এ দেশের অনেকেই দস্যু বনহুরের নামের সঙ্গে তেমন করে পরিচিত ছিলো না। এবার সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লো। দস্যু বনহুর সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করলো।

দিল্লীর লোকজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়লো সংবাদটা শহর থেকে শহরতলী পর্যন্ত।

হোটেল-রেষ্টুরেন্টে, ক্লাবে, পথে-ঘাটে সর্বস্থানে সবার মুখে মুখে ঐ এক কথা—সুদুর কান্দাই শহর থেকে দস্যু বনহুরের দিল্লী আগমন।

বনহুর সেদিন গুলশানে বসে মিঃ মাহমুদ রিজভীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছে। তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে বললেন—মিঃ আলম, অদ্ভুত সংবাদ, কান্দাই দেশ থেকে দস্যু বনহুর আমাদের দিল্লীতে আগমন করেছে।

আমিও পত্রিকায় সে রকম সংবাদ দেখলাম। কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না একথা।

কারণ? বললেন মিঃ মাহমুদ রিজভী।

বললো বনহুর—কারণ কান্দাই দেশ ভারত থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। সে দেশ থেকে এদেশে সে আসবে কি করে।

মিঃ মাহমুদ বললেন—বেশ কিছুদিন পূর্বে লেবাননে গিয়েছিলাম কোনো কাজে। তখন লেবানন পত্রিকায় দস্যু বনহুর সম্বন্ধে আমি জ্ঞাত হয়েছি। তার অসাধ্য কিছু নেই।

দস্যু বনহুর! আমি কিন্তু তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এর পূর্বে আমি তার নাম শুনেছি বলে মনে হয় না।

মিঃ মাহমুদ দস্যু বনহুরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা জানতেন বর্ণনা করে শোনালেন বনহুরের নিকটে।

বনহুর মনে মনে হাসলেও মুখোভাবে বার বার অবাক হবার অভিনয় করলো।

লুসীও বেশ ভড়কে গেছে, দস্যু বনহুরের নাম সে শোনেনি কোনোদিন। আজ নতুন করে এ নাম সে শুনলো। এক সময় বললো—মিঃ আলম, চলুন আমরা দিল্লী ত্যাগ করে চলে যাই!

অবাক হয়ে বললো বনহুর—এতো তাড়াহুড়ো করছো কেন লুসী?

দস্যু বনহুরের জন্য আমি উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। না জানি সে কত বড় ভয়ঙ্কর দস্যু!

হোক সে ভয়ঙ্কর, তোমার তো সে কোনো ক্ষতি করেনি লুসী?

ক্ষতি সে করেনি কিন্তু যে দস্যু তার অসাধ্য কি আছে বলুন?

লুসী, দস্যু বনহুর আমার বন্ধু, কাজেই তাকে বলে দেবো তোমার যেন কোনো ক্ষতি না করে।

দস্যু বনহুর আপনার পরিচিত?

শুধু পরিচিতই নয়, আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু সে!

আশ্চর্য, একজন দস্যুর সঙ্গে আপনার আন্তরিকতা আছে!

কেন, সেকি মানুষ নয়?
মানুষ হলেও সে দুর্বৃত্ত!
তারও অন্তর আছে লুসী। তাছাড়া আজকের পৃথিবীতে সবাইতো দস্যু, সবাই দুর্বৃত্ত। ভদ্রতার মুখোশ পরে এক একজন দস্যুর চেয়েও অতি ভয়ঙ্কর মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে। লোকসমাজ তাদের উপরের খোলস দেখে সাধু ভ্রমে প্রণাম জানাচ্ছে, কিন্তু তারা জানে না—কত সাংঘাতিক সমাজপতিগণ!
ঠিক বলেছেন মিঃ আলম।
লুসী, তুমি নির্ভয়ে থাকবে, দস্যু বনহুর তোমার কেশও স্পর্শ করবে না।
আপনি বলে দেবেন তার সঙ্গে দেখা হলে।
নিশ্চয়ই দেবো। চলো, রাত অনেক হয়েছে—শোবে চলো।
মিস লুসী আর বনহুর শয্যার দিকে এগুলো। বিপদে পড়লো তারা; বিশেষ করে লুসী একটু হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।
বনহুর বললো—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও লুসী, আমি জেগে রইবো, দস্যু বনহুর যেন তোমার কোনো ক্ষতি করতে না পারে।
লুসী শয্যায় শুয়ে পড়লো।
বনহুর সোফায় বসে পত্রিকাটা তুলে নিলো হাতে।
রাত বেড়ে চললো।
বনহুর পত্রিকা রেখে সিগারেট ধরালো। একটির পর একটি নিঃশেষ করে চললো। তারপর এক সময় সোফায় ঠেস দিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করলো।
কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ একটা খট খট শব্দে ঘুম ভেঙে গেলো তার। চমকে তাকালো-একি, বিছানা শূন্য—লুসী কোথায়? ধরফড় উঠে দাঁড়ালো, চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখলো—দরজা খোলা।
বনহুর দরজার পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো। বাইরে মোটর ছাড়ার শব্দ হলো। ছুটে গেলো বনহুর বেলকুনিতে, দেখলো একটা মডেল কার বেরিয়ে গেলো হোষ্টেল-প্রাঙ্গণ থেকে।
ফিরে এলো বনহুর কক্ষমধ্যে। মন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। লুসীকে সে আশ্বাস দিয়েছিলো—দস্যু বনহুর যাতে তোমার ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য আমি জেগে রইবো। কিন্তু তার আশ্বাস-বাণী রক্ষা করতে পারেনি সে। হঠাৎ নজর পড়লো তার বিছানার দিকে, একখানা ছোট্ট কাগজের টুকরা পড়ে আছে বালিশের পাশে।
বনহুর এগিয়ে গেলো, কাগজের টুকরাটা হাতে নিতেই দেখলো দুটি লাইন লিখা— মিস লুসীকে আমি নিয়ে গেলাম। কারণ, লুসী আমার শিকার। লুসীর অন্বেষণ করা সম্পূর্ণ বৃথা।
ধী......চা.....ভৌ

বনহুর চিঠি পড়ে হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে। তারপর সে চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে দিলো।

❑

ভোরে প্রতিদিনের মত আজও এলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী। বনহুরের কক্ষে প্রবেশ করে বললেন—হ্যালো মিঃ আলম, গুড্ মর্নিং।

বনহুর মুখোভাব স্বাভাবিক রেখে হেসে বললো—গুড্ মর্নিং। আসুন মিঃ রিজভী।

মিঃ মাহমুদ রিজভী আসন গ্রহণ করলেন।

বনহুর একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধরে সিগারেট কেসটা এগিয়ে দিলো মিঃ মাহমুদ রিজভীর দিকে—নিন।

মিঃ মাহমুদ একটা সিগারেট তুলে নিলেন।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো—বনহুর। নিজের সিগারেট ধরিয়ে মিঃ রিজভীর সিগারেট ধরিয়ে দিলো সে।

মিঃ মাহমুদ বললেন—মিসেস পারভিনকে দেখছি না যে?

হেসে বললো বনহুর—ওর এক আত্নীয়ার বাড়ি বেড়াতে গেছেন।

ও। আপনি বুঝি এখন মুক্ত বিহঙ্গ?

কতকটা তাই।

মিসেস পারভিন ফিরবেন কখন?

আজ বোধ হয় ফিরবেন না! দুচার দিন থাকতেও পারেন সেখানে। মিঃ রিজভী?

বলুন মিঃ আলম?

আজ বিকেলে আপনি আমার সঙ্গে বাইরে যেতে পারেন কি?

কোথায় যাবেন মিঃ আলম?

লাবলীং ক্লাবে।

মিঃ মাহমুদ যেন চমকে উঠলেন, অস্ফুট কণ্ঠে বললেন—লাবলীং ক্লাবে যাবেন আপনি?

ভ্রূকুঞ্চিত করে বললো বনহুর—আপনি যেন কথাটা পছন্দ করলেন না। ব্যাপার কি মিঃ রিজভী?

মিঃ আলম, ও ক্লাব ভদ্রসমাজের জন্য অত্যন্ত অমঙ্গলজনক। তবে হাঁ, লাবলীং ক্লাবে ভদ্রমুখোশধারী ব্যক্তিগণই গিয়ে থাকেন।

কারণ কি জানতে পারি কি?

নিশ্চয়ই পারেন। মিঃ আলম, আপনাকে আমি ভালবেসে ফেলেছি। আপনার সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনার ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট। আমি চাই না আপনার কোনো মন্দ হোক।

বেশ আমি যাবো না।

হাঁ, কোনো সময় আপনি ঐ ক্লাবের ত্রিসীমানায় যাবেন না। বরং অন্য যেখানে খুশী যাবেন।

মিঃ মাহমুদ রিজভী বিদায় গ্রহণ করলেন!

বনহুর পুনরায় সিগারেট ধরালো। ললাটে তার ফুটে উঠলো গভীর চিন্তার ছাপ। বনহুর চিন্তা করছিলো মিঃ মাহমুদের কথা—লোকটা সত্যি মহৎ ব্যক্তি, না ভিতরে ওর কোনো চক্রান্ত রয়েছে।

মিঃ মাহমুদ যতই বারণ করুন বনহুর গোপনে বেরিয়ে পড়লো—লুসীর সন্ধান তাকে করতেই হবে। ছদ্মবেশ ধারণ করলো বনহুর। মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ী, গায়ে শেরওয়ানী, পায়ে নাগরা। এক্কা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে হাজির হলো লাবলীং ক্লাবে।

নতুন আগন্তুকের আগমনে ক্লাবের ম্যানেজার স্বয়ং এলেন তাকে অভ্যর্থনা জানাতে। বনহুরকে দিল্লীর কোনো উচ্চ সম্ভ্রান্ত মহাজন বলে মনে করলেন তারা।

সসম্মানে নিয়ে বসালেন, ন্যানারকম খাদ্যদ্রব্য আর পানীয় এলো বনহুরের সামনে। চললো নাচগান আর বাদ্যযন্ত্রের ঐক্যতান। সুন্দরী নর্তকীদের নাচ হলো, তারপর শুরু হলো খাবার পালা। একবার একটি তরুণীর ইংলিশ ড্যান্স চললো। ডায়াসে তখন অর্কেষ্ট্রার পরিবর্তে ইংলিশ বাজনা বাজতে শুরু করেছে।

সারাব পান করা অভ্যাস নয় বনহুরের। সে যখন খাবার ভক্ষণ করছিলো সে ফাঁকে সারাব-পাত্র পাশের ফুলদানীতে উজার করে দিচ্ছিলো। এতো সতর্কতার সঙ্গে বনহুর অভিনয় করে চললো, সে যেন সত্যি সত্যি মদের নেশায় চুর চুর হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে নর্তকীরা তার কণ্ঠ বেষ্ঠন করে ধরছিলো। বনহুর জড়িত কণ্ঠে তাদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে চলেছে। যেন সে একজন পাকা সারাবী।

তারপর বনহুর বিদায় নিলো যখন, তখন এক বাণ্ডিল নোট ম্যানেজারের হাতে তুলে দিয়ে টলতে টলতে তার এক্কা ঘোড়ার গাড়িতে এসে বসলো।

সেদিনের মত ফিরে এলো বনহুর গুলশান হোটেলে।

সকলের অলক্ষ্যে সে প্রবেশ করলো তার ক্যাবিনে। কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করতেই চমকে উঠলো—মিঃ মাহমুদ রিজভী স্বয়ং বসে আছে একটা সোফায়।

মুখে চাপদাড়ি, মাথায় পাগড়ী, গায়ে শেরওয়ানী, পায়ে জরির নাগরা—এসব দেখে বনহুরকে চিনতে পারলেন না তিনি। সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন মিঃ রিজভী—আপনার পরিচয়? আপনি কি মিঃ আলমের সঙ্গে.....

হঠাৎ ভড়কে যাবার লোক বনহুর নয়, চট করে নিজেকে সামলে নিয়ে বললো—মিঃ আলম আমার আত্নীয়। তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।

আমার পরিচয়, আমি দিল্লীর একজন স্থায়ী বাসিন্দা। নাম জিল্লুর আলী রিজভী।

কি বললেন, হাঁ ঐ নাম আমি ইতি পূর্বে শুনেছি। তশরিফ্ রাখুন।

বসলো বনহুর। নতুন এক ফ্যাসাদে পড়লো সে। নিজের কক্ষে নিজেই সে মেহমান!

মিঃ মাহমুদ বললেন—নিতান্ত কোনো কাজেই আপনি এসেছেন নিশ্চয়ই। কিন্তু মিঃ আলম সে যে ৰিকেলে বেড়িয়েছেন এতোক্ষণও তার ফিরবার কোনো লক্ষণ নেই। আপনাকে কিছুক্ষণ বসতে হবে বলে মনে হচ্ছে।

তা আমি তো বেশি বিলম্ব করতে পারবো না।

তা কি হয়, এসেছেন যখন তখন তার সঙ্গে দেখা না করে যাবেন কি করে। আপনি বসুন, আমি নাস্তার জন্য বলি?

না না, তা আমি আজ যাই, আবার কাল হয়তো আসতে হবে।

আপনাকে ছাড়লে তবে তো যাবেন! কলিংবেল টিপলেন মিঃ মাহমুদ।

বয় এলো।

মিঃ মাহমুদ নাস্তার অর্ডার দিলেন।

বনহুর ফ্যাসাদে পড়লো।

অল্পক্ষণ পর নানারকম খাবার এলো।

মিঃ মাহমুদ রিজভী নিজে পরিবেশন করে খাওয়ালেন। বললেন—আপনি আমার হোটেলের বাসিন্দার অতিথি। আপনার সম্মান আমি যদি না করবো তা হলে করবে কে। উনি এসে যদি জানতে পারেন, তার অথিতির অনাদর করা হয়েছে তাহলে তিনি কি মনে করবেন বলুন তো? কাজেই আপনাকে খেতে হবে।

বাধ্য হলো বনহুর খেতে।

খাবার পর বনহুর বিদায় চাইলো।

মিঃ মাহমুদ বললেন—আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন, এ এলেন বলে।

বনহুর জানে—আর কিছুক্ষণ কেন, গোটারাত অপেক্ষা করলেও মিঃ আলম আসবেন না। আলম যে সে জিল্লুর রিজভী—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

রাত বেড়ে আসছে, মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে আর কতোক্ষণ থাকবে বনহুর, এবার সে মিঃ মাহমুদ রিজভীর কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

তারপর ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে ফিরে এলো অর্ধঘন্টা পরে।

মিঃ মাহমুদ রেজভী শশব্যস্তে জানালেন—মিঃ আলম, আপনি এতোক্ষণে এলেন!

কেন? অবাক হয়ে বললো যেন বনহুর।

মিঃ মাহমুদ বললেন—আপনার সঙ্গে জনাব জিল্লুর আলী রিজভী সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন। এতোক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছেন কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনি বড্ড বিলম্ব করে ফেলেছেন ফিরতে।

একটা কাজে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম, তাই ফিরতে বিলম্ব হলো।

হাতঘড়ি দেখেন মিঃ মাহমুদ—এবার খানা খেয়ে শুয়ে পড়ুন। জনাব জিল্লুর রিজভী কাল আসবেন বলে গেছেন।

বয় তারপর খাবার নিয়ে এলো; বিপদে পড়লো বনহুর—খাবে কি করে সে! কিছুক্ষণ পূর্বে যে খাওয়া সে খেয়েছে, এরপর আর খাওয়া যায় না!

বনহুর কোনোরকমে চারটি মুখে দিয়ে শুয়ে পড়লো। লুসীর জন্য বড় অস্বস্তি বোধ করছিলো সে, না জানি ওকে কোথায় নিয়ে গিয়েছে। লুসীর করুণ মুখখানা ভাসছে তার চোখের সামনে।

শয়তান ধীরেনচরণকে এ দিল্লী শহরে খুঁজে বের করা যদিও কঠিন হবে, তবু যেমন করে হোক তাকে বের করতেই হবে। লুসীকে উদ্ধার করে পৌঁছে দিতে হবে তার পিতার কাছে।

বনহুর শয্যা গ্রহণ করলো বটে কিন্তু ঘুমাতে পারলো না। কিছুক্ষণ নিশ্চুপ শুয়ে থাকার পর শয্যা ত্যাগ করে নেমে দাঁড়ালো। সম্পূর্ণ জমকালো ড্রেসে সজ্জিত হয়ে হোটেলের পিছন সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করলো হোটেলকক্ষে। হোটেলের পাশ কেটে আর একটি সিঁড়ি উঠে গেছে ম্যানেজার মিঃ মাহমুদ রিজভীর কামরার দিকে। বনহুর সে পথেই দ্রুত উঠে গেলো উপরে। মিঃ রিজভীর দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো বনহুর। হঠাৎ তার কানে এলো একটি কড় কড় শব্দ। বনহুর জানালার পাশে উঁকি দিলো কিন্তু কিছুই নজরে পড়লো না। এবার শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না।

বনহুর কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

কক্ষমধ্য থেকে আর কোনোরকম সাড়া এলো না।

কিছুক্ষণ ধৈর্য্য সহকারে দাঁড়ালো বনহুর, তারপর পিছন দিকের জানালার কপাট খুলে সন্তর্পণে প্রবেশ করলো ভিতরে। কক্ষমধ্যে কোনোরকম আলো নেই, জমাট অন্ধকার কক্ষটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বনহুর সুইচ টিপতেই বিস্ময়ে চমকে উঠলো—বিছানা শূন্য, মিঃ মাহমুদ রিজভী কক্ষে নেই। অথচ কক্ষের চারদিকে দরজা ভালোভাবে বন্ধ। অবাক হলো বনহুর, তার মনে একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠলো। নিপুণ দৃষ্টি মেলে দেখতে লাগলো চারদিকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁকা বা ছিদ্রপথ নেই। মিঃ মাহমুদ রিজভী গেলো কোথায়! অনেক অন্বেষণ করেও কোনো সন্ধান পেলো না বনহুর, তার চোখে কোনোরকম সন্দেহজনক কিছু পরিলক্ষিত হলো না।

বনহুর যখন গভীরভাবে চিন্তা করছে ঠিক তখন পুনরায় সে শব্দ শুনতে পেলো সে, অদ্ভুত কড় কড় শব্দ। কোনো কপাট বা লৌহদরজা খুলে যাওয়ার মত শব্দ হলো যেন।

বনহুর দ্রুত একটা আলমারীর পাশে আত্মগোপন করে দাঁড়ালো কিন্তু দৃষ্টি তার রইলো কক্ষের সর্বত্র।

হঠাৎ বনহুর দেখলো—কক্ষের মেঝের একটা জায়গা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। এবং শব্দটা ঐ স্থান থেকেই বের হচ্ছে। কর্কশ কড় কড় শব্দ। শব্দটা খুব বেশি জোরে হচ্ছেনা যদিও, তবু বেশ শোনা যাচ্ছে।

আরও বিস্মিত হলো বনহুর—মেঝেতে সুন্দর একটি সুড়ঙ্গপথ বেরিয়ে এলো। এবং সে সুড়ঙ্গমুখে দেখা গেলো গুলশান হোটেলের ম্যানেজার মিঃ মাহমুদ রিজভীকে। আরও অবাক হলো যে, মাহমুদ রিজভীর মুখে এখন কোনো দাড়ি-গোঁফ নেই।

বনহুর নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো, কোনোরকম শব্দ না করে। মিঃ রিজভী সুড়ঙ্গমুখ থেকে বেরিয়ে দেয়ালে টাংগানো একখানা ছবির পাশে এসে দাঁড়ালেন। ছবিটা কোনো কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো বা ঐ ধরনের নয়। দেয়ালের গায়ে পাথরে খোদাই করা যেন মূর্তি। মিঃ রিজভী সে মূর্তির গায়ে হাত দিয়ে চাপ দিতে লাগলো, অমনি সে কড় কড় শব্দ শোনা গেলো। তাকিয়ে দেখলো বনহুর—মেঝের সে সুড়ঙ্গমুখটা মিশে গেছে একেবারে।

মিঃ রিজভী এবার পূর্বের ন্যায় মুখে দাড়ি গোঁফ পরে নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে ফোন করলেন নাইন নাইন, জিরো জিরো ফাইভ ওয়ান লাবলীং ক্লাব।

বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাসে মিঃ মাহমুদ রিজভীর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চললো। আশ্চর্য হলো—বিশেষ করে মিঃ রিজভীকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এসেছে। এমন সরল-সহজ মানুষটির মধ্যেও লুকায়ে আছে এত বড় রহস্যময় জীবন। বনহুর ধৈর্যসহকারে শুনতে লাগলো—কি কথাবার্তা হয় জানার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলো সে।

এবার মিঃ রিজভী কাকে যেন সম্বোধন করে বললেন—তোমার কথামতই আমি কাজ করে চলেছি! মেয়েটিকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। তবে আর দুই তিন দিনের মধ্যে সে রাজী হবে বলে মনে করছি। তাকে অত্যন্ত সাবধানে রেখেছি। না না, কেউ টের পাবেনা—সে আমার এখানে আছে। হাঁ, সে অনেক রাতে ফিরে এসেছে। জানিনা সে কোথায় গিয়েছিলো। হয়তো লুসীর সন্ধানে.....হ্যালো, হাঁ আমি ওকে একটু বুঝতে দেবো না। লুসীকে এখান থেকে সরানোর পূর্বেই ওকে আমি খতম করে ফেলবো। কিন্তু মনে রেখো—লুসী শুধু তোমারই হবেনা আমারও....কথা যেন মনে থাকে বুঝেছো......

বনহুর দাঁতে অধর দংশন করছিলো, এ মুহূর্তে শয়তান রিজভীকে যমালয়ে পাঠাতে পারে সে কিন্তু এতো দ্রুত সে কারো ক্ষতি করতে রাজী নয়। মিঃ রিজভীকে সে এতোদিন সম্মান করে এসেছে শ্রদ্ধাও করেছে বনহুর—কারণ তার ব্যবহারে মুগ্ধ ছিলো সে। আজ মিঃ রিজভীর মুখের

খোলস উম্মোচিত হয়ে গেলো। বিশেষ করে লুসীর সন্ধান পেয়ে তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

মিঃ রিজভী এবার রিসিভার রেখে শয্যায় এসে শয়ন করলো চাঁদরখানা টেনে দিলেন সমস্ত দেহে।

বনহুর তখনও দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চুপ পাথরের মূর্তির মত। মিঃ রিজভী হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন।

বনহুর পাশের আলমারীতে টোকা দিয়ে একটু শব্দ করলো। কোনো সাড়াশব্দ করলেন না মিঃ রিজভী।

বনহুর যে পথে এসেছিলো সে পথে বেরিয়ে গেলো সন্তর্পণে।

সোজা সে নিজের ক্যাবিনে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলো। লুসীর সন্ধানে বনহুর দিল্লীর কত স্থানই না সন্ধান করে ফিরেছে, তবু লুসীর খোঁজ পায়নি। আজ বনহুর কথাটা ভেবে নিজেই অবাক হলো-—দস্যু বনহুরের চোখেও ধোকা লাগিয়েছে মিঃ রিজভী! লুসী তারই হোটেলের কোনো এক গোপনকক্ষে বন্দিনী রয়েছে।

বনহুর মিঃ রিজভীকে খতম করে আজই লুসীকে উদ্ধার করতে পারে কিন্তু তা সে করবে না। এ ব্যাপারে শুধু মিঃ রিজভীই নয়, এমন একটা দল এর সঙ্গে জড়িত আছে যা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলতে হবে। তবেই তার স্বস্তি। এখন বনহুরের উদ্দেশ্য শুধু লুসীকে উদ্ধারই নয়—লুসীর হরণকারী দলকে শায়েস্তা করা।

❑

পরদিন চায়ের টেবিলে মিঃ রিজভীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো বনহুরের। যেন কত সরল-সহজ-সুন্দর মানুষটি। মিঃ রিজভীকে দেখলে মনেই হয় না— তিনি একজন সত্যিকারের শয়তান।

বনহুর চায়ের কাপটা মিঃ রিজভীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—সুপ্রভাত মিঃ রিজভী।

মিঃ রিজভী বনহুরের আচরণে একটু আশ্চর্য হয়ে অস্পষ্ট স্বরে উচ্চারণ করলেন—সুপ্রভাত। একটু থেমে পুনরায় বললেন—আমার সম্মুখে আমার চা আছে। আপনি খান মিঃ আলম।

বনহুর হেসে বললো—গ্রহণ করুন, খুশী হবো!

মিঃ রিজভী হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলেন বনহুরের দেয়া গরম চায়ের কাপটা।

বনহুর টি-পট থেকে আর এক কাপ চা নিজে ঢেলে গলধকরণ করলো।

চা পান করছিলো বনহুর কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি অন্বেষণ করে ফিরছিলো মিঃ রিজভীর আসল রূপটা।

চায়ের টেবিল থেকে যখন উঠলো তখন বেলা ন'টা বেজে গেছে। একটু পূর্বে মিঃ রিজভী বনহুরের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন তার নিজের অফিসরুমে।

বনহুর ডাইনিং-রুম থেকে ফিরে এলো নিজের কামরায়।

অল্পদিন পর সে পূর্বদিনের সে মহাজনের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে হোটেলের পিছন সিঁড়ি বেয়ে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো সম্মুখ গেট দিয়ে। হোটেলে প্রবেশ করতেই একজন বয় এগিয়ে এলো—কেয়া চাইয়ে সাহাব?

বনহুর বললো— ম্যানেজার সাহাব সে মিলনে আয়া।

বয়টি বনহুরকে নিয়ে হাজির করলো ম্যানেজার মিঃ রিজভীর ওখানে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই মিঃ রিজভী অভ্যর্থনা জানালেন—আচ্ছালামো আলায়কোম জনাব। তশরিফ্ রাখুন।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো।

মিঃ মাহমুদ রিজভীও আসন গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—মিঃ আলমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছেন বুঝি?

জ্বি হাঁ, তার সঙ্গে দেখা করা আমার নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ তার স্ত্রী মিসেস পারভিন নাকি এখানে নেই।

না, তিনি এখানে নেই। শুনেছি তার কোন আত্মীয়ের বাড়ি গেছেন।

কিন্তু আমি জানি, সে কোনো আত্মীয়ের বাড়ি যায়নি। দেখুন ম্যানেজার সাহেব, আপনার ব্যবহারে আমি অতি সন্তুষ্ট হয়েছি। আপনি অতি মহৎ জন, এ কথা আমি বুঝতে পেরেছি। একটা কথা আপনাকে বলবো, অবশ্য অত্যন্ত গোপন এক রহস্যপূর্ণ কথা।

আপনি নিঃসংকোচে বলুন? বলেন ম্যানেজার কি মাহমুদ রিজভী।

জিল্লুর রিজভীবেশি বনহুর বললো—আসলে ঐ মেয়েটি মিঃ আলমের স্ত্রী বা আত্মীয়া নয়।

অবাক হবার ভান করে বললেন মিঃ মাহমুদ—কি বললেন, মিসেস পারভিন মিঃ আলমের স্ত্রী বা আত্মীয়া নন!

না, মেয়েটি নাকি হিন্দু যুবতী। মিঃ আলম তাকে কোথা থেকে নাকি জোগাড় করেছেন। আমার সঙ্গে তার কথা হয়েছে—ঐ যুবতীটিকে তিনি আমার কাছে বিক্রয় করবেন।

বলেন কি?

সত্যিই বলছি এবং আমি জানি আপনি এসব জানা সত্ত্বেও তাকে বলবেন না।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ আমি বলবো এ কথা? আপনি আমার উপর বিশ্বাস রাখবেন। হাঁ , কি বলছিলেন—মিসেস পারভিন মিঃ আলমের স্ত্রী নন?

না।

তবে কে মেয়েটি?

ঐটুকুই আমি জানি, মেয়েটিকে তিনি কোথা হতে সংগ্রহ করেছেন জানিনা।

কিছুক্ষণ যেন গভীরভাবে চিন্তা করলেন বা চিন্তার অভিনয় করলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী, তারপর বললেন—আমি অবাক হচ্ছি, কারণ তাঁরা আমার হোটেলে স্বামী-স্ত্রী বলেই পরিচয় দিয়েছেন।

এতে অবাক হবার কি আছে? হোটেলে এসব ব্যাপার নিত্য কত সংঘটিত হয়ে চলেছে।

আপনি কি তাকে ক্রয় করবেন মনস্থ করেছিলেন?

আপনার কাছে লুকোবার কিছু নেই। হাঁ, তার সঙ্গে আমার ঐ রকম কথাবার্তা চলছিলো।

বললেন মাহমুদ রিজভী—আপনার সঙ্গে তার কোনোরকম দাম চুক্তি হয়েছিলো কি?

হয়েছিলো!

কত স্বীকার করেছিলেন আপনি?

প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার। কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুর মিঃ মাহমুদ রিজভীর মুখে।

চোখ দুটো জ্বল জ্বল করে উঠলো মাহমুদ রিজভীর, ঠোঁটখানা জিভ দিয়ে চেটে নিলের অলক্ষ্যে একবার। ভাঁজা মাছের গন্ধে বিড়াল যেমন উগ্র হয়ে উঠে ঠিক তেমনি। বললেন মাহমুদ রিজভী—তাতেও কি সে রাজী হয়নি?

না, পুরো দু'লক্ষ টাকা তার দাবী ছিলো।

কিছুক্ষণ মৌন রইলো মাহমুদ রিজভী, তারপর বললেন—সেই মেয়েটি ছাড়া আপনি কি.....

হাঁ হাঁ যে কোনো একটি সুন্দরী অল্পবয়স্ক মেয়ে হলেই আমার চলবে।

হেসে বললেন মাহমুদ রিজভী—আর যদি সে মিসেস পারভিনকে পান?

যা চাইবেন তাই দেবো, কিন্তু মিঃ আলম কি এ ব্যাপারে......

তিনি এর বিন্দু বিসর্গ জানবেন না।

অবাক হবার ভান করে বলে বনহুর—দেখুন দয়া করে মিসেস পারভিনকেই আমায় দিন.....

কোনো চিন্তা নেই, সে এখন আমার হাতের মুঠায়। তবে আমি এখন তার রক্ষক হিসাবে আছি। সে হলো ধীরেনচরণ ভৌমের শিকার।

তার মানে?

মানে মিঃ আলমের হাত থেকে মিস লুসী এখন চলে এসেছে.....

মিস লুসী! অবাক হবার অভিনয় করে জিল্লুর রিজভীবেশী বনহুর।

হাঁ, মিস লুসীই ছিলো মিঃ আলমের কাছে এবং তারা উভয়ে স্বামী-স্ত্রী বলে পরিচিত হবার চেষ্ট করেছিলো। কিন্তু আমার চোখে সে ধূলো দিতে পারেনি। পারভিন লুসীর ছদ্মনাম।

জিল্লুর রিজভী বললেন—আপনি যা চাইবেন তাই পাবেন, আমি মিস লুসীকে চাই।

বেশ তাই হবে।

তা হলে আমি মিঃ আলমের সঙ্গে দেখা করবো না?

না, কারণ মিঃ আলম এখন মিস লুসীর সন্ধানে উন্মত্ত।

তাহলে কবে আমি তাকে পেতে পারি?

আপনি যখন খুশী তার উচিৎ মূল্য দিয়ে গ্রহণ করতে পারেন। আচ্ছা আজ আপনি আসুন, পরে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা পাকা হবে।

আচ্ছা আমি চললাম—জিল্লুর রিজভীবেশী বনহুর বেরিয়ে গেলো তখনকার মত।

সোজা সে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে ড্রেস পরিবর্তন করে নিলো। এখন সে সম্পূর্ণ ড্রাইভারের ড্রেসে সজ্জিত হয়ে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে।

গাড়ি বারান্দায় যে গাড়িখানা দাঁড়িয়েছিলো বনহুর সোজা এসে চেপে বসলো তার ড্রাইভিং আসনে। মিনিট দুই পরেই গাড়িখানার পাশে এসে দাঁড়ালো মিঃ মাহমুদ রিজভী, দামী স্যুট-পরা, মাথায় ক্যাপ। একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে চেপে বসলেন গাড়ির পিছন আসনে, বললেন—লাবলীং ক্লাব।

বনহুরের অপরিচিত নয় লাবলীং ক্লাব, গাড়ি ছুটলো এবার দিল্লীর শেরশাহ রোড় ধরে ফরিদা রোড়ের দিকে।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

রাত্রির গভীরতার সঙ্গে দিল্লী নগরীর নির্জনতা যেন থমথমে হয়ে উঠেছে! পথ জনশূন্য। ইলেকট্রিক আলোগুলো কেমন যেন স্তিমিত মনে হচ্ছিলো। পথের দু'পাশের সুউচ্চ অট্টালিকাগুলো যেন সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

মিঃ মাহমুদ রিজভীর গাড়ি তখন লাবলীং ক্লাবের উদ্দেশ্যে ছুটে চলছে।

ড্রাইভিং আসনে স্বয়ং দস্যু বনহুর।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়িখানা লাবলীং ক্লাবের সম্মুখে এসে থামলো।

লাবলীং ক্লাবের উজ্জ্বল আলোগুলো তখনও দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। ভিতর থেকে ভেসে আসছে সুমিষ্ট একটা বাজনার সুর। মাঝে মাঝে জড়িত কণ্ঠের অস্পষ্ট আওয়াজের সঙ্গে শোনা যাচ্ছে নারী-কণ্ঠের হাস্যধ্বনি।

মিঃ মাহমুদ রিজভী গাড়ি থেকে নেমে চলে গেলেন ক্লাবের মধ্যে।

মাহমুদ রিজভী ক্লাবে প্রবেশ করতেই বনহুর তার ছদ্মবেশ পাল্টে নিলো। গাড়ির মধ্যে সে লুকিয়ে রেখেছিলো তার স্বাভাবিক ড্রেস। সাধারণ এক নাগরিকের বেশে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করলো সে ক্লাবকক্ষে।

হলকক্ষের একটা কোণে গিয়ে চেয়ার টেনে বসে পড়লো বনহুর। তাকালো সে কক্ষের চারপাশে। লাবলীং ক্লাব এখন বেশ নীরব। প্রায় টেবিলগুলোই শূন্য—ফাঁকা। দু'একটা টেবিল অধিকার করে তখনও বসে আছে কয়েকটা বিশিষ্ট মাতাল ব্যক্তি। সম্মুখে শূন্য বোতল আর কাঁচপাত্র। কেউ কেউ খালি বোতলটা তুলে ধরে নিঃশেষিত সারাবটক ঢেলে দিচ্ছে গলার মধ্যে। কেউ বা টেবিলে মাথা রেখে পড়ে আছে উবু হয়ে, হাত দুখানা ঝুলছে টেবিলের নীচে।

বনহুর সিগারেট ধরালো।

একটা বয় নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বললো—আনবো স্যার?

হাঁ নিয়ে এসো।

লাবলীং ক্লাবে কিছু বলতে হয় না—ওরা জানে, বেশি রাতে যারা আসে তারা কোন জিনিসের লোভে আসে। বনহুর লক্ষ্য করলো, ডাইনিং হলে তখনও কয়েকজন লোক বসে আছে। এবং তাদের মধ্যে কিছু আলাপ-আলোচনা চলছে। যদিও তারা সারাব পানে চুর চুর তবু বেশ স্বাভাবিকভাবেই ফিস ফিস করে আলাপ করছে। দুটো যুবতীও আছে তাদের দলে! বনহুর আরও লক্ষ্য করলো, যে দুটি যুবতী তখনও ক্লাবের জৌলুস বাড়াবার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলো তারা প্রায় নগ্নদেহী নারী। চোখ দুটো নেশায় লালে লাল হয়ে উঠেছে। দুটো পুরুষের পাশে চেয়ারের হাতলে বসে সিগারেট ফুঁকছিলো। আর মাঝে মাঝে ঝঙ্কার তুলে হাসছিলো যুবতীদ্বয়। কখনও বা ঢলে পড়েছে তারা পুরুষগুলোর গায়ে।

এসব দৃশ্য বনহুরের কাছে অত্যন্ত ঘৃণাজনক! তবু তাকে স্থির হয়ে দেখতে হচ্ছে। সকলের অলক্ষ্যে সে অন্বেষণ করে চলেছে মিঃ মাহমুদ রিজভীকে।

ক্লাবে প্রবেশ করেই কি সে হাওয়ায় উবে গেলো, বিরাট কক্ষটার কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না।

বনহুরের সম্মুখে ততক্ষণে কয়েকটা মদের বোতল আর কয়াচপাত্র এনে রাখা হয়েছে। বয় চলে যেতেই একটি নগ্নপ্রায় যুবতী এগিয়ে এলো, বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে হাসলো ফিক করে।

বনহুর মৃদু হেসে বললো—দাও।

যুবতী কাচপাত্রে খানিকটা মদ ঢেলে হাতখানা এগিয়ে ধরলো বনহুরের ঠোঁটের কাছে!

এবার বনহুর বেশ বিব্রত হয়ে পড়লো। কিন্তু পরক্ষণেই যুবতীর হাতখানা ধরে কাঁচপাত্রটা তুলে নিলো নিজের হাতে, তারপর যুবতীর মুখে তুলে ধরে বললো—তুমি খাও।

যুবতীর চোখ দুটো আনন্দে চক্‌চক্‌ করে উঠলো। এক নিঃশ্বাসে কাচপাত্রের মদটুকু পান করে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। দু'চোখ তার নোশায় ঢুলু ঢুলু করছে। একরাশ কোঁকড়ানো চুল ছড়িয়ে পড়েছে তার চোখে-মুখে-কপালে। বনহুরের চোখে-চোখ রেখে বললো—তুমিও খাও।

হাঁ খাবো।

বনহুর আর যুবতীর যখন কথাবার্তা চলছিলো, তখন বনহুরের দৃষ্টি ছিলো ক্লাবকক্ষের চারদিকে। ওদিকে ডাইনিং হলে লোকগুলো বেশ মাতাল হয়ে পড়েছে, ওদের কথাবার্তা এখন আর চাপা নেই, জড়িত গলায় স্পষ্টভাবে আলাপ হচ্ছিলো।

যুবতীদ্বয়ের একজন তখন বনহুরের পাশে, আর একজন তখনও ঐ মাতাল লোকগুলোর মনঃতুষ্টি সাধন করে চলেছে। আর অবিরত সিগারেট থেকে ধুম্র নির্গত করে চলেছিলো সে।

যে যুবতীটি এখন বনহুরের পাশে, তার সঙ্গে বনহুরের প্রথম দিন লাবলীং ক্লাবে দেখা হয়েছিলো কিন্তু সেদিন বনহুরের মুখে ছিলো চাপদাড়ি আর বড় বড় গোঁফ, মাথায় পাগড়ী। আজ বনহুর সাধারণ ড্রেসে এসেছে। যুবতীটি যদিও তাকে চিনতে পারছে না কিন্তু সে তাকে চিনতে পেরেছে।

যুবতী বলে উঠলো—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, তুমি মোটেই খাচ্ছো না কেন?

বনহুরের দৃষ্টি যদিও ফিরে এলো যুবতীর মুখে কিন্তু তার কান সজাগ রইলো। বললো বনহুর—অনেক খেয়েছি আর নয়।

উঁ হুঁ হবে না, আমার হাতে আর একটু খাও.....যুবতী কাঁচপাত্রটা আবার তুলে ধরলো বনহুরের মুখের সামনে।

বনহুর কাঁচপাত্রটা হাতে নিলো, তারপর বললো—ঐ দেখ কি সুন্দর আকাশ!

যুবতী পাশের জানালা দিয়ে তাকালো জোছনা প্লাবিত আকাশের দিকে।

বনহুর দ্রুতহস্তে কাঁচপাত্র থেকে মদটুকু ফেলে দিলো পাশের ফুলদানীতে। খালি কাঁচপাত্রটা মুখের কাছে নিয়ে বললো,—চমৎকার!

যুবতী এবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো বনহুরের মুখে।

বনহুর খালি কাচপাত্রটা রাখলো টেবিলে।

এমন সময় লাবলীং ক্লাবের ম্যানেজার সে স্থানে উপস্থিত হলো। বনহুরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো তার। বনহুরের চিনতে বিলম্ব হলো না, এর সঙ্গে পূর্বের ঐ দিন সাক্ষাৎ হয়েছে। ধীরেনচরণের দক্ষিণ হস্ত এ শয়তান! বনহুর বিশ্বাস করেছিলো, লাবলীং ক্লাবের ম্যানেজার মিঃ মাহমুদ রিজভীকে, কিন্তু তার আসল রূপ উদঘাটন হয়ে গেছে বনহুরের কাছে। লাবলীং ক্লাব আর গুলশান ক্লাবের মধ্যে রয়েছে ভীষণ এক রহস্যময় যোগাযোগ। অত্যন্ত জঘন্য আর অপ্রীতিকর এ দুটি ক্লাব। বনহুর এ দুটি ক্লাবের ধ্বংস কামনা করে। এখানে দিনের পর দিন কত সচ্চরিত্র ব্যক্তি তাদের জীবনকে নিঃশেষ করে দিচ্ছে! কত সতী নারী বিসর্জন দিচ্ছে তাদের মহামূল্যবান ইজ্জৎ। আজ ক'দিন ধরে বনহুর নিজে উপলব্ধি করে চলেছে এসব ক্লাবের পরিবেশ। ঘৃণায়-বিতৃষ্ণায় তার মন বিষিয়ে উঠেছে, তার বিবেক বাধা দিয়েছে এখানে আসতে কিন্তু না এসে উপায় নেই। লুসীকে তার উদ্ধার করতে হবে আর সায়েস্তা করতে হবে এ সব ক্লাবের শয়তান দুষ্ট বদমায়েশদের! বনহুর এদের ক্ষমা করবে না কিছুতেই।

ম্যানেজারকে বনহুর চিনতে পারলেও ম্যানেজার তাকে বুঝতেই পারেনি, এ লোক একদিন তার বুকে রিভলভার চেপে ধরেছিলো। ম্যানেজার তাকে নতুন আগন্তুক মনে করে যুবতীটিকে ইঙ্গিত করলো কিছু।

যুবতীও ইশারা করলো তার দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে।

চলে গেলো ম্যানেজার।

যুবতী বনহুরের হাত ধরে বললো—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, চলো। উঠে দাঁড়ালো বনহুর, যন্ত্রচালিতের ন্যায় যুবতীর সঙ্গে এগিয়ে চললো। এমনি করে লোকের সর্বনাশ এরা করে চলে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি।

বনহুরসহ যুবতী একটি কক্ষে প্রবেশ করলো।

চমকে উঠলো বনহুর।

দেখলো ওদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে দুই ব্যক্তি, নিম্নস্বরে কিছু কথাবার্তা হচ্ছে তাদের মধ্যে।

যুবতী এবং বনহুরের পদশব্দে তারা ফিরে তাকালো না। যেমন বসেছিলো তেমনি রইলো। যুবতী বনহুরকে ইঙ্গিত করলো ওদিকের কামরায় যেতে।

বনহুর অনুসরণ করলো যুবতীকে।

যদিও বনহুর যুবতীর সঙ্গে সে কক্ষ ত্যাগ করে চলে গেলো। কিন্তু সে লোক দুটিকে সম্পূর্ণ চিনতে পারলো। একজন শয়তান ধীরেনচরণ আর দ্বিতীয় জন মিঃ মাহমুদ রিজভী।

যে কক্ষে ওরা নিভৃতে আলাপ-আলোচনা করছিলো ঠিক তার পাশের কক্ষে যুবতীসহ প্রবেশ করলো বনহুর।

কক্ষটা মাঝারী গোছের।

একটা ডিমলাইট জ্বলছে টেবিলে।

সুন্দরভাবে সজ্জিত কক্ষটা।

যুবতী বনহুরকে ধরে বসিয়ে দিলো একটা চেয়ারে।

একটা বয় এসে টেবিলে রেখে গেলো এক বোতল বিলেতী মদ আর দুটো গ্লাস।

যুবতী নেশায় তখন ঢুলু ঢুলু করছে, তবু বোতলটা হাতে তুলে নিয়ে এক টানে দাঁত দিয়ে খুলে ফেললো বোতলের মুখের ছিপিটা, তারপর গ্লাস দুটো পূর্ণ করে একটি তুলে নিলো হাতে, বললো—নাও।

বনহুর ওর হাত থেকে গ্লাসটা নিজের হাতে নিলো।

যুবতী দ্বিতীয় গ্লাসটা তুলে নিলো।

বনহুর মদের গ্লাস হস্তে তখন ভাবছে অন্য কথা, ধীরেনের সঙ্গে লুসীকে নিয়ে মাহমুদ রিজভীর দাম কষাকষি চলছে নিশ্চয়ই। এতো রাতে সে এসেছে এখানে ঐ কারণে। ধীরেন তাহলে লাবলীং ক্লাবে থাকে। কিন্তু সে জানে না লুসী এখন কোথায় আছে। কিন্তু চিঠিখানা যে ধীরেনের লেখা ছিলো, তাতে মনে হয় ধীরেন চরণই তাকে হরণ করেছে। আসলে তা নয়, হরণ করেছেন লুসীকে মিঃ রিজভী। লোকটা যে অত্যন্ত চালাক তাতে কোন সন্দেহ নেই। চিঠিখানা লেখার উদ্দেশ্যই ছিল মিঃ আলম যেন ধীরেনচরণকেই সন্দেহ করে।

যুবতী গ্লাসের মদ নিঃশেষ করে টেবিলে রাখলো, তারপর বনহুরের হাটুর উপর মাথা রেখে বললো—কি ভাবছে ডার্লিং।

বনহুরের চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়, বলে—তোমার রূপসাগরে ডুববো কিনা তাই ভাবছি।

কেন, তুমি; তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছো না? জড়িত কণ্ঠে বললো যুবতী।

বনহুর যুবতীর চিবুকটা তুলে ধরলো—অবিশ্বাস তো করিনি তোমাকে তবে ভাবছি এর শেষ হবে কোথায়? কথার ফাঁকে বোতল থেকে কিছুটা তরল পদার্থ ঢেলে তুলে ধরলো যুবতীর মুখে—খাও প্রিয়া।

যুবতী আত্মহারা, বনহুরের হাতের মদটুকু নিঃশেষে ঢেলে দিলো কণ্ঠে, তারপর বললো—দাও আরও দাও আমাকে।

বনহুর আবার গ্লাস পূর্ণ করলো, এগিয়ে দিলো যুবতীর দিকে—নাও।

আবার যুবতী পান করলো সবটুকু।

বনহুর পর পর কয়েক গ্লাস মদ পান করালো যুবতীকে। এক সময় যুবতী ঢলে পড়লো বনহুরের হাতের উপর।

এবার বনহুর বিলম্ব না করে ওকে শুইয়ে দিলো ওর বিছানায়। তারপর চাদর দিয়ে ঢেকে দিলো গা অবধি।

বনহুর ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে, এ ঘরে প্রবেশ করতেই কানে এলো মিঃ মাহমুদ রিজভীর চাপা কণ্ঠ—তা হলে কথা ঠিক রইলো তো?

ধীরেনচরণের গলা—বন্ধুর সঙ্গে কথা বেঠিক আবার কবে হয়েছে! তবে হাঁ, তুমি যা চাইছো তাই পাবে কিন্তু পথ পরিষ্কার করে দিতে হবে, বুঝলে তো?

বুঝেছি। আজ রাতেই আমি তোমার পথ পরিষ্কার করে দিবো। কিন্তু মনে রেখো এক পয়সা কম নিবো না।

চলি, গুড নাইট...উঠে পড়লেন মিঃ মাহমুদ রিজভী।

ধীরেনচরণ পুনরায় ওকে টেনে বসিয়ে দিয়ে বললো—লুসী এখন কোথায়, তোমার হোটেলে না বাইরে আছে?

সে কথা আমি বলতে রাজী নই। তবে কথা দিলাম, তোমার মাল তোমার হাতেই আসবে।

বনহুর বুঝতে পারলো—ওদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে, এবার বিদায়ের পালা। মুহূর্ত বিলম্ব না করে আড়ালে আত্মগোপন করে গাড়িতে পৌঁছে গেলো। গাড়ির পিছন থেকে তার ড্রাইভারের ড্রেস নিয়ে ওদিকে একটা থামের আড়ালে গিয়ে পাল্টে নিলো তার সাধারণ পোশাকটা। তারপর এসে বসলো ড্রাইভ আসনে।

ঘনীভূত নিদ্রাতুরের মত গাড়ির হ্যাণ্ডেলে মাথা রেখে ঝিমুতে লাগলো বনহুর।

গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালেন মিঃ মাহমুদ রিজভী ও ধীরেনচরণ।

মিঃ মাহমুদ বললো—ড্রাইভার! ড্রাইভার ঘুমাচ্ছো নাকি?

চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসলো বনহুর।

ধীরেন বললো—আগামী রাতে আবার দেখা হবে।

গুড্ নাইট! কথাটা উচ্চারণ করে গাড়িতে চেপে বসলেন মাহমুদ রিজভী।

ষ্টার্ট দিলো বনহুর।

গাড়ি ছুটলো এবার গুলশান হোটেল অভিমুখে।

❑

বিছানায় শুয়ে ভাবলো বনহুর, আজ রাতেই তাকে খতম করবার সঙ্কল্প করেছে মাহমুদ রিজভী, নিশ্চয়ই সে তার সঙ্কল্প অটুট রাখবার জন্য এখানে আগমণ করবে। হাতঘড়ির দিকে তাকালো বনহুর, রাত চারটা বেজে পঁচিশ মিনিট হয়েছে। শয্যা ত্যাগ করে বিছানার পাশের লম্বা বালিশ দুটো চাদর ঢাকা দিয়ে রাখলো।

ওপাশের আলমারীটার আড়ালে লুকিয়ে রইলো নিশ্চুপ হয়ে। দক্ষিণ হস্তে তার গুলীভরা রিভলভার।

কয়েক মিনিট কেটে গেলো।

হঠাৎ ওদিকের জানালা খুলে গেলো, খুট করে একটা শব্দ হলো। বনহুর দাঁড়িয়ে আছে আলমারীটার আড়ালে। কিন্তু দৃষ্টি তার জানালার দিকে।

ধীরে ধীরে একটি লোক প্রবেশ করলো, ইলেকট্রিক আলোতে তার হাতে সুতীক্ষ্ণ ছোরাখানা চক্ চক্ করে উঠলো। লোকটা সন্তর্পনে এগুচ্ছে তার বিছানার দিকে।

বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে।

লোকটার মুখে মুখোশ, দেহে কালো পোশাক।

বিছানার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো লোকটা এবার। এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে ছোরাখানা সমূলে বসিয়ে দিলো বিছানায় শায়িত বালিশটার বুকে।

অমনি বনহুর ওর পিছনে এসে দাঁড়ালো, হেসে উঠলো অদ্ভুত ভাবে—হাঃ হাঃ হাঃ মিঃ আলমকে হত্যা করলে?

মুখোশ-পরা লোকটা মুহূর্তে হকচকিয়ে গেলে। ফিরে দাঁড়ালো বনহুরের দিকে মুখ করে।

বনহুর রিভলভারের আগা দিয়ে লোকটার মুখের মুখোশ সরিয়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো—আপনি!

লজ্জায় মাথা নত করে নিলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী।

বনহুর হেসে বললো—লজ্জিত হবার কিছু নেই। বসুন মিঃ রিজভী।

মাহমুদ রিজভী কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পথ রোধ করে দাঁড়ালো বনহুর—দাঁড়ান।

মাহমুদ রিজভী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, কিন্তু দৃষ্টি তার দরজার দিকে রইলো।

গম্ভীর কণ্ঠে বললো বনহুর—উদ্দেশ্য সফল হলো না মিঃ রিজভী? মিঃ আলমকে খতম করে মিস লুসীকে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলো!

নত দৃষ্টি তুলে তাকালেন মাহমুদ রিজভী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর পুনরায় বললো—মিঃ রিজভী, আপনি মিঃ জিল্লুর আলীর কাছে মিস লুসীকে বিক্রয় করতে চেয়ে আবার গিয়েছিলেন ধীরেনের হাতে তুলে দিতে।

চমকে উঠলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী, ভাবছেন এতো সব মিঃ আলম জানলো কি করে?

বনহুর এবার মিঃ মাহমুদ রিজভীর পিঠে রিভলভার চেপে ধরলো, তারপর বললো—চলুন আমিই মিঃ জিল্লুর আলী রিজভী, মিস লুসীর সম্বন্ধে আমার সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন! আমি তার প্রথম গ্রাহক।

আশ্চর্য হয়ে তাকালেন মিঃ মাহমুদ, কিন্তু কোনো কথা তার কণ্ঠ দিয়ে বের হলো না।

বনহুর চাপা স্বরে গর্জে উঠলো—চলুন। দেখুন আমার সঙ্গে কোনোরকম চালাকি করতে গেলে মরবেন। লক্ষ টাকাও যাবে প্রাণও হারাবেন।

মিঃ রিজভী বাধ্য হয়েই অগ্রসর হলেন।

বনহুর তাকে অনুসরণ করলো। তার হস্তে গুলীভরা রিভলভার।

মিঃ রিজভী সিঁড়ির ধাপ বেয়ে নীচে নামতে লাগলেন।

নিশীথ রাতের গভীরতায় সমস্ত দিল্লী নগরী নিস্তব্ধ। গুলশান হোটেলও ঢলে পড়েছে সুপ্তির কোলো। কোথাও জনপ্রাণী নেই। বনহুর আর মিঃ মাহমুদ রিজভী চলেছে, দুটো যন্ত্রচালিত মূর্তির মত।

চাপা কণ্ঠে বনহুর বললো—খবরদার, ফাঁকি দিতে চেষ্টা করবেন না মিঃ রিজভী।

এতোক্ষণ মিঃ রিজভী কোনো কথা বলেননি, এবার বললেন তিনি—মিস লুসী বাইরে আছে! আমার গাড়িতে আপনাকে যেতে হবে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—প্রথমেই বলেছি, কোনো রকম চালাকি করবেন না। আমি জানি, মিস লুসী এ হোটেলেই আছে।

নেই, তাকে লাবলীং হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

চলুন আমি আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি....বনহুর হস্তস্থিত রিভলভারখানা চেপে ধরলো মিঃ মাহমুদ রিজভীর পিঠে।

এবার মাহমুদ রিজভী নির্বাকভাবে অগ্রসর হলেন, পিছন ফিরে তাকাবার সাহস তার হলো না।

গুলশান হোটেলের চোরাকক্ষের সুড়ঙ্গমুখে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর মাহমুদ রিজভী।

বনহুর পূর্বদিন দেখেছিলো কেমনভাবে সুড়ঙ্গপথ আবিষ্কার করতে হয়। আজ তার কোনো অসুবিধা হলো না। বনহুর দেয়ালে একটি যন্ত্রে চাপ দিতেই মেঝেতে বেরিয়ে পড়লো একটি সিড়ির মুখ।

মিঃ রিজভীর চোখমুখ রাগে কালো হয়ে উঠেছে। তিনি জানতেন তার এ সুড়ঙ্গপথের সন্ধান বাইরের কেউ জানে না! মিঃ আলম কি করে জানলো বা সন্ধান পেলো এ পথের!

সব রহস্য ফাঁস হয়ে গেলো দেখে তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জে উঠলেন—মিঃ আলম, আপনি কি করে এ পথের খোঁজ পেলেন?

হেসে বললো বনহুর—আপনার কাছে।

আমার কাছে?

হাঁ। আপনি লুসীর কাছে যখন যান তখন আমিও আপনার সঙ্গে ছিলাম মিঃ রিজভী।

অস্ফুট শব্দ করে উঠলেন মিঃ রিজভী—মিঃ আলম!

বনহুর রিভলভার চেপে ধরলো সজোরে তার বুকে—কোনো রকম উত্তেজিত হবেন না। আমি মিঃ আলম নই।

কে! কে তবে আপনি?

আমি দস্যু বনহুর।

দস্যু বনহুর আপনি?

হাঁ।

বিশ্বাস হয় না। দস্যু বনহুরের যে কাহিনী আমি শুনেছি, তার সঙ্গে আপনার কোনোরকম মিল নেই।

তা হলে আপনার বন্ধুই মনে করুন। বেশ, চলুন এবার বন্ধু। মিস লুসীকে আমার চাই।

কিন্তু.....

লক্ষ টাকা তো?

হাঁ, লুসীকে আমি....

লুসীকে আপনি হরণ করেছেন আমার নিকট হতে। জানেন তার শাস্তি কি? মৃত্যু। যদি মরতে না চান তবে বিনা বাক্যে প্রবেশ করুন এ চোরা সুড়ঙ্গপথে, চলুন।

অগত্যা মিঃ মাহমুদ রিজভী চোরা সুড়ঙ্গপথে পা বাড়ালেন। বনহুর চললো তার পিছনে পিছনে।

গভীর মাটির নীচে একটি কক্ষ।

ক্ষীণ একটা আলো টিপ টিপ করে জ্বলছে।

কক্ষমধ্যে আরো অন্ধকার। বনহুর দেখলো, ওপাশে একটা শয্যায় শুয়ে আছে মিস লুসী! ঘুমিয়ে আছে।

মিঃ রিজভী আর বনহুরের পদশব্দ তার কানে পৌঁছলো না। যেমন নিশ্চুপ ঘুমিয়েছিলো, তেমনি রইলো।

বনহুর মিঃ রিজভীসহ পাশের খুপ্‌ড়িতে প্রবেশ করলো। বললো সে— আপনার ছদ্মবেশ ত্যাগ করুন।

অবাক হবার ভান করে বলেন মিঃ মাহমুদ রিজভী—ছদ্মবেশ! আমি তো ছদ্মবেশ ধারণ করিনি।

বেশি কথা বলার সময় এখন নেই। আপনার দাঁড়ি-গোঁফ খুলে আমাকে দিন। এখন আপনি বিশ্রাম করুন। আজ থেকে আমি গুলশান হোটেলের ম্যানেজার মিঃ মাহমুদ রিজভী।

❑

বনহুর মিঃ মাহমুদ রিজভীর ড্রেসে সজ্জিত হয়ে মিস লুসীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ভীত দৃষ্টি নিয়ে তাকালো লুসী বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—মিস লুসী, ভয় পাবার কিছু নেই। জানো আমি কেন এসেছি?

কেঁদে কেঁদে লুসীর দু'চোখ ফুলে গেছে। দেহটা পূর্বের চেয়ে ক্ষীণ হয়ে গেছে। চুলগুলো এলোমেলো তৈলহীন।

বনহুর লুসীর হাত ধরলো—এসো আমার সঙ্গে।

না না আমি যাবো না, আমাকে ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দিন......

হবে না, চলো আমার সঙ্গে যেতে হবে তোমাকে।

কোথায় নিয়ে যাবেন আমাকে?

ধীরেনচরণের কাছে।

উঃ তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলুন। আমাকে মেরে ফেলুন আপনি।

কোনো কথা শুনতে চাই না, এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর মিঃ মাহমুদ রিজভীর বেশে মিস লুসীকে নিয়ে সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে উঠে এলো উপরে।

চোরা কুঠরীর মধ্যে বন্দী করে রাখলো বনহুর আসল মাহমুদ রিজভীকে। সেখান থেকে আর বেরিয়ে আসার কোনো উপায় নেই তার। নিজের তৈরি

মৃত্যুকূপে আটকা পড়েছেন এবার মাহমুদ রিজভী। এতোকাল বহু অন্যায় কাজ তিনি সমাধা করে এসেছেন গুলশান হোটেলের অন্তরালে, সর্বনাশ করেছেন অনেক মহৎ ব্যক্তির। এবার হবে তার উপযুক্ত শাস্তি।

বনহুর মিস লুসীকে নিয়ে গোপন সুড়ঙ্গপথ বেয়ে গুলশান হোটেলের ভিতরে এসে দাঁড়ালো। রাত তখন শেষ হয়ে এসেছে।

মিস লুসী করুণ সুরে বললো—আমাকে আমার ক্যাবিনে পৌঁছে দিন দয়া করে। আমাকে আমার ক্যাবিনে পৌঁছে দিন....

বেশ চলো। মিঃ রিজভীবেশি বনহুর বললো।

লুসীসহ বনহুর তাদের পূর্বের ক্যাবিনে হাজির হলো। ব্যাকুল আগ্রহে তাকালো লুসী কক্ষের মধ্যে। ওপাশে খাটখানা শূন্য পড়ে আছে। মিঃ আলম কই, তবে কি তিনি এ হোটেল ত্যাগ করে চলে গেছেন! কিন্তু পাশের আলনায় নজর পড়তেই কতকটা আশ্বস্ত হলো লুসী, দেখলো কোট-প্যান্ট-সার্ট ঝুলছে। এসব যে মিঃ আলমের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আনন্দ উজ্জ্বল হলো ওর চোখ দুটো।

বনহুর তার দাঁড়ি-গোঁফের আড়ালে লুসীর আনন্দভরা মুখের দিকে তাকালো। মনে মনে সেও কত খুশী হলো না, লুসীকে সে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু সে এ ভাবে তাকে পরিচয় দিতে রাজী নয়, আরও বিলম্ব আছে। দিল্লী নগরীতে আরো কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে তাকে! কারণ ধীরেনচরণকে এখনও উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হয়নি।

মিঃ রিজভীবেশি বনহুর বললো—তুমি এখানে থাকতে পারো। কিন্তু এ হোটেল ছেড়ে কোথাও যেতে পারবে না।

বনহুর লক্ষ্য করলো তার কথায় লুসীর মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে। এ কথা তার মনে একটা শান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দিয়েছে যেন; এখানে তার রক্ষক আলমকে পাবে—এই তার ভরসা।

মিল লুসীকে এ ক্যাবিনে পৌঁছে দিয়ে সরাসরি চলে গেলো বনহুর ম্যানেজার মিঃ মাহমুদ রিজভীর ক্যাবিনে। তাকে কয়েকদিন মিঃ রিজভীর অভিনয় করতে হবে।

বনহুর চলে যেতেই লুসী কক্ষের চারদিকে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকাতে লাগলো, কোথায় তিনি, যার প্রতীক্ষায় তার দিন-রাত্রি চোখের জলে বুক ভাসছে। কোথায় সে দেব সমতুল্য মিঃ আলম। লুসীর মনে ঝড় বইছে, তবে কি তিনি নেই এখানে তাকেও কি ঐ শয়তান সরিয়েছে?

লুসী শয্যায় গিয়ে বসলো, রাত শেষ হয়ে এসেছে। তবে সূর্য উঠতে এখনও ঘন্টাখানেক বাকী।

লুসী শয্যায় শুয়ে পড়লো, কিন্তু ঘুম তার চোখে আসছে না। মনের মধ্যে ঝড় বইছে তার।

এমন সময় ক্যাবিনের দরজায় মৃদু আঘাতের শব্দ হয়। চমকে উঠে লুসী, তাকায় বদ্ধ দরজার দিকে। পরপর দরজায় মৃদু আঘাত হচ্ছে।

লুসী খুলে দেয় দরজা—যা তার ভাগ্যে থাকে হবে। দরজা খুলেই দেখতে পায় সে মিঃ আলমকে, উচ্ছল আনন্দে আত্মহারা হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুসী বনহুরের বুকে—আপনি!

বনহুরও নিজেকে সংযত রাখতে পারে না, বেশ কিছুদিনের ঘনিষ্ঠতায় লুসীর প্রতি তার একটা অনুরাগ জন্মেছিলো। হাজার হলেও সেও তো মানুষ, তার মধ্যেও আছে একটা মানুষের প্রাণ। বনহুর লুসীকে সরিয়ে দিতে পারে না, নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

বনহুরের বুকে মুখ লুকিয়ে লুসী আবেগভরা গলায় বলে—আপনি আমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবেন না। বলুন আর কোথাও যাবেন না?

না লুসী। তোমাকে ছেড়ে আমি তো যাইনি, তুমিই তো আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে।

আমি যাইনি মিঃ আলম, আমাকে ঐ শয়তান মিঃ রিজভী ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর লুসীর চোখের পানি নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে বললো—শয়তানকে আমি উপযুক্ত শাস্তি দেবো;

না না, সে এখন আমাকে এ ক্যাবিনে পৌঁছে গিয়েছে, বলেছে আমি যেন এ ক্যাবিন ছেড়ে কোথাও না যাই। ওকে আপনি আর কিছু বলবেন না। হয়তো আবার সে আপনার উপর প্রতিশোধ নিতে পারে।

লুসী, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো—আমি বললাম আর কেউ তোমার বা আমার উপর কোনোরকম অত্যাচার করতে সক্ষম হবে না।

মিঃ আলম।

বলো লুসী?

বনহুর আর লুসী বিছানায় এসে বসে।

লুসীর মায়াময় চোখে, চাহনী বনহুরের মনে একটা আলোড়ন জাগায়। বনহুর লুসীকে বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলে, মুখখানা নেমে আসে ওর মুখের উপর।

লুসী বাধা দেয় না বনহুরকে, কারণ সে তাকে ভালোবেসে ফেলেছে অন্তর দিয়ে।

কিন্তু বনহুর পরক্ষণেই লুসীকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেয়। গম্ভীর কণ্ঠে বলে—না না, লুসী, তুমি....তুমি......যাও। লুসী, তোমার পবিত্রতা আমি নষ্ট করতে চাই না।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, স্থির দৃষ্টি মেলে তাকায় সে লুসীর মুখের দিকে।
লুসী দৃষ্টি নত করে নেয়।
বনহুর বেরিয়ে যায় কক্ষ ত্যাগ করে।
ভোরের আকাশ তখন ফর্সা হয়ে এসেছে।

❑

মিঃ মাহমুদ রিজভীর বেশে দস্যু বনহুর বসে আছে গুলশান হোটেলের ম্যানেজারের আসনে। নিপুণভাবে ছদ্মবেশ ধারণে অভিজ্ঞ বনহুর। কণ্ঠস্বরকেও পাল্টে নিয়েছে সে অদ্ভুতভাবে।

মিঃ মাহমুদ রিজভী বেশি কথা বলছে না, তার অন্যান্য কর্মচারীদের বলে দিয়েছে, আজ যেন তাকে বেশি বিরক্ত না করে। কারণ, তার শরীর আজ মোটেই ভাল নয়।

নিজের ক্যাবিনে বসে কাজ করে চলেছে সে।

এমন সময় একটি বয় এসে একটা কার্ড রাখলো তার সামনে।

মিঃ মাহমুদ রিজভী কার্ডখানা হাতে তুলে নিতেই বুঝতে পারলো ধীরেনচরণ এসেছে। বয়কে বললো—আসতে বলো।

বয় বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে কক্ষে প্রবেশ করলো ধীরেনচরণ! চোখে কালো চশমা, মাথায় ক্যাপ। ক্যাপ দিয়ে মুখ অর্ধেকটা ঢাকা।

মিঃ মাহমুদ রিজভীবেশি বনহুর এক নজরেই ধীরেনকে চিনে নিতে পেরেছিলো। বনহুরের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে কোনোরকম চালাকি চলে না। বললো—বসুন।

মাহমুদ রিজভীর কথায় আসন গ্রহণ করলো ধীরেনচরণ, তারপর বললো—শুনলাম আপনি নাকি অসুস্থ?

হাঁ। বড্ড সর্দি-কাশি হয়েছে। গলাটা কেমন ভার ভার বোধ হচ্ছে! বলে গলায় মাফলারটা আরও ভালোভাবে জড়িয়ে নিলো।

ধীরেনকে বেশ উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। মিঃ রিজভীর কথায় কান না দিয়ে বললো—আমার কথার কি হলো? ভেবে দেখেছেন তো?

হাঁ দেখেছি, কিন্তু আমি যা চেয়েছি তার কম হবে না।

জানেন লুসী আমার শিকার।

একথা বার বার শুনিয়ে কোনো ফল হবে না মিঃ ধীরেনচরণ, যা চেয়েছি তাই দিতে হবে।

বেশ তাই দেবো। কিন্তু মিঃ আলকে খতম করে দিতে হবে।
সে দায়িত্ব আমার, আমি তাকে সরিয়ে ফেলেছি।
আনন্দধ্বনি করে উঠলো ধীরেনচরণ—সত্যি বলছেন?
হাঁ, মিঃ আলমকে গত রাতে গুম করে দিয়েছি।
আপনাকে ধন্যবাদ মিঃ মাহমুদ। হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডসেক করলো ধীরেনচরণ।
বনহুর মৃদু হাসলো—আপনার পথ আমি পরিস্কার করে দিয়েছি।
মিস লুসীকে তাহলে পাবো?
পুরো টাকা দিলেই পাবেন!
আচ্ছা—আজ রাতে আবার দেখা হবে।
লাবলীং ক্লাবে?
না, আপনার গুলশানে। আপনাকে টাকা দিয়ে মিস লুসীকে নিয়ে যাবো!
বেশ তাই হবে।
ধীরেনচরণ বেরিয়ে যায়।
মিঃ মাহমুদ রিজভীবেশি বনহুর হাসে।
এমন সময় অন্য একজন বয় আসে তার ক্যাবিনে—স্যার, রীণা সাঈদ এসেছেন।
বনহুর থতমত খেয়ে যায়, রীণা সাঈদ—এ আবার কে! এর সঙ্গে মিঃ মাহমুদ রিজভীর কি সম্বন্ধ? এবার হয়তো তার ছদ্মবেশ উদঘাটন হয়ে যাবে। তবু সামলাতে হবে তো! বললো বনহুর—আচ্ছা আসতে বলো!
বয় অবাক চোখে তাকালো, কেমন যেন হতভম্ব ভাব।
বনহুর বললো নিজেকে সামলে নিয়ে—কোথায় ওনি?
স্যার, আপনার ক্যাবিনে!
আচ্ছা যাও, আমি আসছি।
বয় বেরিয়ে যায়।
বনহুর ড্রেসিং-রুমে প্রবেশ করে নিজের ছদ্মবেশটা ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখে নেয়। না, ধরবার কোনো উপায় নেই, তবে গলার স্বরটা যা একটু অন্যরকম। মাফ্‌লারটা ভালোভাবে গলায় জড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়ে এলো বনহুর বাইরে।
মিঃ মাহমুদ রিজভীর ক্যাবিন, বনহুর পূর্ব হতেই চিনতো, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না।
বনহুর মিঃ রিজভীর বেশে প্রবেশ করলো তার ক্যাবিনে! প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়ালো বনহুর, একটি তরুণী কক্ষমধ্যে পায়চারী করছে।

মিঃ মাহমুদ রিজভীকে দেখেই তরুণী ছুটে এলো, জড়িয়ে ধরলো ওর গলা—হ্যালো রিজভী, এতো দেরী করলে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো সে আবার—সব বুঝি ভুলে বসে আছো? যাবে কখন?

হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলো না মিঃ রিজভী, কারণ সে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত।

তরুণী মিঃ রিজভীর আচরণে যে সন্তুষ্ট হতে পারছে না, বললো—কি হলো তোমার বলো তো?

বনহুর এমনি একটা ফ্যাসাদে আর একবার পড়েছিলো, এমনি এক তরুণীর কবলে। বনহুর ঘাবড়ে গেলেও দ্রুত নিজেকে সামলে নিলো, কেশে বললো—বড্ড সর্দি কাশি হয়েছে। গলাটা কেমন যেন বসে গেছে রীণা।

বনহুর বয়ের মুখে শুনেছিলো তরুণীর নাম রীণা সাঈদ। তাই সে ওকে রীণা বলেই সম্বোধন করলো।

রীণার বাহুদুটি মিঃ রিজভীর কণ্ঠ আলীঙ্গন করে আছে।

বললো মিঃ রিজভী—চলো, যাবার সময় হয়ে গেছে যে! তরুণী মিঃ রিজভীর কণ্ঠ মুক্ত করে দিয়ে বললো—এতোক্ষণে তোমার হুঁস হলো বুঝি? চলো।

তরুণী মিঃ রিজভীর হাত ধরে অগ্রসর হলো।

গাড়িতে বসে ড্রাইভ্ আসনে বসলো রীণা সাঈদ।

নিশ্বাস ফেললো বনহুর, কারণ রীণা আর মিঃ রিজভীর গন্তব্য স্থানের সন্ধান জানে না সে।

দিল্লীর পথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

পাশের আসনে বসে আসে মিঃ রিজভীবেশী দস্যু বনহুর। হাওয়ায় রীণা সাঈদের আঁচলখানা উড়ছে। একটা উগ্র সেন্টের গন্ধ প্রবেশ করছে বনহুরের নাকে। রীণা সাঈদের চুলগুলো এলো-মেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ছে তার ললাটে-ঘাড়ে-কপালে। মাঝে মাঝে দক্ষিণ হস্তে গাড়ির হ্যাণ্ডেল ঠিক রেখে চুলগুলো বাম হস্তে সরিয়ে নিচ্ছিলো।

বনহুর ওর অলক্ষ্যে তাকিয়ে দেখে নিচ্ছিলো, কে এ মেয়েটি রীণা সাঈদ। এখন তাকে নিয়ে কোথাই বা চলেছে। মেয়েটিকে স্বাভাবিক তরুণী বলে মনে হয় না! রীণা সাঈদ পকেট থেকে সিগারেট প্যাক বের করে বাড়িয়ে ধরলো মিঃ রিজভীর দিকে—অমন বোবা বনে গেছো কেন? নাও আমি দিচ্ছি ধরাও।

রীণা সাঈদের হাত থেকে সিগারেট কেসটা নিয়ে লক্ষ্য করতেই বুঝতে পারলো সিগারেট কেসটা সোনার তৈরি। এবং সিগারেটগুলো অতি মূল্যবান সিগারেট।

বনহুর নিজে একটা ঠোঁটের ফাঁকে চেপে ধরে আর একটা গুঁজে দিলো রীণা সাঈদের ঠোঁটে। তারপর অগ্নিসংযোগ করলো সে সিগারেট দুটোতে।

দিল্লীর সেরা সিগারেট এ্যা, রীণা সাঈদ সম্মুখে দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালাচ্ছিলো। একরাশ ধুঁয়া ছড়িয়ে পড়ছিলো চারপাশে। ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে ধরে বললো রীণা সাঈদ—রিজভী আজ কিন্তু তোমাকে ছাড়বোনা। থাকতে হবে আমার ওখানে।

উঁ হুঁ আজ সম্ভব হবে না রীণা।

কই কোনোদিন তো আমার কথায় অমত করনি রিজভী? আজ তোমার কোনো কথা আমি শুনবো না।

বনহুরবেশী রিজভী কোনো কথা বলতে নারাজ, কারণ সে দেখতে চায় এর শেষ কোথায়

রীণা সাঈদ গাড়িখানা স্পীডে চালাচ্ছিলো।

দিল্লীর সেকেন্দ্রো রোড় ধরে আগ্রার দিকে অগ্রসর হলো।

প্রায় ঘন্টাখানেক চলার পর গাড়িখানা একটা বড় বাড়ির সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। বাড়িটা বেশ নির্জন এবং শহরের এক প্রান্তে বলে মনে হলো।

গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়তেই একটি দীর্ঘদেহী জমকালো লোক সেলুট করে দাঁড়ালো—মালিক বড্ড দেরী হয়ে গেছে, শীঘ্র চলুন।

রীণা সাঈদ দ্রুত ড্রাইভ আসন থেকে নেমে দাঁড়ালো, বললো—তোমার জন্য বিলম্ব হলো রিজভী।

বনহুর কোনোরকম কথা না বলে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালো, বললো—শীগ্গীর চলো।

রীণা সাঈদ অগ্রসর হলো।

তাকে অনুসরণ করলো রিজভী, পকেটে হাত দিয়ে একবার রিভলভারটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো সে।

পিছনে চলেছে জমকালো দীর্ঘদেহী লোকটা।

বাড়িটার মধ্যে প্রবেশ করতেই বনহুর অনুভব করলো কেমন যেন একটা থমথমে গুরুগম্ভীর ভাব। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত না হলেও বাড়িটা বেশ অন্ধকার লাগছিলো।

বড় বড় দুটো ঘর পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো রীণা সাঈদ।

বনহুর আর জমকালো লোকটা দাঁড়িয়ে রইলো পিছনে। লিফ্টের মত একটা চৌকা জিনিস নেমে এলো নীচে। রীণা সাঈদ লিফ্টে চেপে পড়লো।

মিঃ রিজভীবেশি বনহুরও উঠে দাঁড়ালো।

কালো লোকটা উঠলো না, সে পূর্বের ন্যায় সেলুট করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

লিফট উঠে গেলো উপরের দিকে।

সাঁ সাঁ করে লিফ্ট উঠছে। রীণা সাঈদ মিঃ রিজভীর হাতখানা নিজের হাতে চেপে ধরে বলে—সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

মিঃ রিজভী তার কথায় কোন জবাব দিলো না, কিন্তু ওর হাতে চাপ দিলো একটু।

রীণা সাঈদ হাসলো।

মিঃ রিজভী বললো—হঠাৎ শরীর খারাপ হাওয়ায় বড্ড নার্ভাস মনে করছি, মাফ করো রীণা।

খিল খিল করে হেসে উঠলো রীণা সাঈদ—তবে এলে কেন, চলো সব ঠিক হয়ে যাবে।

লিফ্টা একটা বড় ধরনের হলঘরে এসে থামলো।

নেমে পড়লো রীণা সাঈদ।

মিঃ রিজভীও রীণাকে অনুসরণ করলো। কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু তার স্থির হলো। কতগুলো লোক বসে আছে, এক একটা লোকের পাশে এক একটা যুবতী দাঁড়িয়ে! কেউ বা পুরুষটির গায়ে হেলান দিয়ে, কেউ বা চেয়ারের হাতলে বসে, কেউ বা কারো কাঁধে হাত রেখে অদ্ভুত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ রিজভীকে দেখেই সবাই উঠে দাঁড়ালো, অভিনন্দন করলো সকলে নত মস্তকে।

রীণা সাঈদের বাহুখানা তখন মিঃ রিজভীর বাহুর মধ্যে রয়েছে।

মাহমুদ রিজভীসহ রীণা সাঈদ একটা উচ্চ স্থানে এসে দাঁড়ালো। কক্ষটা এতোক্ষণ যেন ঘুমিয়ে ছিলো, এবার জেগে উঠলো নব উদ্যমে। ওদিকে কতগুলো বাদ্যকর বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসেছিলো, এবার সবাই নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্রে হাত রাখলো।

হঠাৎ যেন কক্ষটা মুহূর্তে সরগরম হয়ে উঠলো।

বাজনার তালে তালে এক একটি পুরুষ আর নারী মিলিতভাবে চললো অদ্ভুত ভঙ্গীমায় নাচ।

রীণা সাঈদ মাহমুদ রিজভীকে বললো—চলো।

আসলে তো মাহমুদ রিজভী সে নয়, বনহুর কোনোদিন এ ধরণের নাচে দক্ষ নয়। বলড্যান্স বা ফ্যান্সি নাচে তার কতকটা অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু একি ধরনের অদ্ভুত ভঙ্গীমায় নাচ। বললো সে—আমাকে মাফ করো রীণা, আজ আমি বড় অসুস্থ।

কিন্তু তুমি না আমায় কথা দিয়েছিলে?
হঠাৎ শরীর খারাপের জন্য আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না।
রীণার মুখ গম্ভীর হলো।
তখন হলঘরটার মধ্যে শুরু হয়েছে নারী-পুরুষে মিলিত বিশেষ ভঙ্গীমায় নাচ। শুধু নাচ নয়, নাচের সঙ্গে সঙ্গে মদপান—আরও কত কি!
বনহুর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।
কিন্তু রীণা সাঈদ কিছুতেই তাকে ছাড়বে না, আজ নাকি এদের এ উৎসবের দিন। দিল্লীর অধিবাসীদের মধ্যে নাকি এ নাচ প্রসিদ্ধ। কাজেই একটু-আধটু নাচতেই হবে তাকে।
রীণা যখন জেদ করছিলো, তখন বনহুর নিপুণ দৃষ্টি মেলে লক্ষ্য করছিলো, পারবে কিনা এ নাচ। তবে চেষ্টায় দোষ কি। দস্যুতা তার নেশা-পেশা সবকিছু। দস্যুতা করতে গিয়ে তাকে জীবনে অনেক অসাধা সাধন করতে হয়েছে, আজ না হয় একটু নাচবে!
বললো বনহুর—চলো তা হলে।
রীণা সাঈদের চোখেমুখে আনন্দের দ্যুতি খেলে গেলো, খুশী হলো সে। টেবিল থেকে গ্লাস ভরা মদ তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে খেলো। বললো রিজভী খাও।
না শরীর খারাপ ওসব খাবো না।
বেশ এসো। রীণা মাহমুদ রিজভীবেশি বনহুরের বাহুর মধ্যে বাহু দিয়ে বেষ্ঠন করে ধরলো।
অদ্ভুত নাচ শুরু হলো রীণা সাঈদের সঙ্গে দস্যু বনহুরের। বাজনার তালে তালে পা এবং অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে লাগলো।
সত্যিই একটা নাচের উন্মাদনা সৃষ্টি হচ্ছে বাজনার শব্দে। বাদ্যযন্ত্রিগণ অদ্ভুতভাবে বাজাচ্ছে তাদের যন্ত্রগুলো।
রীণা সাঈদ বনহুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে গিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে।
বললো রীণা সাঈদ—রিজভী, তুমি না অসুস্থ?
বনহুর বললো—অসুখ সেরে গেছে তোমার স্পর্শে।
রিজভী!
হাঁ রীণা।
নাচের ফাঁকে ফাঁকে কথা হচ্ছিলো ওদের মধ্যে।
বনহুর অল্পক্ষণের চেষ্টায় দিল্লীর অধিবাসীদের এ অদ্ভুত নাচে দক্ষ হয়ে উঠলো।
রীণা বললো—আর পারছি না।
হেসে বললো বনহুর—আমিও ছাড়ছি না তোমাকে।

উঁ হুঁ আর নয় রিজভী!

এরি মধ্যে সখ মিটলো?

পারছি না আর।

বনহুর লক্ষ্য করলো, তার হাতের উপর ক্রমে এলিয়ে পড়ছে, রীণা সাঈদের দেহটা শিথিল হয়ে আসছে ক্রমেই।

ওদিকে বাদ্যযন্ত্রিগণ ঠিক তালে তালে বাজনা বাজিয়ে চলেছে।

ধীরে ধীরে নাচছে অন্যান্য ব্যক্তিগণ।

মাঝে মাঝে মদ পান করছে ওরা।

রীণা সাঈদের দেহটা ক্রমান্বয়ে এলিয়ে পড়লো বনহুরের বাহুর মধ্যে। বনহুর আর বিলম্ব না করে আস্তে সরে পড়লো রীণা সাঈদকে নিয়ে আড়ালে। পাশের কক্ষে এনে শুইয়ে দিলো রীণার শিথীল দেহটা। তারপর সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে! আড়ালে আত্মগোপন করে দেখতে লাগলো সব। বুঝতে পারলো, এ শয়তান মাহমুদ রিজভীর আড্ডাখানা। এখানে তার সমস্ত দলবল নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করে থাকে সে।

মাহমুদ রিজভীর বেশ এখনও বনহুরের শরীরে রয়েছে। কাজেই তার কোনো অসুবিধা হলো না। লিফ্‌টের নিকটে পৌঁছতেই তাকে সানন্দে নীচে নামিয়ে দিলো লিফ্‌টম্যান।

বনহুর এবার গাড়ি নিয়ে সোজা বেরিয়ে পড়লো দিল্লীর পথে। লাবলীং ক্লাবের সম্মুখে এসে গাড়ি রেখে নেমে পড়লো। ভিতরে প্রবেশ করতেই ক্লাবের ম্যানেজার তাকে গুরুদেবের মত অভিনন্দন জানালো।

বনহুর বললো—ধীরেনচরণ আছেন।

ম্যানেজার বিনীতভাবে জানালো—আছেন।

ডেকে দিন তাকে!

ম্যানেজার বললো—আপনি বসুন, আমি তাকে ডেকে আনছি।

ম্যানেজার চলে গেলো।

মিঃ রিজভীবেশি বনহুর বুঝতে পারলো, লাবলীং ক্লাবের সবাই মাহমুদ রিজভীর অনুগত দাস।

একটু পরে এলো লাবলীং ক্লাবের ম্যানেজার এবং তার সঙ্গে শয়তান ধীরেনচরণ। অত্যন্ত নেশা করায় ঢুলু ঢুলু করছে তার চোখ দুটো। মিঃ রিজভীকে দেখে তার চোখ চক্ চক্ করে উঠলো। জড়িত কণ্ঠে বললো— আপনি এসেছেন মিঃ রিজভী। আমার মাল কই?

বললো রিজভী—মাল মজুত আছে। কথাবার্তা পাকা করতে এলাম।

কথা আবার কি মিঃ রিজভী। যা দেবো বলেছি তাই হবে। কিন্তু ঐ পথের কাঁটাটাকে সরিয়ে......

হাঁ সে আপদ দূর করেই এসেছি মিঃ ভৌম।
তবে তো আর কথাই নেই। লুসীকে পাওয়া এখন আমার পরম সৌভাগ্য।
হাঁ, এবার আপনি পরম নিশ্চিন্ত।
তবে কখন লুসীকে পেতে পারি বন্ধু?
যখন আমার পাওনা পরিশোধ করবেন।
বেশ, আমি এক্ষুণি আপনার টাকা নিয়ে যাচ্ছি। লুসীকে ঠিক পাবো তো?
পাবেন মানে? নিশ্চয়ই পাবেন। আপনি জানেন, মিঃ রিজভী কোনোদিন মিথ্যা কথা বলে না।
আপনি অপেক্ষা করুন, আমি এক্ষুণি আসছি।
বেরিয়ে যায় মিঃ ধীরেনচরণ ভৌম।
মাহমুদ রিজভীবেশি দস্যু বনহুর আয়নার সম্মুখে দাঁড়িয়ে নিজের ছদ্মবেশটা একবার ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়। না, তাকে চিনবার কোনো উপায় নেই।
ফিরে আসে ধীরেনচরণ, হাতে তার ব্যাগ। ঐ ব্যাগের মধ্যে যে টাকা রেখেছে—লুসীর মূল্য। বললো সে—চলুন মিঃ রিজভী।
গাড়িতে এসে বসলো ওরা।
মাহমুদ রিজভী নিজে ড্রাইভিং আসনে বসে গাড়ি ষ্টার্ট দিলো। গাড়ি ছুটে চললো।
ধীরেনচরণ ভয়নক নেশা করেছে সে এখনও জড়িতকণ্ঠে আবোল-তাবোল কথাবার্তা বলছিলো। এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকার ব্যাগ তার কোলের উপর রয়েছে। মিঃ রিজভীবেশি দস্যু বনহুর একবার পকেটে হাত রেখে রিভলভারের অস্তিত্ব অনুভব করে নিলো। হাতঘড়ির দিকে তাকালো বনহুর, রাত এখন বারোটা।
গুলশান হোটেলে পৌছে ধীরেনচরণসহ মিঃ রিজভী সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো উপরে। রাত বারোটা—গুলশান হোটেল এখনও গমগম করছে। অসংখ্য নর-নারী হোটেল কক্ষ সরগরম করে তুলেছে। হোটেলের সম্মুখে নানা ধরণের গাড়ি অপেক্ষা করছে। কোনো কোনো গাড়ির ড্রাইভার গাড়ির হ্যাণ্ডেলে মাথা রেখে ঝিমুচ্ছে। এখনও মনিবের ফিরবার কোনো লক্ষণ নেই। রাত বারোটা—কিন্তু গুলশান ক্লাবে যেন এমাত্র সন্ধ্যা হলো।
মিঃ রিজভীসহ ধীরেনচরণ এসে পৌছলো মিস লুসীর দরজায়।
মিঃ রিজভী দরজায় মৃদু আঘাত করলেন।

লুসীর সবেমাত্র একটু নিদ্রা এসেছিলো, এতোক্ষণ সে প্রতীক্ষা করছে মিঃ আলমের। তিনি তো এতো রাতেও ফিরলেন না! কোথায় গেলেন তিনি, কেনই বা গেছেন—এমনি নানা চিন্তা করতে করতে সবেমাত্র একটু তন্দ্রা এসেছে। সেদিনের পর মিঃ আলম যেন তাকে এড়িয়ে চলে সব সময়। লুসীও সাহস পায় না তার সঙ্গে কোনোরকম কথা বলার। হাজার হলেও সে তো বাঙালী নারী, লজ্জা-দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাকে সঙ্কোচিত করে তুলে।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ায় তন্দ্রা ছুটে যায় লুসীর। চমকে বিছানায় উঠে বসলো, কান পেতে শুনলো—আবার দরজায় আঘাত হলো।

লুসী বুঝতে পারলো, এ মিঃ আলমের সংকেতপূর্ণ শব্দ। মিঃ আলম লুসীকে বলে দিয়েছিলো—পর পর জোড়াভাবে টোকা পড়লে তবেই তুমি দরজা খুলবে, নচেৎ খুলবে না।

লুসী বুঝতে পারলো আলম ছাড়া কেউ নয়।

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখে যম দেখার মতই আঁতকে উঠলো লুসী। দেখলো মিঃ মাহমুদ রিজভী আর ধীরেনচরণ ভৌম সাক্ষাৎ ভয়ঙ্করের মত দাঁড়িয়ে আছে।

লুসীকে দেখে ধীরেনের চোখ দুটো ক্ষুদ্ধ শার্দুলের মত দপ করে জ্বলে উঠলো।

দৃষ্টি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো লুসী ধীরেনচরণকে, এ শয়তান তাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিলো, কতবার সে হামলা চালিয়ে তাকে নাজেহাল পেরেশান করে ফেলেছে। ভাগ্গিস মিঃ আলম তাকে পর পর বাঁচিয়ে নিয়েছেন ঐ লম্পট পাপিষ্ঠের হাত থেকে। মিঃ মাহমুদ রিজভীকেও সে ভালো মনে করেছিলো, কিন্তু আজ তাকে বিশ্বাস করতে পারলো না। কারণ মিঃ রিজভীর আসল রূপ উদঘাটন হয়েছে তার কাছে। মিঃ রিজভী তাকে চোরা কুঠরীতে বন্দী করে রেখে তার উপর চালিয়েছে নানা রকম অকথ্য অত্যাচার। লুসীকে তবু সে আয়ত্তে আনতে পারেনি। ধীরেনচরণের সঙ্গে মিঃ রিজভীকে দেখে শিউরে উঠলো লুসী। ভয়ে পিছিয়ে গেলো কয়েক পা।

মিঃ মাহমুদ রিজভীর বেশে দস্যু বনহুর আর ধীরেনচরণ ভৌম প্রবেশ করলো কক্ষমধ্যে।

লুসীর তখন হৃদকম্প শুরু হয়েছে। চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভয়-ভীতি আর উৎকণ্ঠা। মিঃ আলম তাকে বলেছিলো সংকেত-পূর্ণ শব্দ ছাড়া সে যেন দরজা না খোলে। কিন্তু এরা কি করে তার সে সংকেত জানতে পারলো! লুসী ভেবে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছতে পারলো না।

ধীরেনচরণ বললো—লুসী, আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলে কিন্তু এবার আর তোমার উদ্ধার নেই।

মিঃ রিজভী বললো—হাঁ, তোমার জিনিস তুমি এবার বুঝে নাও বন্ধু। কিন্তু তার পূর্বে আমার পাওনাটা মিটিয়ে দাও। শুধু লুসীকেই আমি তোমার হাতে তুলে দিলাম, তাই নয়, তোমাদের পথের কাঁটা মিঃ আলমকেও তোমাদের চলার পথ থেকে সরিয়ে ফেলেছি......

লুসী কথাটা শুনে যেন আর্তনাদ করে উঠলো—উঃ মিঃ আলমকে তোমরা হত্যা করেছো?

হাঁ সুন্দরী, মিঃ আলম যেন আর ধীরেনচরণের কাছ থেকে তোমাকে ছিনিয়ে নিতে না পারে সেজন্য তাকে পরপারে পাঠিয়ে দিয়েছি। বললো রিজভী।

দু'হাতে মুখ ঢেকে লুসী আকুলভাবে কেঁদে উঠলো।

ধীরেনচরণ হেসে উঠলো হাঃ হাঃ করে, তারপর হাসি থামিয়ে বললো—মিস লুসী, হাজার বার রোদন করেও কোনো ফল হবে না। এখন তুমি আমার.....

গম্ভীর গলায় বললেন মিঃ রিজভী—তার পূর্বে আমার টাকা?

হাঁ, আপনার টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছি। ধীরেনচরণ ব্যাগ খুলে টাকার বাণ্ডিলগুলো বের করে টেবিলে রাখলো।

মিঃ মাহমুদ রিজভী বাণ্ডেলগুলো গুণে নিলেন হাতে উঠিয়ে, একটির পর একটি করে। তারপর ব্যাগে ভরে তুলে নিলেন ব্যাগটা হাতে।

ধীরেনচরণ লুসীর হাত ধরলো এবার—চলো লুসী, এবার তুমি আমার।

মিঃ রিজভী বাম হস্তে টাকার ব্যাগ আর দক্ষিণ হস্ত লুসীর মাথায় রেখে বললো—আপত্তি করে কোনো ফল হবে না মিস লুসী, চলুন আপনাকে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লুসী উচ্ছলভাবে কেঁদে উঠলো,—আমাকে হত্যা করুন, তবু আমি যাবো না।

যাবে না?

না!

জানো হোটেল আমার? এখানে থাকলে তোমার নিস্তার নেই। তোমাকে নাচতে হবে, গাইতে হবে, আমার আদেশে আরও অনেক কিছু করতে হবে তোমাকে—পারবে? বললো মাহমুদ রিজভী।

অসহায় কাতর চোখে তাকালো লুসী মিঃ রিজভীর মুখের দিকে।

ধীরেনচরণ বললো—শুনলে? কোনটা চাও—আমার ঘর করতে চাও, না সকলের মন তুষ্টি সাধনে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে সুখী হতে চাও? বলো কোন্‌টা তুমি বেছে নেবে?

লুসী দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠে—তোমার ঘর করবার আগে আমি মরতে চাই।

কিন্তু তোমাকে মরতে দিলে তো মরবে! যাক, বেশি সময় আমি নষ্ট করতে চাই না। এসো লুসী। জোরপূর্বক লুসীকে টেনে নিয়ে চলে ধীরেন।

মিঃ মাহমুদ রিজভী অনুসরণ করেন ওদের। বলে তিনি—চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লুসীকে গাড়ির পিছন আসনে তুলে নেওয়া হলো। লুসীর পাশে বসলো ধীরেনচরণ।

আর মিঃ মাহমুদ রিজভীবেশি বনহুর বসলো ড্রাইভ আসনে।

ধীরেন বললো—লাবলীং ক্লাবে চলুন মিঃ রিজভী।

হাঁ তাই যাবো।

গাড়ি চলতে শুরু করলো।

লুসী যেন চীৎকার করতে না পারে তার জন্য লুসীর মুখে রুমাল গুঁজে দেয়া হয়েছিলো ইতিপূর্বে। লুসী মৃতের ন্যায় পড়েছিলো পিছন আসনে।

দিল্লীর রাজপথ প্রায় জনশূন্য হয়ে এসেছে।

এ-পথ-সে-পথ করে গাড়ি ছুটছে।

মিঃ রিজভী অধর দংশন করছিলেন ড্রাইভিং আসনে বসে। চোখ দুটো তার আগুনের ভাটার মত জ্বলছিলো অন্ধকারে।

লাবলীং ক্লাবের সম্মুখে এসে গাড়ি থামলো।

রাত তখন দুটো বেজে গেছে।

লাবলীং ক্লাব নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। তবে দু'একটা মাতাল তখনও টেবিলে মাথা রেখে জড়িত কণ্ঠে আবোল-তাবোল বকছিলো।

মিঃ রিজভীর সহায়তায় ধীরেনচরণ মিস লুসীকে উপরে নিয়ে এলো।

লুসীর মুখের রুমাল খুলে ফেলা হয়েছে।

করুণ চোখে তাকাচ্ছে লুসী চারদিকে। ব্যথাভরা অসহায় তার মুখোভাব। সাগরে পড়লে মানুষ যেমন কূল পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে তেমনি লুসীর অবস্থা।

মিঃ রিজভী চলে যাবার জন্য পা বাড়ালেন।

লুসী ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো মিঃ রিজভীর পা দু'খানা—আমাকে উদ্ধার করুন। আমাকে বাঁচান এ দুষ্টের হাত থেকে।

হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো ধীরেনচরণ, ভয়ঙ্কর পাশবিক সে হাসি। লুসীর হাত ধরে টেনে তুলে নিলো জোর পূর্বক।

লুসী ভয়ার্তভাবে আর্তনাদ করে উঠলো—মিঃ রিজভী, আমাকে ফেলে যাবেন না। বাঁচান আপনি.....

কিন্তু শয়তান ধীরেন লুসীকে আকর্ষণ করলো, জাপটে ধরলো ওকে।
লুসী নিজেকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে।
ফিরে দাঁড়ালো মাহমুদ রিজভী, দক্ষিণ হস্তে তার রিভলভার গভীর কণ্ঠে বললো—মুক্ত করে দাও লুসীকে।
চমকে ফিরে তাকালো ধীরেন—এ কি এ যে মিঃ আলম! মিঃ রিজভীর দাড়ি গোঁফ অদৃশ্য হয়েছে, সুন্দর পুরুষ দীপ্ত বলিষ্ঠ একটা মুখ বেরিয়ে এসেছে তখন।
ধীরেনের চোখে যেন সর্ষে ফুল ঝরে পড়ছে। চোখ রগড়ে তাকায় সে।
বনহুর রিভলভার উদ্যত করে এগিয়ে আসে—মুক্ত করে দাও লুসীকে।
ধীরেনের বাহুবন্ধনে তখন আবদ্ধা লুসী।
লুসীর চোখেমুখে বিস্ময়, তেমনি একটা আনন্দদ্যুতি বয়ে যায় তার সমস্ত মুখে!
লুসীকে মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ধীরেন। এতোক্ষণে যেন হুস হলো তার। একি কথা! মিঃ আলম তাহলে মিঃ রিজভীর বেশে তাকে ধোকা লাগিয়েছে! তার সমস্ত অর্থ লুটে নিয়েছে মিঃ আলম আর লুসীকেও উদ্ধার করে নিতে এসেছে। ধীরেন দ্রুত টেবিলের পাশে ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলে নিলো হাতে।
অমনি বনহুরের রিভলভারের একটি গুলী তার দক্ষিণ হস্তে বিদ্ধ হলো।
সঙ্গে সঙ্গে রিসিভার খসে পড়লো ধীরেনের হাত থেকে। মুখটা বিকৃত করে বাম হস্তে দক্ষিণ বাহু চেপে ধরলো। রক্তে ভেসে গেলো সমস্ত হাতখানা।
বনহুর দাঁত পিষে বললো—ধীরেন, জানো না আমি কে। আমার চোখে ধুলো দিয়ে তুমি লোকের সর্বনাশ করবে! মিঃ মাহমুদ রিজভী তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে, তারই হাতে তৈরি মৃত্যুকূপে তিল তিল করে শুকিয়ে মরছে সে। পৃথিবীর কেউ আর তার সন্ধান পাবে না। এবার তোমাকে যমালয়ে পাঠাবো, আর যেন কারো সর্বনাশ তুমি না করতে পারো।
বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠস্বর আর অগ্নিমূর্তি রূপ দেখে ধীরেনের মুখমণ্ডল বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, ভূলে গেলো সে তার হাতের ক্ষতের ব্যথা। পালাবার জন্য দ্রুত এগুলো দরজার দিকে।
বনহুর পিছন থেকে গর্জে উঠলো—খবরদার, এগুবে না।
থমকে দাঁড়ালো ধীরেন! তার ঝুলে পড়া হাত দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে।
লুসী ভয়বিহ্বল চোখে আনন্দভরা অন্তরে উপলব্ধি করছে এ দৃশ্য!

হঠাৎ ধীরেন ওদিকে ড্রয়ার খুলে বের করলো একটা ক্ষুদে পিস্তল। বাম হস্তেই সে ওটা উঁচু করে ধরলো।

কিন্তু বনহুর ওকে গুলী করার সুযোগ দিলো না, তার রিভলভার গর্জে উঠলো আবার।

সঙ্গে সঙ্গে ধীরেন মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো ভূতলে। ওর হাতের ক্ষুদে পিস্তলটা ছিটকে পড়লো দূরে। ধীরেনের বুকের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো মেঝেটা।

লুসী আর্তকণ্ঠে বললো—একি করলেন মিঃ আলম?

বনহুর পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো—শয়তানের উপযুক্ত শাস্তি দিলাম। চল লুসী।

বনহুর লুসীর হাত ধরে সিড়ি বেড়ে দ্রুত নেমে এলো নীচে।

লাবলীং ক্লাবের সম্মুখে তাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিলো। বনহুর লুসীকে তার পাশে বসিয়ে নিয়ে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো।

লুসীর চোখে শুধু বিস্ময় নয়, তার অন্তরে এক বিরাট প্রশ্ন—মানুষ না দেবতা ইনি। লুসী অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অন্ধকারে বনহুরের মুখের দিকে। কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠেছে তার মন।

বনহুর স্পীডে গাড়ি ছাড়লো। সে বুঝতে পারলো, তার রিভলভারের গুলীর শব্দে লাবলীং ক্লাবের তন্দ্রা ছুটে গেছে। আরও লক্ষ্য করলো, একটা গাড়ি তাদের গাড়িখানাকে ফলো করে তীর বেগে ছুটে আসছে।

লুসী বললো— মিঃ আলম, পিছনে একটা গাড়ি আসছে।

সম্মুখে দৃষ্টি রেখে বললো বনহুর—আমি ঐ গাড়িখানাকে দেখতে পেয়েছি লুসী। এ গাড়ি আমাদের গাড়িকে ফলো করছে। কারণ, লাবলীং ক্লাবে ধীরেনের হত্যা রহস্য প্রকাশ হয়েছে।

এখন উপায়।

উপায় করতেই হবে একটা।

আমার ভয় করছে মিঃ আলম।

ভয় পাবার কিছু নেই।

ওরা যদি ধরে ফেলে, তাহলে কি হবে?

ফাঁসী হবে!

উঃ।

তোমার নয় লুসী, আমার।

কিন্তু আমি যে আপনার কথাই ভাবছি।

আমার জন্য ভেবো না। আমার চেয়ে তোমার নিজের কথা ভাবো লুসী।

গাড়িখানা অনেক এগিয়ে এসেছে।

বনহুর ডবল স্পীডে গাড়ি চালাচ্ছে। সামনের আয়নায় দেখা যাচ্ছে। গাড়ির সার্চলাইটের আলো। অত্যন্ত দ্রুত গাড়িখানা ছুটে আসছে।

বনহুর এলোপাতাড়ি গাড়ি চালাচ্ছিলো, সোজা পথে না গিয়ে এ পথ সে-পথ ধরে এগুচ্ছিলো সে।

পিছনের গাড়িখানা যদিও দ্রুত আসছিলো তবু সম্মুখের গাড়ির সঙ্গে পেরে উঠছিলো না। বনহুর মৃত্যুকে ভয় করে না। তার গাড়ি ছুটছিলো উল্কা বেগে।

যে পথ দিয়ে এখন গাড়ি যাচ্ছিলো সো হলো হুমায়ুন রোড এ পথে কয়েক মাইল অগ্রসর হলেই পৃথীরাজের রাজপ্রাসাদ। বিরাট একটি দীঘির পাড়ে এ প্রাসাদটি গড়ে উঠেছিলো। আজ অবশ্য সে দীঘির কোনো অস্তিত্ব নেই। নব নব প্রাসাদ সমতুল্য অট্টালিকা শোভা বর্দ্ধন করছে।

বনহুরের গাড়ি এক সময় পৃথীরাজের প্রাসাদের সম্মুখপথে এসে হাজির হলো।

এখন পিছনের গাড়িখানা সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেছে।

বনহুর একটা বাগানের আড়ালে গাড়ি রেখে লুসী সহ নেমে পড়লো। দক্ষিণ হস্তে তার টাকার ব্যাগটা রয়েছে।

বাগানের ঝোপের আড়ালে আত্মগোপন করে পৃথীরাজের প্রাসাদের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

ঠিক সে মুহূর্তে সম্মুখ পথ দিয়ে দ্রুত চলে গেলো ঐ গাড়িখানা। যে গাড়িখানা দিল্লীর লাবলিং ক্লাব থেকে তাদের অনুসরণ করে আসছে।

বনহুর লুসীকে বললো—দেখলে তো চলে গেলো।

উঃ বাঁচলাম এবার। লুসী যেন নিশ্বাস নিলো প্রাণ ভরে।

বনহুর বললো—লুসী, এবার কোথায় যাওয়া যায় বলোতো?

চিন্তিত কণ্ঠে বললো লুসী—তাই তো!

অন্ততঃ রাতের মত একটু আশ্রয় চাই কি বলো?

হুঁ।

এখন কটা বাজে?

চারটা। দু'ঘন্টা ধরে দিল্লী শহরটায় ছুটোছুটি করেছি।

আশ্চর্য মানুষ আপনি!

লুসী, পৃথীরাজের প্রাসাদ এ। এ পৃথীরাজ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ শক্তিবান মহারাজা ছিলেন। কাল সমস্ত প্রাসাদটা আমরা ঘুরে ফিরে দেখবো। কিন্তু আজ রাত.....

ঐ যে সম্মুখে একটা ঘর—চলুন ওখানে রাতটুকু কাটিয়ে দিই।

তাই চলো লুসী, ওখানে কোন মানুষ-জন নেই বলে মনে হচ্ছে।

বনহুর আর লুসী সে ঘরটার দরজায় এসে দাড়ালো। দেখলো বেশ ঝকঝকে তকতকে পরিস্কার সুন্দর মেঝে। মনে হলো এককালে মন্দির ছিলো ওটা। এক পাশে শিবলিঙ্গ, আরও কয়েকটা কালো পাথর রয়েছে।

বনহুর আর লুসী কক্ষে প্রবেশ করলো।

কক্ষমধ্যে অন্ধকার তেমন জমাট নয়, বাইরের লাইটের আলো কক্ষমধ্যে কিঞ্চিৎ আলোকিত করে তুলেছে।

বনহুর ব্যাগটা এক পাশে ধাপ্ করে ফেলে দিয়ে নিজেও বসে পড়লো এতোক্ষণ একটানা গাড়ি চালিয়ে ক্লান্তি বোধ করছিলো সে।

লুসী দাঁড়িয়ে ছিলো৷ পুতুলের মত স্থির হয়ে।

বনহুর বললো— লুসী, বিছানার আশা ত্যাগ করে আজ ভূতলে শয্যা গ্রহণ করো।

লুসী বললো—না, সেজন্য নয়।

তবে দাঁড়িয়ে রইলে কেনো?

কিছু না।

বনহুর টাকার ব্যাগটা মাথার নীচে দিয়ে শুয়ে পড়লো।

লুসী বসলো।

বনহুর বললো—শুয়ে পড়ো লুসী।

কখন যে বনহুর ঘুমিয়ে পড়েছে, হঠাৎ একটা কোমল হাতের স্পর্শ অনুভব করলো সে মাথায়। ধীরে ধীরে কেউ যেন তার চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বনহুরের ঘুম ভেংগে গেলেও সে চোখ মেলে চাইলো না, ঘুমের ভান করে পড়ে রইলো। কোমল হস্তের অংগুলো সঞ্চালন আজ বনহুরের সমস্ত মনে একটা মধুর আবেশ এনে দিলো। ভাববিহ্বল কণ্ঠে বললো বনহুর—লুসী!

চমকে উঠলো লুসী, কিন্তু পালালো না বা সরে গেলো না। বনহুরের ডাকে জবাব দিলো—বলুন?

ঘুমাওনি কেন?

লুসী কোনো জবাব দিলো না।

বনহুর পাশ ফিরে শুলো।

লুসীর হস্ত সঞ্চালন তখনও বন্ধ হয়নি।

বললো বনহুর—লুসী, আজ রাত শেষ হলে কাল আমি তোমাকে নিয়ে কলকাতার পথে রওয়ানা দেবো। পৌছে দেবো তোমাকে তোমার পিতার কাছে।

তারপর আপনি?

একটু হাসলো বনহুর—আমি! আমার কেউ নেই, কিছু নেই। আমি যে বন্ধনহীন, লুসী।

মিঃ আলম!

আমার আসল পরিচয় তুমি জানো না লুসী, কে আমি।

জানি আপনি মুসলমান।

শুধু তাই আমার পরিচয় নয়। আরও একটা পরিচয় আমার আছে। যা জানলে শিউরে উঠবে তুমি। যাক্ সে কথা লুসী যতক্ষণ আমি তোমাকে

তোমার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দিতে না সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমি নিশ্চিত নই।

কিন্তু আমি আর ফিরে যাবো না মিঃ আলম, আমার বাবা-মা কে আমি জানি না, চিনি না তাদের কাউকে। আমাকে আপনি কলকাতায় নিয়ে যাবেন না।

তাহলে কোথায় যাবে?

আমি চিরদিন আপনার পাশে থাকতে চাই।

বনহুরের ললাটে ঝরে পড়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু, চমকে উঠে বসে বনহুর— লুসী তুমি কাঁদছো?

আপনি আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না।

লুসী!

আপনার পায়ে পড়ি.....লুসী বনহুরের পা দুটি জড়িয়ে ধরে।

বনহুর অস্বস্তি বোধ করে, লুসীকে তুলে নেয় সে, নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

ঠিক সে মুহূর্তে জমকালো একটি ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়ায় কক্ষটার দরজায়। অন্ধকারে চোখ দুটো যেন হিংস্র ব্যাঘ্রের মত জ্বলছে।

বনহুর লুসীকে সরিয়ে দিয়ে বিদ্যুৎ গতিতে উঠে দাঁড়ায়।

অন্ধকারে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে লুসী ভয়ার্ত-শব্দ করে উঠে—উঃ মা গো।

ভয়ঙ্কর মূর্তিটা দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে আসে বনহুরের দিকে।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে পকেট থেকে রিভলভারখানা বের করে উদ্যত করে ধরে।

ভয়ঙ্কর মূর্তিটা এগিয়ে আসছে। চোখ দু'টো তার আগুনের গোলার মত জ্বলছে যেন।

লুসী মুখ লুকায় বনহুরের বুকে।

পরবর্তী বই

রাত্রির ভয়ঙ্কর